কখনও ঝরে যেও না

তারিক মেহান্না

কখনও ঝরে যেও না

মূল

তারিক মেহান্না

সম্পাদনা

জিম তানভীর

শর'ঈ সম্পাদনা

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

সীরাত পাবলিকেশন

কখনও ঝরে যেও না

প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা, ২০১৯
ISBN: 978-984-8041-07-9

প্রকাশক
সীরাত পাবলিকেশন
www.facebook.com/seeratpublication
Email: seeratpublication@yahoo.com

পরিবেশক এবং প্রাপ্তিস্থান
দারুল নাহ্‌দা
শপ#৩১৫, দ্বিতীয় তলা, ৩৮/৩-কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৩৯১৫২১৯৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর #০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

পরিবেশক: অন্যরকম প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক
wafilife.com
rokomari.com
sijdah.com

প্রচ্ছদ: আনিকা তুবা
পৃষ্ঠাসজ্জা: সাজিদ ইসলাম
বানান: সাজিদ ইসলাম

মুদ্রিত মূল্য: ৩২৫ ৳

Kokhono Jhore Jeo Na By Tareek Mehanna, Edited By Zim Tanvir, Reviewed By Munirul Islam Ibn Jakir, Published By Seerat Publication, Dhaka, Bangladesh

ড. আফিয়া সিদ্দিকী

যিনি একাই গোটা একটা প্রজন্মকে শিখিয়েছেন দ্বীনের জন্য গাইরাত কী জিনিস। আল্লাহ যেন আমৃত্যু আপনাকে দ্বীনের উপর অটল রাখেন। জান্নাতের সিদ্দিকীনদের পাশে সুউচ্চ প্রাসাদ দান করেন।

রুটিন মাফিক এই যাপিত জীবনে ইসলামটা আজ আমাদের কাছে বিশ্বাস কিংবা আদর্শ নয়—অভ্যাস। ঠিক যেন নয়টা থেকে পাঁচটা একটি গৎবাঁধা জীবনের পাণ্ডুলিপি। ঝিমুনি আসা জুমার খুতবা, এ প্লাস পাওয়ার সহজ সাবজেক্ট 'ইসলাম শিক্ষা', চায়ের কাপে-ফেসবুকে-সুরেলা ওয়াজ মাহফিলে-বুকশেলফে সাজিয়ে রাখা কুরআনে—ইসলামটা বাক্সবন্দী অভ্যাস হয়ে আমাদের সাথেই কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন। সেই বাক্সটা খুলে কেউ যখন দেখিয়ে দেয় আমাদের এই নির্লিপ্ত জীবনের অসারতা, মেরুদণ্ডহীন এই বেঁচে থাকা, কিংবা যখন বুঝিয়ে দেয় যেটাকে আমরা ইসলাম বলে যত্ন করে বাক্সবন্দী করে রেখেছি, সেটা আসলে ইসলাম নয়—তখন যেন প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠার মতো অনুভূতি হয় আমাদের। এই বইয়ের প্রতি পাতায় পাতায় তেমনই অনেকগুলো ঝাঁকুনি অপেক্ষা করছে পাঠকের জন্য।

তারিক মেহান্না। যে একবার তাঁর লেখা পড়েছে, মোহাচ্ছন্ন হয়েছে নিঃসন্দেহে। তাঁর লেখা পড়া যেন মনের জানালা খুলে নীল আকাশ দেখার মতো। অনেক অনেক দিন আগে যে মানুষটার লেখা পড়ে প্রচণ্ড মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজ তাঁর লেখাগুলো বাংলায় বই হিসেবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই আনন্দ সবাইকে বিলি করে দিতে ইচ্ছে করে। আলহামদুলিল্লাহ।

বিনীত
সীরাত পাবলিকেশনের পক্ষে
সাজিদ ইসলাম

সূচী

তারিক মেহান্নার জবানবন্দিতে তার 'সন্ত্রাসী' হয়ে ওঠার গল্প

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঠিক চার বছর আগের এই দিনে আমি স্থানীয় হাসপাতালে আমার শিফটিং ডিউটি শেষ করে গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন দুই ফেডারেল এজেন্ট (FBI) আমার পথরোধ করে। তারা আমাকে দুটি প্রস্তাবের মাঝে একটি বেছে নিতে বলে। একটি সহজ, অপরটি কঠিন। তাদের ভাষায় "সহজ" প্রস্তাবটি ছিল সরকারের চর অর্থাৎ এজেন্ট হিসেবে কাজ করার। সেটি করলে আমাকে কখনও আদালত বা কারাগারের ত্রিসীমানায়ও যেতে হবে না। আর কঠিন প্রস্তাবটির বাস্তব রূপ আজ আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আমি কঠিন প্রস্তাবটিই বেছে নিয়েছি এবং তাই, গত চার বছরের অধিকাংশ সময় ধরে আমি আলমারির খোপের মতো ছোট্ট একটা কক্ষে দিনের ২৩ ঘন্টাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দী হয়ে কাটিয়েছি। আমাকে এতদিন আটকে রাখতে এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে এফবিআই ও তাদের আইনজীবীরা কঠিন পরিশ্রম করেছে। সরকার সাধারণ মানুষের পকেটের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে। শেষমেশ আজ আমাকে আপনাদের সামনে হাজির করা হয়েছে যেন আমাকে আরো দীর্ঘদিন কারাভোগের সাজা দেওয়া যায়।

রায় ঘোষণার এই দিনটিকে সামনে রেখে অনেকেই আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছে। আপনাদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী বললে আমার উপকার হবে, আমার কী কথা বলা উচিত ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন আমার ক্ষমা চেয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত যাতে করে লঘু শাস্তি হয়। অনেকে বলেছেন ক্ষমা চাই বা না-চাই, আমার কপালে কঠিন শাস্তিই জুটবে। কিন্তু সেসব পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি আজকে শুধু নিজেকে নিয়ে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।

যখন আমি আমেরিকান সরকারের বেতনপুষ্ট গুপ্তচর হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম, তখন সরকার আমাকে আটক করল মুজাহিদীনদের সাহায্য করার "অপরাধে"। এই মুজাহিদীনরা মুসলিম বিশ্বে চলমান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। মিডিয়ার ভাষায় এরা হচ্ছে "সন্ত্রাসী" বা "টেররিস্ট"।

আমি কোনো মুসলিম দেশে জন্মগ্রহণ করিনি। এই আমেরিকাতেই আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা। আর এ কারণেই অনেক মানুষ আমার উপর রীতিমতো ক্ষেপে আছে। তাদের কথা হলো, "কীভাবে এই লোকটা একজন আমেরিকান হয়ে "সন্ত্রাসী"দের পক্ষে অবস্থান নিতে পারল! কীভাবে ওদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলো!" মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস তার পারিপার্শ্বিকতার আদলে গড়ে ওঠে এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আর তাই আমি বলছি, আমার আমেরিকা বিরোধীতার পেছনে স্বয়ং আমেরিকাই দায়ী।

ছয় বছর বয়স থেকে আমি কমিক বইয়ের একটা বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলতে শুরু করি। ব্যাটম্যানের চরিত্রটি আমার মনে একটা ধারণা খুব স্পষ্টভাবে গেঁথে দেয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের চিরন্তন বাস্তবতার সাথে আর তা হলো—গল্পের চরিত্রগুলোর মতো এই দুনিয়াতেও অত্যাচারী জালিম আছে, আছে নির্যাতিত ও মজলুম, এবং তাদের মাঝে আছে এমন কিছু মানুষ যারা নিপীড়িত, শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই বাস্তবতা আমাকে এতটাই আন্দোলিত করেছিল যে, আমার পুরো শৈশব জুড়ে আমি যেসব বইয়েই এ ধরনের বাস্তবতা খুঁজে পেতাম সেগুলো সাগ্রহে পড়ে ফেলতাম। আংকেল টম'স কেবিন, ম্যালকম এক্স এর আত্মজীবনী প্রভৃতি বইগুলো আমার মাঝে সেই ধারণাটিকেই সুদৃঢ় করে তোলে। এমনকি 'দ্য ক্যাচার ইন দ্য রাই'(The Catcher in the Rye) বইটিতেও আমি এই ধরনের নৈতিকতার ছাপ খুঁজে পাই।

হাইস্কুলে উঠার পর আমি সত্যিকার ইতিহাস ক্লাস করা শুরু করি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেই ব্যাটম্যানের কমিকের মতোই তো লাগছে সবকিছু! আমি আবিষ্কার করলাম শোষক-শোষিতের এই ঘটনাবলি উপন্যাসের সীমানা পেরিয়ে আসলে আরো অনেক বেশি বাস্তব। আমি নেটিভ আমেরিকানদের (আমেরিকার আদি অধিবাসী) ইতিহাস পড়লাম এবং জানতে পারলাম বহিরাগত ইউরোপিয়ানদের হাতে তাদের কী করুণ দশা হয়েছিল। আবার এই ইউরোপ থেকে আগত লোকদের বংশধরেরা কীভাবে রাজা জর্জ (৩য়) এর হাতে শোষিত হয়েছিল। আমি পল রিভিয়ার, টম পেইনদের সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে আমেরিকানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছিল। আজকে সেটাকেই আমরা আমেরিকান রেভ্যুলেশন ওয়ার হিসেবে উদযাপন করি।

ছোটবেলায় শিক্ষাসফরে আমরা এই বিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো দেখতে বের হতাম। এই আদালতের অদূরেই তেমন কিছু যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে। আমি হ্যারিয়েট টাবম্যান, ন্যাট টার্নার, জন ব্রাউনদের সম্পর্কে পড়াশোনা করলাম। তারা ছিলেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রপথিক। আমি ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম ইমা গোল্ডম্যান, ইউজিন ডেবস এবং লেবার ইউনিয়নের সংগ্রামের কথা। জানতে পারলাম সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, গরীব লোকদের দুঃখের ইতিহাস। আমি আরও জানলাম অ্যানা ফ্রাংকের কাহিনি, নাৎসিদের বর্বরতার কথা, কীভাবে তারা সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যা

করেছে এবং বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ করেছে। জানলাম রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের গল্প। হো চি মিন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে জানলাম কীভাবে ভিয়েতনামবাসীকে নিজেদের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যুগ যুগ ধরে একের পর এক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আরো জেনেছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলা আর তৎকালীন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম সম্পর্কে।

এ সব ইতিহাসই যেন আমার ছয় বছর বয়সে শেখা কমিক বইয়ের কাহিনির পুনরাবৃত্তি। জালিম এবং মজলুমের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন দ্বন্দ্ব। যখনই এসব গল্প পড়তাম, সবসময়ই আমি নিজেকে শোষিত মানুষের পক্ষে অনুভব করেছি। মনের অজান্তে আমি শোষিতদের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সম্মান ও সমর্থন করতে শুরু করেছি—জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। আমি আমার ক্লাস নোটগুলোকে কখনই অযত্নে ফেলে দিতাম না। আমার বেডরুমের আলমারিতে সেই ক্লাসনোটগুলো এখনও দিব্যি সাজানো আছে।

কিন্তু ইতিহাসের মহানায়কদের একজন যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি ম্যালকম এক্স। তার অনেক কিছুই আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি তার পরিবর্তন দেখে। ম্যালকম এক্সকে নিয়ে নির্মিত স্পাইক লি'র "এক্স" চলচ্চিত্রটা আপনারা দেখেছেন কি না জানি না। এটি প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার একটি চলচ্চিত্র, যেখানে দেখা যায় শুরুর দিকটাতে যে ম্যালকম এক্স ছিলেন একজন অশিক্ষিত অপরাধী, শেষের দিকটাতে সেই ম্যালকমই পরিণত হন একজন স্বামী, একজন পিতা, গণমানুষের রক্ষাকর্তা, একজন বাগ্মী নেতা এবং হজ্জ পালনকারী একজন নিয়মানুবর্তী মুসলিম ব্যক্তিতে। সবশেষে তিনি শহীদ হন।

ম্যালকমের জীবন আমাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে। আর তা হলো—ইসলামটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো বিষয় নয়। জন্মসূত্রে শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মালেই কেউ মুসলিম হতে পারে না। এটা কোনো সংস্কৃতি বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ নয়। বরং এটি একটি জীবনব্যবস্থা, এটি একটি জীবনবোধ। আর এটা গ্রহণ করার জন্যে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে বা কী পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। এ বিষয়টা আমাকে ইসলাম নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি তখন কেবল কিশোর। কিন্তু ইসলাম আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিল, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বড় বড় বিজ্ঞানীরা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতা অনেক ধনী আর বিখ্যাত মানুষদের বিষাদ আর আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে—"কী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য?", "এই মহাবিশ্বে আমরা কেন, কীসের আশায় বেঁচে আছি?" —ইসলাম আমাকে কেবল জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়ে ক্ষান্ত হলো না, বরং দুনিয়ার বুকে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে তাও শিখিয়ে দিল।

ইসলামে খ্রিষ্টধর্মের মতো যাজকতন্ত্রের জটিলতা নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ কিছু পুরোহিতের দারস্থ হতে হয়। তাই আমি নিজেই কুরআন এবং রাসূল (ﷺ)-এর শিক্ষাগুলো ঘাঁটতে আরম্ভ করলাম। এই দুনিয়া, এই দুনিয়ায় আমার জীবনে, আমার চারপাশের মানুষের জীবনে আর সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের কী দেওয়ার আছে—তা জানার আগ্রহ থেকে আমি শুরু করলাম জ্ঞানার্জনের যাত্রা। আমি যতই ইসলাম সম্পর্কে জানতে লাগলাম ততই ইসলামকে বহুমূল্যবান সোনার টুকরোর মতো মূল্যবান মনে করতে লাগলাম। এগুলো উঠতি বয়সের কথা, কিন্তু আজকেও আমি শত চাপ আর ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই—আমি একজন গর্বিত মুসলিম।

আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু একসময় নিবদ্ধ হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের জীবনে। আমি যেদিকেই তাকাতাম, সেদিকেই দেখতাম বড় বড় পরাশক্তিগুলো আমার ভালোবাসাকে ধ্বংস করতে তৎপর। আমি দেখেছি আফগানিস্তানের মুসলিমদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করেছে। আমি দেখেছি বসনিয়ার মুসলিমদের উপর সার্বিয়ানদের অত্যাচার, দেখেছি চেচনিয়ার মুসলিমদের উপর রাশিয়ার অনাচার। আমি দেখলাম লেবাননের মুসলিমদের সাথে ইসরাইল কী অন্যায় করেছে এবং আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতায় যা সে আজও চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে।

আমার এও অজানা ছিল না যে আমেরিকা নিজেই মুসলিমদের সাথে কী ভয়ানক অন্যায় করে আসছে। আমি উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে ইউরেনিয়াম বোমা ব্যবহার করে ইরাক জুড়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেই বোমার তেজস্ক্রিয়তায় মরণব্যাধি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল বহুগুণে। আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে খাদ্য, পানি এবং ঔষধপত্র প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। যার ফলাফল ছিল ইরাকে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু। আমার মনে আছে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখেছিলাম, "60 Minutes" প্রোগ্রামে, সেখানে সাক্ষাৎকারে ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেছিলেন, "এটাই তাদের যথার্থ পাওনা!" আমি দেখলাম কীভাবে কিছু মানুষ এই নির্মম শিশু হত্যার ঘটনায় শান্ত থাকতে না পেরে এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার উড়িয়ে এর প্রতিশোধ নেয়।

এর পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে বসল। আবিষ্কার করলাম "Shock & Awe" (এক ধরনের আক্রমণাত্মক সামরিক কৌশল) এর পরিণতি। ইরাকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিশুরা হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে আছে, তাদের কপালে বিঁধে আছে মিসাইলের তীক্ষ্ণ শ্র্যাপনেল (shrapnel)। না, CNN এসবের কিছুই দেখায়নি। মেরিন সেনারা হাদীসা শহরে ২৪ জন ঘুমন্ত মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ৭৬ বছর বয়স্ক হুইলচেয়ারে বসা এক বৃদ্ধ, আরও ছিল বিছানাতে ঘুমন্ত নারী এবং শিশু।

আমি আরো জানলাম এক চৌদ্দ বছরের ইরাকি বালিকার কথা। বোন আবীর-আল-জানাবি, তাকে পাঁচজন আমেরিকান সেনা গণধর্ষণ করে। তারপর তাকে ও তার পরিবারের সকলকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। পাষণ্ডরা তাদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আমি আপনাদের একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই। একজন মুসলিম নারী কখনও তার একটি চুল পর্যন্ত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে না। অথচ কল্পনা করে দেখুন একটিবার, রক্ষণশীল পরিবারের এই ছোট্ট মেয়েটির কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পাশবিকভাবে তাকে যৌন নির্যাতন করছে, একজন-দুজন নয়, পাঁচ সৈনিক মিলে। এই আজও, আমি কারাগারে বসে পাকিস্তান, সোমালিয়া আর ইয়েমেনে আমেরিকার চলমান ড্রোন হামলার খবর শুনছি। এইতো গত মাসেই, শুনলাম ১৭ জন আফগান মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং এরপর তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এদের বেশিরভাগ ছিলেন মা এবং তাদের ছোট সন্তান।

এগুলো হয়তো আপনার কাছে নিছক পত্রিকার খবর বৈ কিছু নয় ...

কিন্তু এই আমি, এরই মাঝে শিখেছি, ইসলামের আনুগত্য আর ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞাটুকু। প্রতিটা মুসলিম নারী আমার বোন, আর প্রতিটা মুসলিম পুরুষ আমার ভাই, আর এই আমরা একসাথে একটা বিশাল পরিবার যারা একে অপরকে সাহায্য করে যাব। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি আসলে আমার ভাইবোনদের উপর এমন নির্বিচার অত্যাচার দেখে চুপ বা "নিষ্ক্রিয়" থাকতে পারিনি। শোষিতের জন্য সহানুভূতি আমার সবসময়ই ছিল, কিন্তু আজ যেন ব্যাপারটা একদমই ব্যক্তিগত। যারা আমার ভাই-বোনদের হয়ে লড়ছে তাদের প্রতি আমার সম্মানও তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসরিত।

আমি পল রিভিয়ারের কথা উল্লেখ করেছি। একদিন ব্রিটিশ হানাদাররা স্যাম এডামস ও জন হ্যানককে গ্রেফতার করতে এবং মিনিটম্যানদের অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে লেক্সিনটনে আসছিল। আগাম এই খবর পেয়ে সেদিন পল রিভিয়ার ঘোড়ায় চেপে মধ্যরাতে লোকদেরকে সতর্ক করতে বেরিয়ে যান। ফলে কনকর্ডে গিয়ে ব্রিটিশ সেনারা মুখোমুখি হয় ভিন্ন দৃশ্যের। মিনিটম্যানরা ব্রিটিশ অভিযানের আগাম বার্তা লাভ করে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে যুদ্ধের জন্য। ব্রিটিশরা সে যুদ্ধে পরাজিত হয়, আর এ বিজয়ের হাত ধরে আসে আমেরিকান রেভ্যুলেশন। জেনে অবাক হবেন মিনিটম্যানরা সেদিন যা করেছিল আমি সেই ঘটনাকে একটি আরবি শব্দ দিয়ে অতি সহজে ব্যাখ্যা করে দেব। তা হলো— জিহাদ। আর এটা নিয়েই আমার আজকের এই বিচার।

আমার বিরুদ্ধে হয়তো আপনারা জঙ্গিদের বক্তব্য এবং ভিডিও অনুবাদের অভিযোগ শুনেছেন। শুনেছেন শিশুতোষ এবং হাস্যকর অভিযোগ, "ওহ! সে তো ঐ অনুচ্ছেদের অনুবাদ করেছে!", "ওহ! সে তো এই বাক্যটা এডিট করেছে"—এর সবই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়েছে, তা হলো—ব্রিটিশরা আমেরিকার

বিরুদ্ধে যা করেছিল ঠিক একই কাজ আমেরিকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে করায় যেসব মুসলিমরা রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের সমর্থন করা। আমার ব্যাপারে আনীত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে এটা জলের মতো পরিষ্কার, আমি কখনই শপিং মলে আমেরিকান হত্যার পরিকল্পনা করিনি। এগুলো একেবারেই পাতানো অভিযোগ। সরকারদলীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলোই এমন অভিযোগের বিপরীতে কথা বলে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞরা এই ব্যাপারে আমার লেখা ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অভিযোগের পক্ষে কিছুই বের করতে পারেননি। পরে আমি যখন মুক্ত হলাম, তখন সরকার আমার কাছে ছদ্মবেশী চর প্রেরণ করে একটি "সন্ত্রাস পরিকল্পনা"র সাথে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব পাঠায়। সাজানো নাটক তৈরি করে সরকার আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি তাতে সাড়া দেইনি। রহস্যজনকভাবে, বিচারকরা এই ঘটনাটি যেন শোনেইনি।

যাই হোক, আমার বিরুদ্ধে যে বিচার কার্যক্রম চলছে তা মুসলিম দ্বারা আমেরিকার নাগরিক হত্যা নিয়ে নয়, বরং তা আমেরিকান কর্তৃক মুসলিম হত্যার বিরোধিতা করার কারণে। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিমদেরকে অবশ্যই হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে, হোক সে হানাদাররা সোভিয়েত বা আমেরিকা কিংবা মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত। আমি এটাই বিশ্বাস করি, আমি সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করতাম এবং সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করে যাব (ইনশাআল্লাহ)। এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, এটা চরমপন্থা নয়। এটা নিছক আত্মরক্ষা, নিজের মাটিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা।

আমি আমার আইনজীবীদের এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করি যখন তারা বলে, "সবাই তোমার এই বিশ্বাসের সাথে একমত হবে এমনটা নয়"। আমি বলি, না, এটা যার-যার-তার-তার বিষয় নয়। যার সামান্য কাণ্ডজ্ঞান ও মানবতাবোধ আছে, আমার সাথে সে এই বিষয়ে একমত না হয়ে পারে না। কেউ যদি আপনার বাসায় ডাকাতি করতে আসে এবং আপনার পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করে, কমনসেন্স বলে আপনার উচিত ডাকাতকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু যখন সেই ভূমি হয় "মুসলিম ভূমি" আর আক্রমণকারী বাহিনী হয় "আমেরিকান সেনাবাহিনী", তখন কেন যেন সব নীতিনৈতিকতার মাপকাঠি উল্টে যায়! নিজেদের রক্ষা করা তখন "সন্ত্রাসবাদ"। আকাশ আর সাগর পাড়ি দিয়ে আসা হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজ দেশকে রক্ষা করতে যারা যুদ্ধ করে, তারা হয় "সন্ত্রাসী", তারা হয় খুনী, "আমেরিকান হত্যাকারী"।

আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে এই রাস্তায় আমেরিকানরা ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, ঠিক একই বাস্তবতার শিকার আজ মুসলিমরা, তবে এবার আমেরিকান সৈন্যদের হাতে। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। যখন সার্জেন্ট বেলস নিরীহ আফগানদেরকে হত্যা করেছিল তখন আমি দেখলাম সবাই কেবল তাকে নিয়ে ব্যস্ত, মিডিয়াতেও কেবল তার জীবনের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে—তার পারিবারিক জীবন, তার মানসিক চাপ, তার বন্ধককৃত বাড়ি, তার PTSD নিয়ে

বিস্তারিত খবর দেখানো হলো। পুরো ব্যাপারটায় তার জন্য এমনভাবে একটা সহানুভূতি তৈরি করা হয়, যেন সে-ই ভুক্তভোগী! যাদেরকে সে নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতিই দেখানো হয়নি! যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। যেন আফগানরা মানুষ নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই মানসিকতা আমাদের সবাইকে গ্রাস করেছে। এমনকি আমার আইনজীবীদের তাদের বদ্ধ চেতনার খোলস থেকে বের করে এনে, "মুসলিমদেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে"—এই সামান্য ব্যাপারটা আলোচনা করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আমার পাক্কা দু'বছর সময় লেগেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে আমার সাথে একমত হয়েছে। দু'বছর! এই ঘাঘু আইনজীবীদের কাজ আমাকে রক্ষা করা। মুসলিমদের আত্মরক্ষাকে তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এই আইনজীবীদেরই সময় লেগেছে দুই বছর! আর সেখানে আমাকে যেকোনো একজন বিচারকের সামনে দাঁড় করিয়ে যখন বলা হয়, "এই বিচারক নিরপেক্ষ, তোমার সমমনা", আমি তখন বলি, "রাখুন আপনার নিরপেক্ষতা"। আমেরিকাকে আজ যে মানসিকতা গ্রাস করে নিয়েছে তাতে আমার মতের পক্ষে কোনো উকিল বা বিচারক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা আমার সহজ কথাগুলো সহজভাবে বুঝবে। তাই সরকারও আমার উপর মামলা ঝুলিয়ে রেখেছে। এটা করা যে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল তা নয়। কিন্তু আসলে তারা দেখাল যে তারা চাইলেই এমনটা করতে পারে।

ইতিহাসের ক্লাস থেকে আমি আরো একটা জিনিস শিখেছি—আমেরিকা হলো সেই দেশ যারা ঐতিহাসিকভাবে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের অন্যায়গুলোকে আইনগত বৈধতা দিত। আবার পরবর্তীতে তারাই অবাক হয়ে ভাবত, "আরে, আমরা এমন ছিলাম!" দাসত্ব, বৈষম্যমূলক জিম ক্রো আইন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের বন্দীশিবিরে অন্তরীণ রাখা—এই সবগুলো কাজকেই আমেরিকানরা স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সুপ্রীম কোর্টও এই বৈষম্যমূলক আইনগুলোকে বছরের পর বছর লালন করেছে। কিন্তু সময়ের সাথে আমেরিকা তার চেহারা পরিবর্তন করেছে। তারা নিজেদের অতীতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, "আরে, আমরা বুঝি এমন ছিলাম!" নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ধরুন, তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সন্ত্রাসী গণ্য করত। তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিতে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বদলেছে বিশ্বের চেহারা, মানুষ জানতে পেরেছে আসলে সরকারই ছিল সন্ত্রাসী, ম্যান্ডেলা নয়। ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হলেন। তাই আসলে সবকিছুই আপেক্ষিক। যে যেভাবে চায়, সেভাবেই

"সন্ত্রাস" এবং "সন্ত্রাসী"দের সংজ্ঞায়িত করে। এই সংজ্ঞাগুলো নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র আর সেই সময়ের ক্ষমতাধর পরাশক্তিগুলোর উপরে, কেননা তারাই নিজেদের মতো করে এসব সংজ্ঞা বানায়।

হ্যাঁ, আপনার চোখে আমি আজ একজন সন্ত্রাসী। আমি এখন জেলখানার কমলা রঙের একটা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছি। এই পোশাকেই হয়তো আমি সারাটি জীবন কাটিয়ে দেব। এটাই আপনাদের কাছে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন এই আমেরিকা বদলে যাবে। বদলে যাবে এর মানুষগুলো। তারা বুঝবে আজকের এই দিনটিতে আসলে কী প্রহসন হয়েছিল। তারা আবিষ্কার করবে কীভাবে হাজার হাজার মুসলিম খুন হয়েছিল, পঙ্গু হয়েছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাতে। কিন্তু "হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে" কারাগারে যেতে হচ্ছে এই আমাকেই। কারণ আমি সেইসব মুজাহিদদের সমর্থন করেছিলাম, যারা প্রকৃতপক্ষে 'হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্র' থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। একদিন আমেরিকানরা দেখবে, আমাকে "সন্ত্রাসী" বানাতে সরকার কীভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। যদি বোন আবীর আল জানাবিকে মৃত থেকে জীবিত করে ফিরিয়ে এনে আমেরিকানদের দ্বারা গণধর্ষণের সময় তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, "বল তো, সন্ত্রাসী কারা", আমি নিশ্চিত, সে আমার দিকে আঙুল তাক করত না।

সরকার বলছে সহিংসতায় আমার মন নাকি আচ্ছন্ন হয়ে আছে! আমেরিকানদের হত্যা করার জন্য আমি নাকি পাগল হয়ে আছি! একজন মুসলিম হিসাবে বর্তমান সময়ে এর চেয়ে হাস্যকর মিথ্যা আমি কল্পনা করতে পারছি না।

কখনও ঝরে যেও না ...

মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে বৃক্ষের মতো—দমকা হাওয়ার সাথে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত। এই প্রবল বাতাসের ঝাপটার মাঝে বেঁচে থাকতে হলে সে বৃক্ষটির কিছু গুণ থাকা চাই। যেমন- সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে হলে গাছটির বীজ অবশ্যই উর্বর মাটিতে বপন করতে হবে। কুরআনে ঠিক এ কথাটিই বলা আছে,

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ ... তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যেন আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন..." (সূরাহ আল-ফাতহ, ৪৮: ২৯)

তাওরাতের নিম্নোক্ত বিবরণটির কথা এখানে বলা হয়েছে:

কৃষক তার বীজ বুনতে বের হলো। বপনের সময় কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল। সেগুলোর কিছু পায়ের নিচে পিষ্ট হয় আর কিছু পাখিরা খেয়ে ফেলে। কিছু বীজ পড়ল পাথুরে মাটিতে। আর্দ্রতার অভাবে সেগুলো বড় হতে হতেই শুকিয়ে গেল। কিছু বীজ কাঁটার মাঝে পড়ল। ঐ বীজ থেকে জন্ম নেওয়া গাছের সাথে সাথে কাঁটাগুলোও বেড়ে উঠতে থাকে। একসময় কাঁটাগুলোই গাছগুলোকে মেরে ফেলে। বাকি বীজগুলো পড়ল উর্বর মাটিতে। সেগুলো বেড়ে উঠল মাথা উঁচু করে। আর বেড়ে উঠে শতগুণ বেশী শস্য উৎপাদন করল।

... এর তুলনা হলো এই—বীজগুলো হলো সৃষ্টিকর্তার বাণী। কিছু মানুষ সেই বাণী শুনার পর শয়তানের প্ররোচনায় সেগুলো অন্তর থেকে মুছে ফেলে। ফলে এরা ঈমান আনে না। তাই পরিশেষে এরা রক্ষা পাবে না। এদের তুলনা হচ্ছে পথের পাশের সেই অবহেলিত জমি।

কিছু লোক শুনার সময় আগ্রহের সাথে শুনে কিন্তু এদের আগ্রহে গভীরতা নেই। এরা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে কিন্তু প্রলোভন দেখালেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই শ্রেণির লোকের উদাহরণ হলো সেই পাথুরে মাটি যা আর্দ্রতার অভাবে গাছগুলোকে বেড়ে উঠতে দিতে পারে না। কাঁটাযুক্ত জমি হচ্ছে তাদের উপমা যারা সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনেছে কিন্তু পথ চলতে চলতে একসময় ভয় আর দুনিয়ার মোহে আটকে গিয়ে পূর্ণতা

লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কিছু লোক সৎ এবং শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনে তা আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধৈর্যের সাথে পরিশেষে ফল লাভ করেছিল। এদের উদাহরণ হচ্ছে সেই উর্বর মাটি যা বীজকে বুকে নিয়ে মহীরুহের জন্ম দেয়। (লুক ৮: ৫-১৫)

অর্থাৎ, হৃদয়কে এমন উর্বর মাটির সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে বীজ বপন করা হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) আল-ফাওয়াইদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭০) এভাবেই বলেছেন,

"সবার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে উর্বর, এতে যা বপন করা হয় তাই সহজে বেড়ে উঠে। যদি ঈমান এবং আল্লাহভীরুতা বা তাকওয়ার চারা এতে রোপণ করা হয়, তবে তা এমন সুমিষ্ট ফল দান করবে যা হবে চিরন্তন। আর যদি অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা রোপণ করা হয় তাহলে তার ফল হবে তিক্ত এবং কটু।"

তাই তুমি যখন তোমার অন্তরকে ঈমানের বীজের জন্য উর্বর করে তুলবে, তখন সেই গাছটি সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে এবং মিষ্টি ফল ধারণ করবে। হৃদয়কে উর্বর করার উপায়গুলো সামনে আলোচনা করা হবে।

যখন তোমার হৃদয়ে ঈমানের সুদৃঢ় বৃক্ষ গড়ে উঠবে, তখন একটা দমকা হাওয়া তোমার দিকে ধেয়ে আসবে। কারণ উপরে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ বলছেন শক্ত গাছটি 'কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে'। একজন দৃঢ় মুসলিমের মতো আর কোনো কিছুই এই বাতাসকে এতটা ক্ষেপিয়ে তোলে না। আর এটাই চিরন্তন বাস্তবতা। যখন ফিরআউন মূসা (ﷺ) এবং তাঁর অনুসারীদের পিছনে মিশরের মরুভূমিতে ধাওয়া করছিল তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে:

"নিশ্চয়ই এরা (বনী-ইসরাইলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।" (সূরাহ শুআরা, ২৬: ৫৪-৫৫)

এই দমকা হাওয়া তোমাকে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলে দিতে চাইবে। তুমি হয়তো চারিদিকে তাকিয়ে অন্য কিছু গাছকে সহজেই পড়ে যেতে দেখবে। কেউ হয়তো বাতাসের ধাক্কায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এরা হলো মুনাফিকরা। এদের দুর্বল মূল সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে:

"এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই।" (সূরাহ ইবরাহীম, ১৪: ২৬)

রাসূল (ﷺ) বিশেষভাবে মুনাফিককে এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন যেটা মৃদু বাতাসের সাথে সাথে দোলে না, বরং স্থীর থাকে। কিন্তু প্রচন্ড দমকা হাওয়ায় মূলসহ উৎপাটিত হয়ে যায়।[১] সুতরাং তারা দলে দলে বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাক,

তুমি তাদের মতো হয়ো না। বরং, তুমি তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করো। আল্লাহর শোকর করো যে, তিনি তোমাকে তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তারপর এগিয়ে যাও। তাদের জন্য ইসলাম ছিল একটা শখ মাত্র—এ সপ্তাহের আকর্ষণ!

যখন বাতাস বুঝতে পারবে যে, তোমাকে এভাবে মাটি থেকে সরাসরি তুলে ফেলা সম্ভব নয়, তখন সে আরো সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করবে—সে চেষ্টা করবে তোমার পাতাগুলো কৌশলে ঝরিয়ে দিতে। কিন্তু সে তোমাকে সবগুলো পাতা একসাথে ঝরাতে বলবে না। কারণ সেটা তো তার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে দেবে। বরং তখন সেই বাতাস মৃদুভাবে বইবে যাতে করে তোমার একটা পাতা ঝরাতে পারে, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা—যতক্ষণ না তুমি পাতাহীন বৃক্ষে পরিণত হও। উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব (رحمه الله) এটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"... কোনো আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেওয়া গোষ্ঠীর প্রতি শাসকবর্গের আচরণ এমন হয় যে, তারা সবসময় কূটকৌশলের মাধ্যমে সেই আদর্শিক গোষ্ঠীকে তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে শুধু সামান্য বিচ্যুত করতে চায়। তারা এর মাধ্যমে একটা সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায়। কিছু জাগতিক পুরস্কারের বিনিময়ে তারা তাদেরকে বোকা বানাতে চেষ্টা করে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা ভাবে যে তারা তাদের আদর্শের জন্য লড়ছে কিন্তু বস্তুত তাদেরকে সমঝোতা আর আপসের ছদ্মবেশে তাদের আদর্শ থেকেই বিচ্যুত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ তারা আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া এই সমঝোতাগুলোকে বড় করে দেখে না। তাই বিরোধীপক্ষও তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আদর্শ ত্যাগ করতে বলে না। বরং এদিকে সেদিকে হালকা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করে যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে মিলিত হতে পারে।

যে মানুষটি আদর্শের পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে বলে, কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তো তুমি তোমার আদর্শকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদর্শের পতাকাবাহীরা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে আপস করতে রাজি হওয়ার পর আসলে সেখানেই থেমে যেতে পারে না। কারণ এরপর যখনই এক পা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কর্তৃপক্ষ এই আদর্শবাদীদেরকে অতি সন্তর্পণে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের আদর্শ থেকে টলাতে থাকে..."

---

[১] ফুয়াদ আবদুল বাকি, আল-লুলু ওয়াল মারজান, হাদিস: ১৭৯১

তাই এই ফাঁদে পা দেবে না। বাতাসের মুখে একটা পাতাকেও ঝরতে দেবে না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিককে বাতাসের সাথে নুয়ে পড়া গাছের তুলনা দিয়েছেন তেমনি ভাবে মুমিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন।

কারণ খেজুর গাছের পাতা কখনো ঝরে না।[২] বাতাস যতই তীব্র হোক না কেন তার সামনে মুসলিম শুধু দাঁড়িয়েই থাকে না, বরং সব পাতা মেলে মাথা উঁচু করে থাকে। বাতাস যত তীব্র হবে তোমার পাতাগুলোকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর এ জন্যই তো তোমার বিরুদ্ধে বাতাসের এত ক্ষোভ!

"তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল" (সূরাহ বুরূজ, ৮৫: ৮)

কিন্তু এই বাতাস তার ক্ষোভের পেছনে ভিন্ন কারণ দাঁড় করিয়ে এই বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। সে দাবি করবে এই রাগ আসলে তোমার বিরুদ্ধে নয়। এই রাগ তো কেবল উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ কিংবা অন্য কোনো কিছুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে যাদেরকে সে সমূলে তুলে ফেলতে পারে না, যাদেরকে তাদের আদর্শ থেকে এক বিন্দুও টলানো যায় না ঐসব মুসলিমদেরকে সে ভারি অপছন্দ করে। যখন গাছটা একটা পাতাও ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তখন সেই বাতাস আরো রেগে যায়। আর যখন এই বাতাস রাগতে থাকবে, তখন আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন:

"...এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।" (সূরাহ আত-তওবাহ, ৯: ১২০)

তাই যখন প্রবল আক্রোশে বাতাস বইবে তখন ভয় পেও না। বরং তার চোখে চোখ রাখো আর:

"...বল, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১১৯)

ঐ পাতাগুলো হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার প্রতি আমানত। আল্লাহ তোমাকে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিয়েছেন। যদি তুমি তার খিয়ানত কর তবে তোমাকে এমন মানুষ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে যারা তাদের আমানত রক্ষা করবে।

---

[২] ইবনু উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'একধরনের গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর একজন মুসলিমের উদাহরণ হলো সেই গাছটির ন্যায়। আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পারো সেটা কোন্ গাছ?' তখন সাহাবারা বিভিন্ন গাছের ব্যাপারে ধারণা করতে থাকল। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) বলেন, 'আমার মনে হলো সেটি খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম।' তো, সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদেরকে বলে দিন কোন্ গাছ সেটি? তিনি বললেন, 'সেটি হলো খেজুর গাছ।' আল-লুলু ওয়াল মারজান, হাদিস:১৭৯২

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।

তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। ..." (সূরাহ আল-মায়েদা, ৫: ৫৪)

এই আয়াতটি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে গাছ এবং পাতাগুলোর বর্ণনা দেয়। এটাকে বীজ এবং পাতায় বিশ্লেষণ করা যাক।

সম্পূর্ণ গাছটি হচ্ছে দ্বীন।

তোমার অন্তরে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার বীজ থেকে এই গাছটি অংকুরিত হবে। *আত-তুহফাতুল ইরাক্বিয়াহ* নামে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর একটি সুন্দর প্রবন্ধ রয়েছে। *মাজমুয়ুল ফাতওয়ার* দশম খণ্ডের শুরুতে এটি পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি এই আয়াতে উল্লেখিত ভালোবাসার কথা ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে,

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য ভালোবাসা হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ মূলনীতি। কার্যত এটিই দ্বীনের সকল আমলের মূল ভিত্তি। মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী, আমাদের পূর্ববর্তী দুটি জাতি, ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি রেখে যাওয়া সর্বোত্তম উপদেশ হচ্ছে হৃদয়, মন এবং সদিচ্ছা দ্বারা সর্বান্তকরণে আল্লাহকে ভালোবাসা। এটাই ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের আকিদার সারকথা যা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনের নির্যাস।"[৩]

আল্লাহর জন্য ভালোবাসাই হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে প্রতিটি কাজ এবং বিশ্বাস-প্রতিটি পাতা এবং ফল-অংকুরিত হয় আর এজন্যই এই ভালোবাসাটাই এ আয়াতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর আমরা লাভ করব সেই বীজের প্রথম ফল, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা—'মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে'। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেন,

"মানুষ যাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসার মানুষকেও ভালোবাসে, সে যা ঘৃণা করে তাও ঘৃণা করে, তার সহযোগীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তার শত্রুদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে—তাই এই বিষয়ে তারা উভয়েই এক।" সহজ ভাষায় বললে, বাতাসের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দেওয়া যাতে করে তোমার মনে শত্রু আর বন্ধুর মাঝে বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। একবার যখন তুমি তোমার

[৩] ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমুয়ুল ফাতওয়া, ১০/৭৩

শত্রুকে বন্ধু ভাববে, তোমার শত্রুর কাজ তখনই সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই কখনও এই পাতাটি ঝরে যেতে দিবে না। কখনও না!

এর পরের পাতাটি হচ্ছে জিহাদ: "...তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে..."। স্পষ্টতই এই পাতাটিকে বাতাস অন্যগুলোর চেয়ে বেশি ঘৃণা করে। কেন তা বোঝার জন্য এইডস এর কথা ভাবো। এটা শরীরকে মেরে ফেলার জন্য কী করে? এইডস কিন্তু সরাসরি শরীরকে আক্রমণ করে না বরং এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অর্থাৎ শরীরের 'প্রতিরক্ষা বাহিনী'কে আক্রমণ করে যাতে করে অন্যান্য রোগ জীবাণু কোনোরকম বাধা ছাড়াই আক্রমণ করতে পারে। এই শরীরটা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর মতো। জিহাদ হচ্ছে এর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সে আক্রমণকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আর সেই বাতাস/সরকার হচ্ছে এইডসের মতো যা প্রতিরোধের এই স্পৃহাটাকে মেরে ফেলার জন্য কাজ করে যাতে করে মুসলিম উম্মাহকে আক্রমণ এবং দখল করে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এই কারণেই সাইয়্যিদ কুতুব, আব্দুল্লাহ আযযাম, আয-যারকাওয়ী, শাইখ ওসামা প্রমুখদের মতো লোকদেরকে আজ দানবরূপে চিত্রিত করা হয়। কারণ এরা প্রতিরোধের সেই চেতনাকে ধারণ করেন। আর তাই তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দিতেই বাতাস সবচে জোরে বইবে। এই ফাঁদে পা দিও না। মনে রেখো—এটা এইডস!

পরিশেষে সুদৃঢ় বৃক্ষ সেটাই যা—"কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরওয়া করবে না"। বস্তুত বৃক্ষটি তিরস্কার বা নিন্দায় প্রভাবিত হবে। কিন্তু সেভাবে নয়, যেমনটি আশা করা হয়েছিল! সেটা কেমন হবে? যখন বাতাস তোমার পাতাগুলো ঝরিয়ে দিতে চায়, যখন 'ওয়ালা এবং বারা' আর জিহাদের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে সে তোমাকে আক্রমণ আর তিরস্কার করে তখন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-এর ভাষায় তোমার প্রতিক্রিয়া হবে এমন—"যার হৃদয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সে অন্য কারো সমালোচনা বা তিরস্কারে দমে যায় না বরং এগুলো তাকে আরো শক্তভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে প্রেরণা যোগায়...।"

সবশেষে এই আয়াত আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেয় যে কুরআনের এই শিক্ষাগুলোর প্রতি সৎ থাকতে পারা হলো, 'আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন'। বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর একটা অনুগ্রহ। একটা গাছকে সোজা হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে বা ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী:

"তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট।" (সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬: ৬৩-৬৫)

শেষ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে শেষ জামানায় কারো বদলে যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে পড়বে। মানুষ চাপে পড়ে এবং নিজেদের দুর্বলতার কারণে খুব দ্রুত সত্যকে ত্যাগ করবে।

তিনি (ﷺ) বলেন: "(কিয়ামতের আগে) রাতের অন্ধকারের মতো ফিতনা আসবে। যার মাঝে একজন মানুষ মুমিন হিসেবে ঘুম থেকে উঠবে আর কাফির হয়ে ঘুমাতে যাবে, আবার মুমিন হয়ে রাত্রিযাপন করতে যাবে আর কাফির হিসাবে সকাল করবে।"[৪]

এই ধরনের ঘটনাগুলো হচ্ছে কিছু অজানা বা গায়েবী ঘটনার ফল যা আমরা মানুষেরা হয়তো ঠিক উপলব্ধি করতে পারব না। তবে, কুরআন এবং সুন্নাহতে এমন কিছু ব্যবহারিক উপায় বলে দেওয়া আছে যার সাহায্যে আমরা মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঠিক পক্ষে থাকতে পারি। এখানে আমরা শুধু দুটি উপায় আলোচনা করব এবং দুটিই একটি মজবুত বৃক্ষের দৃঢ়তার সর্বপ্রথম শর্তটির উপর আলোকপাত করে—উর্বর জমি- একটি সুস্থ হৃদয়।

❑ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় যখন কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত সূরাহসমূহের মূল বিষয় ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনি। ইসলামের জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন যে তিনিই প্রথম নন, বরং যুগে যুগে এমন আরো অনেকেই ছিলেন, এটা বোঝানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। একই সাথে আগের নবীরা কীভাবে এসব পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন সে শিক্ষাও তাঁকে এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছিল। মক্কার বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিনগুলোতে এই ইতিহাসের গল্পগুলো রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবিদের মনোবল দৃঢ় করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। এই কথাটিই নিম্নোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়,

"আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যার দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।" (সূরাহ হুদ, ১১: ১২০)

একইভাবে প্রথম দিককার মুসলিমদের সেইসব কঠোর পরীক্ষার দিনগুলোর পাশাপাশি ইতিহাস, বিশেষভাবে সেই সকল মুসলিমদের ইতিহাস অধ্যয়ন করাটা উপকারী হতে পারে যারা তাদের সময়ে কোনো না কোনো প্রকারের সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক সময় কোনো একটা পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় বুঝে উঠতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ফিকহের বই ঘাঁটি যেখানে শুধুমাত্র সৎকর্মশীলদের জীবনী পড়েই তাদের ব্যক্তিত্বকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে

[৪] মুসলিম, *আস-সাহিহ,* হাদিস নং- ৩২৮

আরো ভালো দিকনির্দেশনা পেতে পারি। 'সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা' (আলিমদের সবরের পাতা থেকে) নামক অসাধারণ বইটিতে লেখক বলেন:

"নিজের মধ্যে সৎগুণের বিকাশ ঘটাতে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরী করার একটি ভালো উপায় হচ্ছে সেই সকল আলিমদের জীবনী পড়া যারা তাঁদের অর্জিত ইলমের উপর আমল করেছেন। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সাথে ত্যাগ স্বীকার করে যাওয়া আলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের জীবনী পড়াটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বলা হয়ে থাকে এই কাহিনিগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই সকল সৈন্য যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়পাত্রদের অন্তরকে সুস্থির রাখেন। ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) বলেন, 'আলিমদের জীবনী এবং তাঁদের গুণাবলি অধ্যয়ন আমার কাছে ইলমের চেয়ে বেশি প্রিয়—কারণ এগুলো তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করে।'

তাই সৎকর্মশীলদের জীবনী অধ্যয়ন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রকে আপন করে নেয়া অন্তরকে শক্তিশালী এবং জীবন্ত করার একটি ভালো উপায়। এটি ঈমান এবং ইলমের বীজ বপনের জন্য অন্তরকে উর্বর করে তোলে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করা উচিত? শাইখ ইবনুল জাওযি (ﷺ) সাইদ আল খাতির গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবিদের জীবনী থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকারী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।'

❒ অন্তরকে দৃঢ় করার দ্বিতীয় উপায়টি আরো সহজ—শুধু তোমার রবের কাছে চাও! উম্মে সালামাহ (ﷺ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন দুআটি সবচেয়ে বেশি করতেন। উত্তরে তিনি বলেন:

"ওনার সবচেয়ে বেশি করা দু'আটি ছিল: ও অন্তর সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির করে দাও। (ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব, সাব্বিত ক্বলবি আলা দ্বীনিক)"[৫]

এই দুআটি সারাদিন সবসময় অভ্যাস করা উচিত। কাজে যাওয়ার সময় কিংবা স্কুলের বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় যখনই সুযোগ পাওয়া যায় তখনই এই সহজ দুআটি পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করা উচিত। গুপ্তধনের মতো এই দুআটিকে আঁকড়ে রাখা উচিত এবং সর্বদা এটিকে ঠোঁটের ডগায় রেখে অন্তরকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করে রাখা উচিত। এটা খুবই সহজ হওয়া সত্ত্বেও এটা যাদের খুব প্রয়োজন তাদের অনেকেই এটিকে অবহেলা করে।

[৫] তিরমিযি, আস-সুনান, হাদিস নং- ২১৪০

তাই হৃদয়কে স্থির এবং সুস্থ রাখার মাধ্যমে, অন্তরের জমিকে উর্বর রাখার মাধ্যমে তোমার শিকড়কে সুদৃঢ় করো। আর মজবুত শিকড়বিশিষ্ট গাছগুলোর শাখা-প্রশাখাই একদিন আকাশ ছোঁয়:

"পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।" (সূরাহ ইবরাহীম, ১৪: ২৪)

আর যখন তোমার শাখা-প্রশাখা আকাশ ছোঁবে, তখন কেউ তোমার পাতা পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারবে না। তারা তোমাকে বন্দী করতে পারে, তোমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে, তারা তোমার পাতা ঝরাতে পেরেছিল...

যে আফিয়া সিদ্দিকীকে আমি দেখেছি...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আফিয়া সিদ্দিকীর ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে একটা কথা জানাতে চাই। যারা এই মহিলাকে কাছ থেকে দেখেছেন, ইসলামের জন্য তার ভালোবাসা ও উৎসর্গের গল্পগাঁথা জানেন, তারা এও জানেন যে, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব সহজে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন—সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।

"নিরাপত্তার জন্য আফিয়া বিরাট হুমকিস্বরূপ"

সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, অগাস্টের ১১ তারিখে বিচারককে উদ্দেশ্যে করে এই কথাটি বলেন। আফিয়াকে তার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা থেকে বিরত রাখার জন্য এই কথাটি বলা হয়েছিল।

রাসূল (ﷺ) এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একদলে ছিল সেসব মুসলিম যারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজ দেশ বা সমাজের মানুষদের সাথে থেকে যায়, এবং তাদের ধর্মচর্চা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি অর্থাৎ নামায, রোযা, কালেমা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য দলটি ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা দ্বীনের খাতিরে হিজরত করেছিল এবং রাসূল (ﷺ) এর সাথে সামরিক মহড়া ও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। একাধিক হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই, রাসূল (ﷺ) এই দুধরনের মুসলিমদের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দেননি। যেমন, মুসলিম এবং আত-তিরমিযিতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) কোনো বাহিনীর নেতা বা আমীর নির্বাচন করার সময় শত্রুদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে তাদের সাথে কী রূপ আচরণ করতে হবে এ ব্যাপারে তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "... তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাও যেন তারা তাদের দেশ (ভূমি) ছেড়ে মুহাজিরদের ভূমিতে হিজরত করে চলে আসে,

এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও, যদি তারা এমনটি করে, তাহলে তারা মুহাজিরদের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। যদি তারা হিজরত করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, সেক্ষেত্রে তারা বেদুইনদের সমমর্যাদা লাভ করবে, আর তাদের উপর আল্লাহ তাআলার সেইসব হুকুমগুলো প্রযোজ্য হবে যেগুলো অন্য মুসলিমদের উপরেও প্রযোজ্য হয়...।"

এই পার্থক্যকরণটি খুব সুস্পষ্ট। কারণ এখানে একটি দল নিজেদের কাঁধে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব তুলে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে অন্য দলটি ইসলামের ব্যক্তিগত, বাধাধরা এবং ঝুঁকিমুক্ত কাজগুলোর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। মূলকথা হলো, রাসূল (ﷺ) তৎকালীন মুসলিমদের ইসলামচর্চাকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন: মুহাজিরদের দ্বীন বা দ্বীন আল-মুহাজিরীন, যারা দ্বীনকে সহায়তা ও দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং বেদুইনদের দ্বীন বা দ্বীন আল-আরব, যারা কেবল দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলতেন।

যদিও এ বাস্তবতা হাজার বছর আগের, তথাপি এটাই চিরন্তন বাস্তবতা যে মুসলিমদের মধ্যে এ দুটি শ্রেণি বিরাজমান থাকবে। কাজেই, যে কেউ লক্ষ করলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম-পালন-করা-মুসলিমদের(practicing Muslims) মাঝেও এ পার্থক্যটি আবিষ্কার করবে। অতীতের সেই দ্বীন আল-আরবকে সে ইসলামের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ইসলামচর্চা গতানুগতিক সেই পাঁচটি স্তম্ভ অর্থাৎ কালেমা-নামায-রোযা-যাকাত-হজ্জ, হালালভাবে জবেহকৃত পশু খাওয়া আর স্থানীয় মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা—এসবের মাঝে সীমিত। এ ধরনের মুসলিমই যখন পশ্চিমা দেশে খুঁজে পাওয়া দায়, তখন আপনি যদি পশ্চিমা দেশে এমন কারো দেখা পান, যিনি গতানুগতিক ধারার ইসলামকে ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে দ্বীন আল-মুহাজিরীনের অনুসারীদের দলে ঠাঁই করে নিয়েছেন, তাকে দেখে কি আনন্দে আপনার চোখে জল আসবে না? ভেবে দেখুন কত চমৎকার একজন মুসলিম হলে পশ্চিমা দেশে থেকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাত নয়, বরং চিন্তার জগৎ পুরো উম্মাহকে জুড়ে বিস্তৃত হয়! এই অগ্রপথিকেরা অন্যান্যদের এগিয়ে এসে উম্মাহর সক্রিয় সদস্য হতে উৎসাহিত করেন এবং রাতদিন সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যান। শত ব্যস্ততার ভীড়েও তারা ক্ষান্ত হন না। বরং তাদের হৃদয় স্পন্দিত হয় তার মুসলিম ভাইবোনদের সাথে ঐকতানে। তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে জানে এবং তাদের পরোয়া করে না—যারা কেবল খায় আর গবাদিপশুর মতো বেঁচে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে,

العبيد دنيا في الاحرار هكذا

"দাসত্বের এই দুনিয়ায় তারাই হলো মুক্ত স্বাধীন ..."

এমনই এক মানুষকে ঘিরে সারা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় চলছে। সেই মানুষটি একইসাথে একজন ছাত্রী, স্ত্রী ও তিন সন্তানের মা। ক্ষীণকায়, ছোটখাট সেই মানুষটির নাম আফিয়া সিদ্দিকী।

আমি খুব করে চাই এ মানুষটির গল্প আপনারা শুনুন! তার গল্প আমার হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে, তাই আমি চাই আপনারাও উপলব্ধি করুন কেন এই মানুষটির গল্প আমাকে প্রভাবিত করেছে। যারা তাকে চেনেন তারা জানেন, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব সহজভাবে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।

আফিয়া ছিলেন ছোটখাট, শান্ত, ভদ্র এবং লাজুক এক নারী। হৈ-হুল্লোড় কিংবা সভাসমাবেশে খুব কমই তিনি মানুষের চোখে ধরা দিতেন। কিন্তু, প্রয়োজনের সময় তিনি ঠিকই সাড়া দিতেন, আর যে কথাগুলো বলা প্রয়োজন সেগুলোই সবাইকে বলতেন। একবার বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য তহবিল সংগ্রহের দরকার পড়ল, সেখানে স্থানীয় এক মসজিদে আফিয়া তার বক্তৃতায় কড়া ভাষায় পুরুষদের তিরস্কার করলেন। পুরুষ হয়ে কেন তারা বসে আছে আর নারী হয়ে আফিয়াকে তহবিল সংগ্রহের কাজ করতে হচ্ছে? তিনি সবার কাছে আর্তি জানালেন, "পুরুষরা কোথায়? আমাকে আজকে কেন একা দাঁড়িয়ে এসব কাজ করতে হচ্ছে?" তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মা, স্ত্রী এবং ছাত্রী। আর তার চারপাশে ছিল এমন সব পুরুষ—ইসলামের কাজের কথা উঠলেই যাদের আর দেখা পাওয়া যেত না।

MIT'র ছাত্রী থাকাকালীন আফিয়া স্থানীয় মুসলিম কারাবন্দীদের কাছে কুরআনের কপি ও ইসলামি বইপত্র গাড়িতে করে পৌঁছাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় মসজিদে বইগুলোকে আনিয়ে নিতেন। তারপর ভারি বইগুলো বাক্সবন্দী করে মসজিদের খাড়া সিঁড়ি ভেঙে পুরো তিনতলা পাড়ি দিয়ে নিজ হাতে সেগুলো জেলে জেলে পৌঁছে দিতেন। সুবহানআল্লাহ, আল্লাহর কি ক্বদর—যেই মানুষটি মুসলিম কারাবন্দীদের সাহায্য করতে নিজে এত সময় আর শ্রম ব্যয় করেছেন সেই তিনি নিজেই আজ একজন কারাবন্দী (আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি যেন তিনি মুক্ত হতে পারেন)!

ইসলামের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ক্যাম্পাসেও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ত। বোস্টন ম্যাগাজিনের ২০০৪ সালের একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করেছে, "... যারা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেয়, তাদের জন্য আফিয়া তিনটি গাইড লিখেছেন। গ্রুপের ওয়েবসাইটে তিনি শিক্ষা দিতেন কীভাবে একটি দাওয়াহ টেবিল পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে স্কুলের ইনফরমেশন বুথগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়।" সেই প্রবন্ধটি আফিয়ার গাইডের কিছু কথা উদ্ধৃত করেছে।

তিনি সেখানে লিখেছিলেন, "ভেবে দেখুন! আমাদের এই বিনম্র কিন্তু আন্তরিক দাওয়াহর প্রচেষ্টা থেকেই একটি সুবিশাল দাওয়াহ্ আন্দোলন জন্ম নিতে পারে! একটু ভেবে দেখুন! আর এই আন্দোলনের হাত ধরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের সকলের পুরস্কার আমাদের খাতাতেও জমা হবে! বৃহৎ পরিসরে চিন্তা করুন এবং বড় পরিকল্পনা হাতে নিন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং কাজে আন্তরিকতা ঢেলে দেন যাতে করে আমাদের এই বিনম্র প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকে যতদিন না এই আমেরিকা একটি মুসলিম দেশে পরিণত হয়।"

আল্লাহু আকবর! তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখুন! তার আকাশ-ছোঁয়া আশা আর পাহাড়সম স্বপ্ন! পুরুষ হয়ে যদি এক নারীর কাছে এমন স্বপ্ন দেখা শিখতে হয় তবে তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবারে তার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন স্থানীয় মুসলিম শিশুদের ক্লাস নিতে। এক বোন থেকে জানতে পারি, প্রতি সপ্তাহে আফিয়া গাড়ি নিয়ে বের হতেন এবং নও মুসলিমদের একটি ছোট্ট দলকে তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উপর শিক্ষা দিতেন। আফিয়ার ক্লাস করতেন এমন এক বোন বলেন, "তিনি নিজে যেমন, তেমনই থাকতেন, বিশেষ কিছু করে কারো নজরে আসতে চাইতেন না বা বিশেষ কারো সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি স্রেফ আমাদের কাছে আসতেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। অথচ ইংরেজি তার মাতৃভাষাও ছিল না!"

আফিয়ার হালাকায় (ক্লাস) অংশ নিতেন এমন আরেক বোন বলেন, "আফিয়া আমাদেরকে বলতেন, মুসলিম পরিচয় নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেছিলেন, "দুর্বলদের প্রতি আমেরিকানদের কোনো সম্মান নেই। যদি আমরা উঠে দাঁড়াই এবং শক্তিশালী হই, তখন তারা আমাদেরকে ঠিকই সম্মান দেখাবে।"

আল্লাহু আকবর। হে আল্লাহ, আমাদের এই বোনকে মুক্ত কর!

কিন্তু এসব কিছুর মাঝেও আফিয়ার সবচেয়ে বেশি অনুরাগ কাজ করত বিশ্বের নানা প্রান্তের শোষিত ও নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতি। বসনিয়ায় যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল, তিনি তখন পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেননি। বরং, তিনি তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে যা পেয়েছেন তা নিয়ে সাধ্যের মধ্যে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলেন। সারাদিন ঘরে বসে বসনিয়া গিয়ে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম চালাবার মতো আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখার মানুষ আফিয়া ছিলেন না। বরং তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাই করলেন যা তার সাধ্যে আছে। মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে বসনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন, ডোনেশন যোগাড় করলেন, ই-মেইল করলেন, স্লাইডশো-তে বসনিয়ার অবস্থা উপস্থাপন করে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করলেন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, আফিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে একটা জিনিস দেখিয়ে

দিয়েছিলেন যে, যদি আমরা আমাদের নিপীড়িত ভাই-বোনদের জন্য কিছু একটা করতে চাই, আমাদের কিছু-না-কিছু অবশ্যই করার থাকবে। নিদেনপক্ষে, যারা অজ্ঞ, তাদের মধ্যে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের উপর কী ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি।

হাত গুঁটিয়ে পেছনে পড়ে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। একবার আফিয়া স্থানীয় মসজিদে বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য সাহায্য চেয়ে বক্তব্য রাখছিলেন। তার কথা শুনে শ্রোতাদের তেমন কোনো ভাবাবেগ হলো না, তারা তার কথা শুনে স্রেফ বসেই ছিল। তখন আফিয়া জিজ্ঞেস করলেন: "এইরুমে যতজন মানুষ আছে, তাদের কজনের একজোড়ার বেশি জুতো আছে?" রুমের প্রায় অর্ধেক মানুষ হাত তুলল। তিনি বললেন, "তো আপনারা এগিয়ে আসুন বসনিয়ার শিশুদের জন্য! যারা একটি কঠিন শীত পার করতে যাচ্ছে!" তার আর্তি এতটাই জোরালো ছিল যে, মসজিদের ইমাম পর্যন্ত তার জুতোজোড়া খুলে দান করে দেন!

ইসলামের জন্য এ নারীর তীব্র আবেগ আর ভালোবাসার গল্পের আরো অনেকটুকু আছে। তবে আফিয়া কেমন ছিলেন তা বোঝার জন্য উপরের উদাহরণগুলোই যথেষ্ট এবং আশা করি নারী হিসেবে তার ত্যাগের যে গল্প তা বোনদের আগে ভাইদেরকে নাড়া দেবে, তাদেরকে ইসলামের সেবায় যা-কিছু-আছে তাই নিয়ে নেমে পড়তে অনুপ্রেরণা যোগাবে। মনে রাখবেন, তিনি তার সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন তিনি ছিলেন একজন মা এবং একজন পিএইচডি ছাত্রী। আর আমাদের হাতে আরো বেশি সময় থাকা সত্ত্বেও তার কাছাকাছিও কিছু করছি না।

আফিয়ার এ প্রতিচ্ছবিকে মনের মধ্যে গেঁথে যখন আমি আদালতের শুনানিতে আফিয়াকে দেখতে পেলাম তখন আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আদালতকক্ষের সামনে বামের দরজাটা হালকা করে খুলে যাওয়ার পর নীল হুইলচেয়ারে বসা দুর্বল, নিস্তেজ, প্রবল-পরিশ্রান্ত এক নারী আমাদের সবার সামনে উপস্থিত হলো। তিনি তার মাথাটি সোজা করে ধরেও রাখতে পারছিলেন না। তার পরনে ছিল গুয়ানতানামো ধাঁচের কমলা কারাপোশাক, আর তার মাথা মোড়ানো সাদা হিজাবে, যেটা দিয়ে তার অস্থিসার হাতদুটো ঢাকা (কারাগারের ইউনিফর্মে হাতাকাটা থাকে)। তার উকিল দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বসার পর জামিনের জন্য শুনানি শুরু হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের কুশলি, সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, তিন-চারজন এফবিআই এজেন্টকে সাথে নিয়ে হেঁটে আসলেন। তাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল যাকে পাকিস্তানির মতো দেখাচ্ছিল (আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক এই দালালের প্রতি)। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবাদী উকিল বললেন, জামিনের আবেদনের শুনানি দেরি হবার কারণ হলো আফিয়ার শরীরের করুণ হাল। আফিয়ার উকিল মূলত বলতে চাইলেন, আফিয়ার এ মুমূর্ষু অবস্থায় জামিন নয়, বরং সবকিছুর আগে তাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। লাভিন উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানাল, আফিয়া

আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বিচারক সে কথা খুব একটা আমলে নিলেন মনে হলো না। ফলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলে চললেন, "এ এমন এক নারী যে বন্দী অবস্থায় বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।" একথা শুনেই আমি আফিয়াকে দেখলাম এবং লক্ষ করলাম আফিয়া খুব হতাশা আর কষ্ট নিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, আফিয়া ছিলেন খুব ছোটখাট আর তিনি এতটাই নুয়ে পড়েছিলেন, আমি কেবল তাকে পেছন থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি শুধু এতটুকুই দেখেছি তার মাথা বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হিজাবে তার মাথা মোড়ানো এবং ডান হাত বের হয়ে আছে।

তিনি কেন এতটা মনোকষ্টে জর্জরিত আর বিষাদগ্রস্ত ছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছি যখন তার উকিল তার শারীরিক অবস্থা বিশদভাবে তুলে ধরলেন:

-আমেরিকার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন সময় থেকে তার ব্রেইন ড্যামেজ হয়েছে।

-আমেরিকান সরকারের অধীনে থাকাকালীন সময়ে তার একটি কিডনী সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

-তিনি খেতে পারছেন না কেননা অপারেশনের সময় তার অন্ত্রের কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এটিও ঘটেছে আমেরিকান প্রহরায়।

-গুলিবিদ্ধ স্থানের সার্জারি করতে গিয়ে তার শরীরে প্রলেপের পর প্রলেপ জুড়ে সেলাই করা হয়েছে।

-তার শরীরে বুক থেকে শুরু করে পুরো ধড় জুড়ে অস্ত্রোপচারের বিশাল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

এ সব যন্ত্রণা নিয়ে আমেরিকায় কারারুদ্ধকালীন পুরো সময়জুড়ে তাকে একবারও ডাক্তার দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। আফগানিস্তানে তার অযত্ন-অবহেলায় অপারেশনের পর তার পেটে অবিরত অসহ্য ব্যথা হওয়ার পরেও না। বরং এই ব্যথার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে আইবোপ্রোফেন নামের একটি ব্যথানাশক ঔষধ, যেটা কিনা লোকে খায় মাথাব্যথার জন্য!

এসব কিছুর পরেও, সরকারপক্ষের আইনজীবী বেহায়া এবং নির্লজ্জের মতো তাকে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখার স্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন, যুক্তি দেখিয়ে চললেন আফিয়া নাকি "নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ"। যখন বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আফিয়াকে এভাবে একদম প্রাথমিক চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখা হলো, তখন এটর্নি সাহেব তোতলাতে শুরু করলেন এবং বললেন, "আসলে তখন পরিস্থিতি খুব জটিল আকার ধারণ করেছিল", এবং নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য প্রত্যাশিতভাবেই অত্যন্ত সস্তা একটা কুযুক্তি ধার

করলেন, "এটি আফিয়ার নিজের সিদ্ধান্ত যে তিনি পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিজেকে দেখাতে চাননি"। আইনজীবী যখনই একথা বললেন, আফিয়া তাঁর জীর্ণশীর্ণ হাত তুলে অতিকষ্টে ডানে-বামে নেড়ে যেন বিচারককে বলতে চাইলেন, "না! সে মিথ্যে বলছে!"। আমার খুব কষ্ট লাগল। চোখের সামনে এভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ঝুরি ঝুরি মিথ্যা বলতে দেখে আফিয়ার চেহারায় প্রচণ্ড হতাশার ছাপ দেখা দেয়। তখন আইনজীবী তখন তার কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরে পায়ের উপর বসিয়ে দিলেন এবং হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন।

শুনানি যখন শেষ হলো, আমার তখন ইবনুল কাইয়্যিম (رحمه الله)-এর একটি সুগভীর উক্তি বারবার মনে পড়তে লাগল, তিনি বলেছিলেন, একজন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না,

"...শেষ প্রতিবন্ধকটি অবশিষ্ট থাকবে যা থেকে শয়তান তাকে তাড়া করে এবং বান্দাকে অবশ্যই এই প্রতিবন্ধকের মোকাবেলা করতে হবে। যদি কেউ এই বাধা থেকে রক্ষা পায় তাহলে তারা হলেন আল্লাহর নবী এবং রাসূলগণ, যারা সৃষ্টির সেরা। এটি হলো শয়তানের সেই প্রতিবন্ধকতা যেখানে শয়তানের বাহিনী মুমিন বান্দার উপর চড়াও হবে এবং বিভিন্ন প্রকারে তার ক্ষতিসাধন করে—হাত, জিহবা এবং অন্তর দ্বারা। ঈমানের মাত্রা অনুযায়ী এই পরীক্ষার মাত্রাও ভিন্ন হবে। বান্দার ঈমান যত বেশি হবে, শত্রু তত বেশি করে তার বাহিনীকে বান্দার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে। শয়তান তার অনুসারী ও মিত্রদের সহযোগিতায় বান্দাকে গুড়িয়ে দিতে চাইবে। এই বাধাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা আল্লাহর দিকে আহবানে সে যত দৃঢ়তার পরিচয় দিবে এবং আল্লাহর অর্পিত আদেশ পালনে ব্রতী হবে, শয়তান ততবেশি করে মূর্খলোকদের মাধ্যমে তাকে ধোঁকা দিতে তৎপর হবে। কাজেই, যে বান্দা তার শরীর ঈমানের বর্মে আচ্ছাদিত করে আল্লাহর রাহে, আল্লাহর নামে শত্রুকে মোকাবেলা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল, তার এই ইবাদাত হলো, সকল ইবাদাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ ইবাদত।"

ইবনুল কাইয়্যিমের এই কথাগুলো আদালতের সেই দৃশ্যে পরিষ্কারভাবে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আদালতে আফিয়ার শরীরে দুর্বলতা আর নাজুকতার ভাব থাকলেও, সারাটা সময় জুড়ে আমি তার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্মান ও শক্তির একটি ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। আদালতে তার সবকিছু, আইনজীবীর মিথ্যা অভিযোগে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ; যে হিজাবের কথা এ ধরনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ

মানুষের মনেই থাকার কথা না, আদালতকক্ষে সে হিজাবে নিজেকে আবৃত রাখার প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ; আদালত কক্ষে এফবিআই এজেন্ট, ইউএস মার্শাল, রিপোর্টার, অফিসিয়াল-সকলের এই নুয়েপড়া-দুর্বল-ছোটখাট-শান্তদর্শন মহিলার দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকা—এ সব কিছু একটা জিনিস নির্দেশ করে, আর তা হলো এ

সবাই আফিয়ার একটি জিনিসকে নিয়েই শঙ্কিত আর ভীতসন্ত্রস্ত—সেটি হলো আমাদের এই বোনের ঈমান।

এই হলো আমাদের প্রিয় বোনের অবস্থা, কুফফারদের হাতে বন্দি এক মুসলিম নারী ... কী বলার আছে আমার?

মুসলিম বন্দী মুক্ত করার ওয়াজিব দায়িত্বের কথা বলে আমি আমার এ লেখা শেষ করব না। আমি খলিফা আল-মুতাসিমের উদাহরণ টেনে এনে বলব না দেখুন তিনি কেবল একজন মুসলিম নারীকে উদ্ধার করার জন্য একটা শহর ধসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সালাহউদ্দীন কিংবা উমার বিন আব্দুল আযীযের কথা আপনাদেরকে শোনাব না যারা কিনা হাজার হাজার মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করেছিলেন। এ চমৎকার গল্পগুলো আপনাদের সামনে বলার লোভ আজকে আমাকে সংবরণ করতে হবে। কেন জানেন? কারণ, দুঃখের কথা এই নয় যে—আফিয়া বন্দী। বরং দুঃখের কথা হলো, পাঁচ লক্ষ মুসলিমের শহরে মাত্র অল্প কিছু মুসলিমও আফিয়ার শুনানির দিনে উপস্থিত থাকার কাজটাকে ঝামেলার ব্যাপার মনে করে নিজের গা বাঁচাতেই বেশি আগ্রহী। দুঃখ হলো এই, পুরো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মুসলিম সংগঠন এই বোনটির পক্ষে এগিয়ে আসল না, তার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। ইবনুল কাইয়্যিম ঠিকই বলেছিলেন, “যদি গাইরাহ (উম্মাহকে আগলে রাখার প্রবল ঈর্ষা) মানুষের হৃদয় ত্যাগ করে চলে যায়, তবে সে হৃদয় থেকে ঈমানও হারিয়ে যায়।”

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটা সময়ে যখন আমাদের বেশিরভাগই দ্বীন আল-আরবের অনুসারী হয়ে কেবল নামায-রোযা নিয়েই পড়ে আছে, তখন আফিয়া সিদ্দিকীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে—সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারতেন একমাত্র আফিয়া নিজেই।

এবং আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।

‘মন’—যা আমরা প্রথমেই হারিয়েছি

বিষয়টা একটা রুটিনে পরিণত হয়েছে।

প্রতিদিন সকালে আমরা আমাদের সেল থেকে বেরিয়ে ধূসর দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। গিয়ে দেখতাম বরাবরের মতো সেটি তালা দেওয়া। গার্ড এসে তালা খুলে দেওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকতাম, এরপর বের হতাম। পরে একসময় মর্নিং শিফটের গার্ড বদল হলো। নতুন গার্ড আমাদের সেলের তালা খোলার আগেই দরজার তালা ঠিকঠিক খুলে রাখত। তারপরও দেখতাম নিচতলায় কিছু কয়েদী তালা খোলার জন্য গার্ডের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভেবেছিল দরজার তালা আগের মতোই মারা থাকবে। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তারা দরজা ভালো মতো দেখেছে কি না। তারপর আমি দরজায় ধাক্কা দেওয়া মাত্রই তা খুলে গেল।

‘রুটিন’ জিনিসটা এমনই, আপনার সচেতনতাকে নষ্ট করে দেবে। রুটিন মনোযোগী একটা মানুষকে অমনোযোগী বানিয়ে ফেলে। কারাগার জিনিসটা একটা রুটিনের মতো। এখানে একই জায়গা, একই দৃশ্য, একই শব্দ, একই গন্ধ, একই স্বাদ আর মানুষের সাথে থাকতে হয়—বছরের পর বছর। এই রুটিন এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষজন বেশিরভাগ সময় এখানে খেয়ালও করে দেখে না সে কী করছে। কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু ‘মন’ নেই—একদম বেখবর। এই মন না থাকা থেকে তৈরি হয় একঘেয়েমি, একঘেয়েমি থেকে আসে বিরক্তি।

পৃথিবীটা নিজেই একটা বড়সড় কারাগার। আর আপনাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ পীড়াদায়ক একটা রুটিন আছে। তবে সত্যি বলতে, মুসলিম হিসেবে আপনার রুটিনের একটি অংশ হলো নিজেকে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে—আপনি এই বিরক্তিকর রুটিন থেকে মুক্ত হতে সক্ষম। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

“জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই অন্তরের সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়।” (সূরাহ আর -রা’দ ১৩:২৮)

এরপরেও কেন আপনি এই প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না?

কারণ আপনি এক রুটিন থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু অন্য আরেকটি রুটিনে আটকে যাচ্ছেন। যেমন- আপনি যিকির করছেন, কিন্তু তাতে যদি 'মন' না থাকে, যদি এই যিকির একটা রুটিন কাজে পরিণত হয়, তাহলে তাতেও বিরক্তি ধরে যাবে। যেমনটা ইবনু মাসউদ (ﷺ) তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে খুব ঘন ঘন পড়াই না, যাতে তোমরা বিরক্ত না হয়ে যাও। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বিরক্তি উদ্রেকের আশংকায় নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ নিয়মিত বিরতিতে) শিক্ষা দিতেন।"[৬] ইবনু আব্বাস (ﷺ) তাঁর এক ছাত্রকে বলেছিলেন, "মানুষকে সপ্তাহে মাত্র এক দিন শিক্ষা দেবে। যদি তা যথেষ্ট না হয়, তবে দুই দিন, তাতেও না হলে তিন দিন। কিন্তু মানুষকে কুরআনের ব্যাপারে বিরক্ত করে তুলবে না।"

কে কতটুকু শিখতে পারবে তা নির্ভর করে ছাত্রের সক্ষমতার উপর। কিন্তু মন না থাকার সমস্যাটা একজন খতিবকেও পেয়ে বসতে পারে। একজন সালাফ বলেছিলেন, "নাসীহা যদি অন্তর থেকে না আসে, তাহলে তা নিষ্ফল। অন্তরের কথা অন্তরে গিয়ে পৌঁছায়। আর মুখের কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যায়।"

কুরআন তিলাওয়াত একটা মন থেকে বিচ্ছিন্ন রুটিন বা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে শেষ করে, সে তা বুঝতে পারে না।" আমাদের সময়ে যে বিষয়টি এমন হয়ে যাবে, তা ইবনু উমার (ﷺ)-ও টের পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমাদেরকে দিয়ে এই উম্মতের সূচনা। তোমরা এমন সাহাবি দেখবে যিনি হয়তো কুরআনের কেবল একটি সূরাহই ভালো মতো পারেন। কারণ কুরআন তাঁদের কাছে অনেক ভারি কিছু। আর তাঁদেরকে এই কুরআন অনুধাবন ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উম্মতের পরবর্তী অংশের কাছে এ কুরআন এতই হালকা হবে যে—একজন শিশু বা অনারবও তা পাঠ করবে কিন্তু তারা এর কিছুই বুঝবে না।"

এমনটা হতে পারে সিয়াম পালনের ক্ষেত্রেও। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "এমনও হতে পারে যে, একজন মানুষ সাওম রাখল কিন্তু সে সাওম থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ করল না।" তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন সাওম রাখে, সে আসলে সওম রাখেনি।" এর ব্যাখ্যায় ইবনু রজব (ﷺ) বলেছেন, "এমন ব্যক্তি খাবার, পানীয় ও যৌনাকাঙ্ক্ষার অভাবের চ্যালেঞ্জটিই অনুভব করে না। সিয়াম তার কাছে একটা রুটিনের মতো, এতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।"

স্রেফ অভ্যাসের বশে একটা ইবাদাত করা—এটা সালাতের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "এমন অনেক লোক আছে যারা সালাত আদায় করে, কিন্তু তাদের সালাত পুরোপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হয় না।

[৬] বুখারি, আস-সাহিহ, ইলম অধ্যায়, হাদিস নং-৭০

বরং তাদের কেউ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, তিনের-একাংশ বা অর্ধাংশ সাওয়াব পেয়ে থাকে।"

এমনকি আপনার ইসলাম—এই দ্বীন ইসলামও হতে পারে আপনার জন্য নিছক একটা রুটিন—একটা অভ্যাস মাত্র! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন মুনাফিককে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে উত্তর দেবে, 'আমি জানিনা! মানুষ এ কথা বলতো, তাই আমিও বলেছি!' এরপর তাকে একজন বোবা, কালা, অন্ধ লোকের কাছে তুলে দেওয়া হবে যার কাছে এমন এক হাতুড়ি আছে যা দিয়ে একটা পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া সম্ভব! কিন্তু সেই লোকটি সেই হাতুড়ি দিয়ে সেই মুনাফিককেই বিচূর্ণ করে দেবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আবার তার শরীর পুনর্গঠন করবেন যেন আবার তাকে শাস্তি দেওয়া যায়। এই হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই, যে ইসলাম কেবল অভ্যাসের বশে পালন করা হয়, সে ইসলাম কোনো ইসলাম নয়। ইবনু হাজার (ؒ) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এই হাদিসটি আকিদার (মৌলিক) বিষয়ে তাকলীদ করার ব্যাপারে নিন্দা করছে, কারণ এই হাদিসে যারা বলে, 'মানুষ বলত, তাই আমরাও বলতাম!'—তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"

সত্যি বলতে, সবার আগে আমরা যে জিনিসটি হারিয়েছি তা হলো আল্লাহর ইবাদাত করার মর্যাদা, মন থেকে আল্লাহর ইবাদাত করা। হুযায়ফা (ؓ) বলেছিলেন, "দ্বীনের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম তোমরা হারাবে তা হলো—ইবাদাতের খুশু।" অনেক অনেক বছর আগে তাঁরা যে ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন—সেগুলো আজ আমাদের মধ্যে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি যদি নিজের অবস্থান জানতে চান, তাহলে চলুন নিজেকে কিছু প্রশ্ন করি।

☐ আমরা যখন কালিমা শাহাদাহ পাঠ করি, আমরা কি স্রেফ মুখে বুলি আওড়াচ্ছি? নাকি আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পড়ছি? এর অর্থ আর দাবি বুঝে পড়ছি তো? আল্লামা মাওদুদি (ؒ) বলেছেন, "মুমিন এবং কাফিরের পার্থক্য কেবল কয়েকটি শব্দ আওড়ানোর মাঝে নয়। নতুন কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করায় কিছু আসে যায় না। আসল পার্থক্য তো তখনই তৈরি হবে যখন আপনি জেনেবুঝে এই বিশ্বাসকে গ্রহণ করবেন এবং নিজের জীবনে সম্পূর্ণভাবে তা মেনে চলবেন। 'খাবার' কথাটা বারবার বললেই ক্ষুধা মিটে যায় না, 'ঔষধ' কথাটা আওড়াতে থাকলেই রোগ সেরে যায় না। ঠিক একইভাবে, না বুঝে শাহাদাহ পাঠ করলে সেই বিপ্লব কখনো সাধিত হবে না—যে বিপ্লবের ক্ষমতা কালিমা শাহাদার দ্বারা হতে পারত। এটা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন আপনি এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ অনুধাবন করে কথায় ও চেতনায় একে ধারণ করবেন। আপনি আগুন এড়িয়ে চলেন, কারণ আপনি জানেন এটি পুড়িয়ে দেয়। আপনি বিষ এড়িয়ে চলেন, কারণ আপনি জানেন এটি প্রাণনাশক।

একইভাবে আপনি যখন তাওহীদের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন—তখন আপনি সবরকম শির্ক ও কুফর এড়িয়ে চলতে পারবেন।"

❒ আমরা যখন সালাতে দাঁড়াচ্ছি, তা স্রেফ 'অভ্যাসের-বশে-সালাত' হয়ে যায়নি তো? নাকি আমরা সালাতের জন্য ভেবেচিন্তে সময় বের করছি? সালাতের সময় বলা কথাগুলো বুঝে পড়ছি, বুঝে বলছি তো? রিফাআহ আয-যুরাকি (ﷺ) একবার নবীজি (ﷺ) এর পেছনে সালাত পড়ছিলেন। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ রুকু থেকে মাথা তুলে বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ (আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা তাঁর প্রশংসা করেছে)।' তখন আমার পেছন থেকে এক লোক বলে উঠলেন, 'রাব্বানা লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি (হে আমাদের রব্ব! প্রশংসা আপনার জন্য—যে প্রশংসা অত্যধিক, পবিত্র, ও বরকতময়)।' সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'ঐ কথাটি কে বলেছে?' ঐ লোকটি বললেন, 'আমি।' রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি ত্রিশজনেরও বেশি ফেরেশতাকে এর সাওয়াব লেখার জন্য হুড়াহুড়ি করতে দেখেছি।'" অন্যান্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রিফাআহ নিজেই ওই ব্যক্তি। এখানে বিশেষত্ব কী? বিশেষত্ব হলো—সেই লোকটি প্রতিটি বর্ণ সত্যিকার অর্থেই মন থেকে বলেছেন। ইবনু হাজার (ﷺ) ব্যাখ্যা করেন, "ফেরেশতাদের সংখ্যার পেছনের রহস্য হলো এই যে, সেই যিকিরের বর্ণসংখ্যা আর ফেরেশতার সংখ্যা সমান।" মূল আরবিতে কথাটির বর্ণসংখ্যা তেত্রিশ।

❒ নিজেকে প্রশ্ন করুন, রামাদান শুরু হলে আমরা কি আবার সেই আনমনা অভ্যাসের ঘুরপাকে বর্তে যাব? নাকি আমরা জেনেবুঝে সজ্ঞানে সাওম পালন করব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সুবহে সাদিকের আগে যে সাওমের নিয়ত করল না, সে সাওম রাখেনি।" এর ব্যাখ্যায় আশ-শাওকানি (ﷺ) বলেন, "এর বাহ্যিক অর্থ হলো প্রতিদিনই সাওমের জন্য নতুন করে নিয়ত করতে হবে।" অতীতে এক নেককার নারী ছিলেন, যিনি বছরের উষ্ণতম দিনটি বেছে নিয়ে সেদিন সিয়াম পালন করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, "দাম যখন কমে যায়, তখন তো সবাই-ই কিনতে যায়।" অর্থাৎ তিনি এমন দিনে সাওম রাখার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন, যে সময়টায় আর কেউই তা পারে না। এটি হলো রুটিন থেকে বেরিয়ে আসার একটি কার্যকর উপায়। এমনকি রাসূল (ﷺ) নিজেও শাবান মাসে বেশি বেশি সাওম রাখতেন, কারণ "এই মাসটিকে মানুষ অবহেলা করে।"

❒ মুসহাফ খুলে যখন কুরআন তিলাওয়াত করছি তা কি নিছক রুটিনের কারণে করছি? নাকি আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলো আমরা সময় নিয়ে বুঝেশুনে সত্যিকার অর্থেই তিলাওয়াত করি? ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (ﷺ) ছিলেন ডাকাত, হাইওয়ে রাস্তায় মানুষকে পেলে ডাকাতি করতেন। তিনি এক নারীকে ভালোবাসতেন।

তার সাথে দেখা করার জন্য তিনি একটি দেওয়াল টপকে পার হচ্ছিলেন, এমন সময় শুনলেন এক ব্যক্তি তিলাওয়াত করছে, "...ঈমানদারদের জন্য কি সময় আসেনি আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হওয়ার?..." (সূরাহ আল-হাদীদ ৫৭:১৬)। ফুদাইল ইবনু ইয়াদ বললেন, "হে রব! সময় তো এসেছে!" তিনি এরপর সাথে সাথে তাওবাহ করলেন। আর তারপর থেকে তিনি পরিচিতি পেলেন কুরআনের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে। তিনি খুব মন দিয়ে তিলাওয়াত করতেন। তাঁর এক বন্ধুর ভাষায়, "তাঁর তিলাওয়াত ছিল দুঃখমাখা, আনন্দভেজা, ধীরস্থির আর মসৃণ—যেন তিনি কাউকে সম্বোধন করে কথা বলছেন।"

❑ খুতবা প্রদান নিয়ে ভেবে দেখি, এটা আমাদের কাছে স্রেফ রুটিন-ওয়ার্ক এর মতো হয়ে যায়নি তো? যা বলছি, মন থেকে বলছি তো?

অতীতে ক্রুসেডারদের সবচেয়ে বিখ্যাত 'খতিব' ছিলেন বার্নার্ড অব ক্লেয়ারভক্স। তিনি ছিলেন ফরাসি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী পাড়ি দেওয়ার জন্য তিনি অসংখ্য পশ্চিমা ইউরোপিয়ানদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ৫৪২ হিজরি মোতাবেক ১১৪৭ ঈসায়ী সালে দ্বিতীয় ক্রুসেড শুরু হয়। এই ক্রুসেডে ইউরোপিয়ান সামরিক জোটের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সের সপ্তম লুই এবং জার্মানির তৃতীয় কনরাড। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এশিয়া মাইনর থেকে শুরু করে দামেস্ক পর্যন্ত অভিযান চালানোর। দামেস্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কারণ হলো, এলিজাহ নামক তাদের এক পুরোহিত স্বপ্নে ঈসা (ﷺ)-কে দেখেছে বলে দাবি করেছিল, আর সেই স্বপ্নে ঈসা তাদেরকে দামেস্ক বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। এই স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রুসেডাররা দামেস্কের দিকে রওনা হলে সেই শহরের মসজিদুল আমাউয়িতে দাঁড়িয়ে খতিব সিবত ইবনুল জাওযি (ﷺ) (ইবনুল জাওযির নাতি) বললেন,

"হে লোকেরা! তোমাদের কী হলো? তোমরা তোমাদের দ্বীনকে ভুলে গেছ, নিজেদের মর্যাদাকে তোমরা পরিত্যাগ করেছ, আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছ! আর তাই আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করছেন না। তোমরা ভাবছ মর্যাদা তো মুশরিকদের জন্য! অথচ আল্লাহ মর্যাদা রেখেছেন কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য। ধিক তোমাদের! আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনেরা আজ এমন এক ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, যে ভূমিকে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের রক্ত দিয়ে সেচ করেছিলেন। আর তা দেখেও তোমাদের অন্তর ব্যথিত হয় না? চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না? তারা তোমাদের লাঞ্ছিত করছে, তোমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে অথচ তোমরাই ছিলে এই জমিনের শাসনকর্তা। তোমাদের ভাইদের চারপাশ থেকে শত্রুরা ঘিরে ধরেছে, প্রচণ্ড আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে—এই দৃশ্য দেখেও তোমাদের অন্তরে কোনো ভাবাবেগ হয় না? জযবার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় না?

তোমরা কি খেয়েদেয়ে জীবনের মজা উপভোগে ব্যস্ত থাকবে, যখন ওখানে তোমাদের ভাইয়েরা আগুনের পোশাক পরে আছে আর কয়লার বিছানায় ঘুমোচ্ছে?"

তিনি বলে চললেন, "তোমরা যদি যুদ্ধের ঘোড়ার পিঠে চড়তে না জানো, তবে জায়গা ছেড়ে দাও নারীদের জন্য। যুদ্ধের চাকা তারাই সচল রাখুক। তোমরা যাও, সুগন্ধি আর মাসকারা লাগাও, দাড়ি-টুপিওয়ালা নারীর দল কোথাকার! যদি তোমরা এমনটা না হও, তবে যাও, ঘোড়ায় পিঠে চড়ে বসো! এই নাও ঘোড়ার জিন আর লাগাম। লোকেরা, তোমাদের বলছি, তোমরা কি জানো না এই জিন আর লাগাম কীসের তৈরি? মহিলারা নিজেদের চুল দিয়ে এগুলো গেঁথেছেন, কারণ দেওয়ার মতো আর কিছু তাঁদের ছিল না। আল্লাহর কসম করে বলছি এই বিনুনিগুলো সেই কুমারী নারীদের, যারা ঘরের ভেতর এমন পর্দায় থাকেন যে সূর্যের আলো তাঁদের স্পর্শ করেনি।"

তিনি বলে চলেন, "শোনো, তোমরা যদি এগুলো ঘোড়ায় পরাতে না জানো, তাহলে যাও! ওগুলো জুলফি আর বেণী বানিয়ে নিজের মাথায় পরে বসে থাকো! এগুলো মেয়েদেরই চুল! ভাইয়েরা আমার, তোমাদের মধ্যে কি অনুভূতি বলে কিছু নেই?" এই বলে তিনি লাগাম দুলিয়ে বললেন, "হে মসজিদের খুঁটিগুলো, তোমরা দুলে ওঠো! দালানের পাথরেরা, তোমরা ভেঙে পড়! হে হৃদয়সমূহ, দুঃখ-বেদনায় পুড়ে তোমরা ছারখার হয়ে যাও! পুরুষেরা আজ তাদের পৌরুষ হারিয়েছে..."

এই খুতবার একটু পর সত্তর হাজার ক্রুসেডার দামেস্ক অবরোধ করে। শহরের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বাসিন্দা তাদের মোকাবেলা করতে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা প্রচণ্ড সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন। যারা বেশি বয়স্ক ছিলেন, তাঁরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে দু'আ করতে লাগলেন। আলেপ্পো এবং মসুল থেকে পর্যন্ত সেনাবাহিনী চলে এলো ভাইদের সাহায্য করতে। ক্রুসেডাররা এই সেনাবাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে পিছু হটে গেল এবং শেষে ইউরোপে পালিয়ে গেল (তবে সেটা ঘটেছিল এলিজাহ খুন হবার পরে)। কেন? কারণ সিবত ইবনুল জাওযির সেই খুতবা ছিল একেবারে অন্তর থেকে নিংড়ে আসা, আর তাই সেটি শ্রোতাদের অন্তরে গিয়ে কড়া নেড়েছে।

সালাফরা মনোযোগহীনতার এই রুটিনের কারাগার থেকে পালাতে পেরেছিলেন বলেই আল্লাহর যিকিরে তাঁরা প্রশান্তি পেতেন। খতিব ইবনুল জাওযি (ﷺ) যার বংশধর সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে আল-মুযানি (ﷺ) মন্তব্য করেছিলেন, "আবু বকর (ﷺ) নিছক তাঁর সালাত বা সিয়ামের মাধ্যমে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেননি। বরং তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন কারণ তার হৃদয়ে কিছু একটা জায়গা করে নিয়েছিল (যা তোমাদের হৃদয়ে নেই, সেটা হলো 'মন')।"

ফল হাতে প্রবেশ নিষেধ!

কিছুদিন আগে একটা চিঠি পেলাম। লেখক চিঠিতে নিজের জীবনে যেসব দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং যেগুলো তার কাছে মনে হচ্ছে অন্তহীন—সেগুলো নিয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। চিঠিতে একটা লাইন ছিল:

"আমি ক্রুদ্ধ ... কেন আল্লাহ্ আমার দু'আ শুনছেন না? কেন?"

তার চিঠিটা পড়ার পর, সিদ্ধান্ত নিলাম তার জবাব হিসেবে এই লেখাটা লেখার। দুঃখজনক হলেও সত্যি এধরনের প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। এরকম হওয়ার কারণ হলো, দু'আ (আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাওয়া) কীভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে আমাদের মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে।

আমরা দু'আকে যেকোনো বিপদের সময়, কঠিন মুহূর্তে প্যানিক বাটনের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আপনি একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ্ বারবার কুরআনে বলেছেন যে দরকারের সময় তাঁকে ডাকবে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন। সুতরাং, আপনি মনে করলেন যদি ঠিকঠাক মতো দু'আ করতে পারেন (রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, মনোযোগের সাথে ইত্যাদি) তাহলে ঠিক পরদিন সকালেই আপনি আপনার দু'আর "জবাব" পেয়ে যাবেন। আর যদি না পান, তাহলেই আপনি ভিতরে ভিতরে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে সন্দেহ করা শুরু করবেন!

আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) একটি হাদিসে এই বিষয়ে বলেছেন। যদিও বুখারি ও মুসলিম—দুই জায়গাতেই এই হাদিসটি আছে, তবে আমাদের আলোচনার জন্য মুসলিমের বর্ণনাটি অধিকতর উপযুক্ত:

"একজন ব্যক্তির দু'আর জবাব দেওয়া হতে থাকে—যদি সে অন্যায় অথবা হারাম কিছুর জন্য দু'আ না করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে—যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাড়াহুড়া না করে এবং অধৈর্য না হয়।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হলো - "কীসের দ্বারা ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে যাবে?" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাব দিলেন—"সে বলবে আমি দু'আ করছি এবং করতেই থাকছি কিন্তু আমি দেখছি আমার দু'আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে সে আশা হারিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহ্-কে স্মরণ করা ছেড়ে দেবে।"

এই হাদিসটি বেশ কৌতূহল উদ্দীপক এবং আমরা যদি গভীরভাবে হাদিসটি বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে কীভাবে দু'আ কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে না—সে বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারব। একটু খেয়াল করুন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী ধরণের শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন: "... তাঁর দু'আর জবাব দেওয়া হতে থাকবে।" একবার অধৈর্য ব্যক্তির অভিযোগের সাথে তুলনা করুন তো "আমি দেখছি আমার দু'আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না।" আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাপার দুটো পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। এটা কীভাবে সম্ভব যে একজন ব্যক্তির দু'আর জবাব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে সে কোনো ফল পাচ্ছে না? দু'আর উত্তর কোথায়?

ব্যাপারটা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দু'আর জবাব একসাথে না এসে, ধাপে ধাপে আমাদের কাছে আসে। যেমন এমন কিছু হয়তো ঘটবে যার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার দু'আর জবাব আসছে না।

মনে করুন আপনি একটা কক্ষে বন্দী। মুক্তির একমাত্র উপায় জানালা ভেঙে বের হওয়া। কিন্তু আপনার সম্বল শুধুমাত্র ছোট কিছু পাথরের টুকরো। আপনি জানালায় একটা ছোট পাথর ছুঁড়লেন। তাতে জানালা ভাঙল না, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম একটা ফাটল ধরল। আপনি আরেকটা পাথর ছুঁড়লেন। আরেকটি ছোট ফাটল। আপনি আবার একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন, তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো জানালা অসংখ্য সূক্ষ্ম ফাটলে ভরে গেল।

শেষবারের মতো আপনি একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন এবং জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। ফলে আপনি বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। দু'আও এভাবেই কাজ করে। আপনি প্রতিটি দু'আর মাধ্যমে আংশিক জবাব পেতে থাকেন এবং আপনি ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে একই দু'আ বারবার করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত দু'আর পরিপূর্ণ জবাব পাবেন।

এজন্যই গুহায় আটকে পড়া তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে যে অতি পরিচিত হাদিসটি আছে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম ব্যক্তির দু'আর ফলে গুহামুখের পাথরটি সামান্যই সরেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির দু'আর পর পাথরটি আর একটু সরলো। এবং তৃতীয় ব্যক্তির দু'আর পরই তাঁরা তিনজন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ফল পেলেন—পাথরটি ওই পরিমাণে সরলো যার ফলে তাঁরা গুহা থেকে মুক্তি পেলেন।

মনে রাখবেন প্রথম পাথরটি শুধু একটি ফাটলই ধরাবে। কিন্তু যদি আপনি পাথর ছুঁড়তে থাকেন তাহলে এক সময় জানালা ভেঙে যাবে এবং আপনি মুক্ত হবেন। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। এই জন্যই হাদিসটিতে আমাদের বলা হচ্ছে - "...যতক্ষণ পর্যন্ত সে অধৈর্য না হচ্ছে"

আপনি যখন কোনো চারাগাছে পানি দেন, তখন নিশ্চয় আপনি একসাথে ত্রিশ গ্যালন পানি ঢেলে দিয়ে, কেন মাটি থেকে বিশাল বটবৃক্ষ বের হচ্ছে না সেটা নিয়ে চিন্তা করতে বসেন না। বরং আপনি ধৈর্য সহকারে প্রতিদিন একটু একটু করে পানি দিতে থাকেন এটা জেনে যে, যত সময়ই লাগুক না কেন—শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফুলটি পাবেন।

একইভাবে আপনি জানেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং আপনার দু'আর জবাব দেবেন, এটা সত্য। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিকভাবে দু'আর উত্তর পাওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম না। নিয়ম হলো আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে এর উত্তর পাওয়ার প্রক্রিয়া সময় ও ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল।

যেমনটি ইবনুল জাওযি (ﷺ), সাইদুল খাতির গ্রন্থে বলেছেন:

"কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা শেষ হওয়ার একটি নির্ধারিত সময় আছে যা শুধু আল্লাহ্ জানেন। তাই যে ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় আসার আগে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা কোনো কাজে লাগবে না। ধৈর্য আবশ্যক কিন্তু দু'আ ছাড়া ধৈর্য অর্থহীন। যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে তাঁর কাছে সাহায্য চাইছে তাঁর উচিত অধৈর্য না হওয়া। বরং তাঁর উচিত ধৈর্য, সালাত এবং দু'আর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়া।

অধৈর্য ব্যক্তি তাঁর ধৈর্য হারানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিকল্পনা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছে এবং এটা আল্লাহ্র সামনে একজন গোলাম ও বান্দার উপযুক্ত আচরণ কিংবা অবস্থান নয়। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ অবস্থান হলো, আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদীরকে মেনে নেওয়া। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্য। এর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো সালাতের মাধ্যমে ক্রমাগত আল্লাহ্-র কাছে ভিক্ষা চাওয়া।

আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদীরের বিরোধিতা করা হারাম এবং এটা আল্লাহর পরিকল্পনা লঙ্ঘনের চেষ্টার মধ্যে পড়ে। তাই এই বিষয়গুলো অনুধাবন করো এবং তোমার জন্য তোমার দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা সহ্য করা অনেক সহজ হবে।"

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ্ যদি মুহূর্তের মাঝেই যেকোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারেন, তাহলে আমাদের দু'আর জবাব দেওয়ার সময় কেন তিনি অপেক্ষা করেন? এর কারণ হলো, একমাত্র প্রতিকূলতার সাথে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলো চিনতে পারি এবং সেগুলোকে উপড়ে ফেলে সেখানে আমাদের শক্তি সামর্থ প্রতিস্থাপিত করতে পারি। ব্যাপারটা তেতো ওষুধের মতো। একারণেই মক্কায় নিদারুণ অত্যাচারের শিকার সাহাবি যখন কাবার পাশে উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে আবেদন করেছিলেন -

"ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আপনি কি আমাদের বিজয়ের জন্য দু'আ করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন না?" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাব দিয়েছিলেন, "...কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।"

ব্যাপারটা কিন্তু এমন ছিল না যে, আল্লাহ্ ঐ মুহূর্তেই পৃথিবী থেকে কুরাইশদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম ছিলেন না বরং ওই মুহূর্তে যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আ করতেন এবং আল্লাহ্ সেটা কবুল করতেন তাহলে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সাহাবিরা বঞ্চিত হতেন, সেটা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা ছিলেন অজ্ঞ।

শেষ পর্যন্ত মক্কায় তের বছর, অতঃপর মদীনায় দশ বছর—মোট তেইশ বছরের সংগ্রামের পরই আল্লাহ্ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় উম্মাহ্‌র প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছিলেন এবং এই সুদীর্ঘ তেইশ বছরে সাহাবিরাও উপলব্ধি করলেন যে, অন্য কোনো উপায়ে এই বিজয় আসা বাঞ্ছনীয় ছিল না।

মনে রাখবেন ফুল ফুটবেই, কিন্তু সেটা একরাতে না। দিনের পর দিন আপনাকে পানি দিয়েই যেতে হবে। অবশেষে এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার দু'আর উত্তর আল্লাহ্‌র তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মের কাঠামোর ভেতর থেকেই আসবে। এই কাঠামোর ভেতর যা ঘটে আল্লাহ্ সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এই কাঠামোর মাধ্যমেই তিনি আপনার দু'আর উত্তর দেন। আবারো বলছি, অবশ্যই অলৌকিক ঘটনা, কারামাহ ঘটে, কিন্তু সেগুলো হলো নিয়মের ব্যতিক্রম।

একজন কুমারী নারী, যিনি সন্তানের জন্য দু'আ করছেন, তিনি অলৌকিকভাবে মারিয়াম (عليها السلام)-এর মতো কুমারী অবস্থাতেই গর্ভবতী হয়ে পড়বেন, তার সম্ভাবনা খুবই কম! আবার একজন শতবর্ষী নারী, ইবরাহীম (عليه السلام)-এর স্ত্রী সারাহ্‌র মতো একশো বছর বয়সে গর্ভবতী হবেন, সে সম্ভাবনাও কম। বরং দু'আ করার সময়ই আপনি জানেন, আপনি যখন সন্তান চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছেন তখন সন্তান জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আপনার দু'আর উত্তর আসবে। বিয়ে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, গর্ভধারণ এবং তারপরেই সন্তানপ্রসব। শেষ পর্যন্ত আপনার দু'আর উত্তর এসেছে, কিন্তু তা এসেছে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা শুধু আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একমাত্র তিনিই আপনার দু'আর উত্তর দিয়েছেন এবং দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

ইউসুফ (عليه السلام) তাঁর শৈশবে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি ইউসুফ (عليه السلام) কে মিশরের উপর ক্ষমতাসীন করবেন এবং আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাবলি ও ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমেই "ক" বিন্দু থেকে "খ" বিন্দু তে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

প্রথমে ইউসুফ (ﷺ) এর ভাইয়েরা তাদের সাথে তাঁকে নিয়ে গেল, তাঁকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হলো, তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হলো, তিনি অন্যান্য বন্দীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, বাদশা তাঁর ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলেন—এবং অতঃপর ইউসুফ (ﷺ) মিশরের অর্থমন্ত্রী পদে আসীন হলেন। শৈশবে তাঁর কাছে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করা হলো, কিন্তু সেটা হলো আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। মিশরের আরেকটি গল্প দিয়ে শেষ করছি।

ষাটের দশকের শেষ দিকে যখন সাইয়্যিদ কুতুবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, সেই একই সময় তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ও বোন হামিদা কুতুবও একই জেলে বন্দী ছিলেন। কিন্তু একই কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের একে অপরের সাথে দেখা করার কোনো উপায় ছিল না। কারণ কারাকর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শারাওয়ী জুমা আরেকটি আইন করেছিলেন যে, কোনো ইসলামপন্থী কয়েদীকে তাঁদের দর্শনার্থীর কাছ থেকে কোনো ফল বা খাবার নিতে দেওয়া হবে না। বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর মুহাম্মাদ কুতুব তাঁর বোনের সাথে দেখা করার সুযোগ চেয়ে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেন।

শারাওয়ী জুমা উত্তর পাঠাল: "জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থাতেই তুমি তোমার বোনকে দেখতে পাবে না।"

এক বছরের মতো পার হবার পর নতুন এক সরকার ক্ষমতায় এলো এবং ক্ষমতাসীন হওয়া মাত্র তাঁরা পূর্ববর্তী সরকারের সব সদস্যকে জেলে ছুঁড়ে দিল। হঠাৎ করেই মুহাম্মাদ এবং হামিদা কুতুব আবিষ্কার করলেন তাঁরা এখন মুক্ত। আর শারাওয়ী জুমা নিজেকে আবিষ্কার করল চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী। সেই একই কারাগারে।

এরই মাঝে একদিন তাঁর স্ত্রী এক ঝুড়ি ফল নিয়ে তাকে দেখতে আসলো। কারারক্ষী নিয়ম মতো তাঁর তল্লাশী করল এবং ঝুড়ি ভর্তি ফলও দেখতে পেল। কারারক্ষী জিজ্ঞেস করল এই ফল কার জন্য? জবাবে মহিলা বললেন: "আমার স্বামী শারাওয়ী জুমার জন্য।" মুচকি হেসে প্রহরী জবাব দিল: "দুঃখিত, আমি নিয়ম মানতে বাধ্য। ফল হাতে প্রবেশ নিষেধ!"

এভাবে দু'আ কাজ করে। দু'আ কোনো প্যানিক বাটন না যা মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিক সমাধানের গ্যারান্টি দেবে। বরং এর জন্য প্রয়োজন সময় ও গভীরতা। এর জন্য দরকার অবিচলতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য, পুনরাবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি।

সর্বোপরি এটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার কেন্দ্রে আছে এই সত্যটিই যে, প্রতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে এই দুনিয়া এবং এর মাঝে সবকিছু ও সবার উপর আল্লাহ্‌র রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ।

নেপথ্যের নায়ক

"হ্যান্ডকাফ পরে নাও।"

এমনই কর্কশ কথায় এক সকালে আমার ঘুম ভাঙল। এটা বেশ কয়েক শীত আগের কথা। দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে এনে টেনে বের করা হলো। বলা হলো, কী সব বিষয়ে আমার ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে। এরপর আমাকে একাকী একটি সেলে রাখা হলো। নিজের কিছুই সেই সেলে নিতে পারলাম না। নিতে পারলাম কেবল লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্ট থেকে আনা একটি উপন্যাস। এক সপ্তাহ সেই সেলে ছিলাম, সপ্তাহব্যাপী সে উপন্যাসটাই পড়ে কাটালাম।

উপন্যাসের নামটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ না। তবে উপন্যাসের একটি ঘটনা আমাকে খুব নাড়া দেয়। গল্পের নায়ক উঠেছে একটা মোটেলে। পৃথিবীর অসংখ্য দারিদ্রপীড়িত একটি শহরের কোনো এক মোটেল। প্রতি সকালে রুম থেকে বের হওয়ার সময় সে দেখত—এক দল লোক পানিভর্তি বড় বড় কন্টেইনার নিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। অবশেষে সে আবিষ্কার করল, কেন এই লোকগুলো প্রতিদিন এই কাজ করে। সে যে প্রতিদিন পানি পান করছে, রান্না করছে, গোসল করছে—এই সবই সে করতে পারছে এই লোকগুলোর কারণে। এ বিষয়টা এতদিন তার মাথাতেই আসেনি। লোকগুলো প্রতিদিন কাঁধে পানি নিয়ে মোটেলের ছাদে উঠে পানির ট্যাংক ভর্তি করে আসে।

একইভাবে, সেলের নিরেট কংক্রিটের দেয়াল দেখে আপনি ভুলেই যেতে পারেন যে, এই দেয়ালের ভেতরেই আছে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের লাইন। এগুলো না থাকলে এখানে থাকাই যেত না। আবার অন্য ধরনের কিছু সেলের দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা একই বিষয়টি দেখব। আপনার চামড়া থেকে প্রতিদিন বিলিয়ন বিলিয়ন কোষ (সেল) মারা যাচ্ছে, ঝরে পড়ছে আর কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার নতুন কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। চামড়ার নিচে আপনার যে কঙ্কালটি আছে, সেটিও প্রতি সাত বছর অন্তর অন্তর বোন টার্নওভার নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়। খুলির ভেতর আপনার মস্তিষ্কে থাকা গ্লিয়াল কোষ দিনরাত নিউরনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেত বহন করে বেড়ায়—আর এভাবেই আপনি গন্ধ পান, আবেগ অনুভব করেন, স্মৃতিচারণ করেন! আর আপনি যখন ঘুমাতে যাচ্ছেন, তখন দিনব্যাপী জমা হওয়া পঁচাশি হাজার মৃত নিউরন পরিষ্কারের কাজ করে চলছে এই সেল বা

কোষ! এই চক্রগুলো ক্রমাগত আপনার দেহের ভেতরে ঘটে চলছে, আপনার অগোচরে।

মস্তিষ্কে কোনো নিউরন মারা গেলে সাধারণত তা আর প্রতিস্থাপিত হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, মস্তিষ্কের একটি অঞ্চল আছে যেখানে কোনো নিউরন মারা গেলে সেগুলো প্রতিস্থাপিত হয়—আর সে অঞ্চলটিই কোনো কিছু শেখা ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য দায়ী। আর মস্তিষ্কের এই অঞ্চলটির কারণেই আপনি মানুষ সহ অন্যান্য সকল প্রাণীর ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করেন। কীভাবে? আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।" (সূরাহ্ মুজাদালাহ ৫৮:১১)

আশ-শাওকানি (ﷺ) লিখেছেন, "অন্য কথায়, তোমাদের মধ্যে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে এই দুনিয়ায় মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন আর আখিরাতে পুরস্কার বৃদ্ধি করে দেবেন। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, যারা ঈমান এনেছে, তাদের মর্যাদা দেওয়া হবে তাদের ওপর—যারা ঈমান আনেনি। আর (ঈমানদারদের মধ্যে) যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে অন্য ঈমানদারদের উপর মর্যাদা দেওয়া হবে। কাজেই যে ঈমানের সাথে ইলমের সমন্বয় ঘটায়, আল্লাহ্ তার ঈমানের কারণে মর্যাদা বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁর ইলমের কারণেও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেবেন।"

ইবনু হাযম (ﷺ) লিখেছেন, "চার শ্রেণির লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে ইজমা আছে। তারা হলেন, 'সেই সব লোক যারা কুরআন ও ইসলাম মেনে চলেন, নবীজি (ﷺ), খলিফা, নেককার ব্যক্তি ও উলামা।"

অন্য আলিমরা দেখিয়েছেন যে, নবীজি (ﷺ)-কে আল্লাহ্ কুরআনের কেবল একটি আয়াতেই কোনোকিছুকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দু'আ করতে শিখিয়েছেন—আর সেটা হচ্ছে ইলম।

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" (সূরাহ্ ত্ব-হা ২০:১১৪)

ইবনু হাজার (ﷺ) এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "এখানে জ্ঞান বলতে বোঝানো হয়েছে শরীয়াহর জ্ঞান, যে জ্ঞান থাকলে একজন মুকাল্লাফ (সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন, স্বাধীন ব্যক্তি, যিনি তার কাজকর্মের জন্য দায়ী) তার দ্বীন সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন- কীভাবে ইবাদাত করতে হয়, কীভাবে অন্যদের সাথে লেনদেন করতে হয়, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির ব্যাপারে জ্ঞান, বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর হক এবং তাঁর অমুখাপেক্ষিতা। এই সকল জ্ঞান লাভ করা যায় তাফসীর, ফিকহ, হাদিস শাস্ত্র থেকে।"

ইবনুল জাওযি (ﷺ) বলেছেন,

“অতীতের ব্যক্তিবর্গের জীবনী অধ্যয়ন ও তাঁদের কিতাব পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী হোন। আপনি যদি বেশ নিয়মিত তাঁদের বই পড়েন, তাহলে তাদের বই পড়া হবে চোখ দিয়ে তাদের দেখার মতোই। একটা কথা প্রচলিত আছে, ‘সেই ভূমিকে নিজের চোখ দিয়ে আমি দেখিনি, তবে হয়তো নিজের কান দিয়ে তা দেখতে পাব।’ নিজের কথা বলি। বই পড়ে আমি কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারি না। আগে পড়া হয়নি, এমন কোনো বই পেলে আমার মনে হয় আমি যেন একটা গুপ্তধন হাতে পেলাম! যদি বলেন আমি বিশ হাজার বই পড়েছি, বোধ করি সংখ্যাটা এরচেয়েও বেশি। আজো আমি নতুন বই খুঁজে বেড়াই। বই পড়ার মাধ্যমে আমি অতীতের মানুষগুলোর আচরণ, তাদের প্রত্যয়, তাদের প্রখর স্মৃতিশক্তি, আচার-প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। জানতে পারি এমন অসাধারণ সব তথ্য—যা বই না পড়া লোকেরা কখনো জানতে পারবে না।”

ইবনুল জাওযির এমন মনোভাব গড়ে ওঠার একটা কারণ হলো সময়ের মূল্য বুঝতে পারা। আরেক জায়গায় তিনি নিজেই এটা নিয়ে লিখেছেন,

“মনে রাখবেন, সময় খুবই দামি। এর একটি মুহূর্তও নষ্ট করার নয়। মানুষ কতো সময় নষ্ট করে, অথচ এই সময়ে সে অসংখ্য নেকি কামাই করে নিতে পারত! এই দিনগুলো হলো আবাদী জমির মতো। আমাদের বলা হচ্ছে যদি আমরা একটা বীজ বপন করি তবে হাজারটা শস্য পাব। এরকম একটা পরিস্থিতিতে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বীজ বপন করা বন্ধ রাখতে পারে? সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য, যখনই সম্ভব কিছুটা একাকী সময় বের করে নিন। সামাজিকতাকে ‘সালাম’ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখুন। কম খাবেন। বেশি খেলে বেশি ঘুম পায়, রাতটাই মাটি হয়ে যায়। যে কেউ সালাফদের জীবনে দৃষ্টিপাত করে এবং আখিরাতের প্রতিদানে বিশ্বাস করে—একদিন সে আমার কথার বাস্তবতা উপলব্ধি করবে।”

কোষ প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্তু সময় প্রতিস্থাপিত হয় না। সময় চলে যায়, শেষ হয়ে যায়। যেমনটা মুজাহিদ (ﷺ) বলেছিলেন, “প্রতিটি দিন তোমাকে বলে, ‘আজ আমি তোমার কাছে এসেছি, কিন্তু আর কখনও ফিরে আসব না। কাজেই আমাকে নিয়ে তুমি কী করছ, সে ব্যাপারে সাবধান থেকো।” হাসান আল বাসরি (ﷺ) মানুষকে বলতেন, “প্রতিটি দিন তোমার মেহমান, আর প্রতিটি মেহমানই একসময় বিদায় নেয়।”

সময় যখন বিদায় নেয়, একা বিদায় নেয় না। সাথে করে নিয়ে যায় ঈমান এবং ইলম—যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বাড়ান।

কিয়ামাতের একটি লক্ষণ হিসেবে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “নেককার লোকেরা একে একে মারা যাবে, পড়ে থাকবে কিছু অকর্মণ্য লোক।” এবং তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, যে পর্যন্ত

না কেবল অজ্ঞ লোকেরাই দুনিয়ার বুকে অবশিষ্ট থাকবে আর মানুষ তাদের অনুসরণ করবে। তিনি আরো বলেছেন, "আঁধার রাতের মতো ফিতনা ঘনিয়ে আসবে। তখন একজন মানুষ মুমিন হিসেবে ঘুম থেকে উঠবে এবং কাফির হিসেবে ঘুমাতে যাবে অথবা মুমিন হিসেবে ঘুমাতে যাবে এবং কাফির অবস্থায় জেগে উঠবে। দুনিয়াবি লাভের জন্য সে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দেবে।"

ইমাম আন-নববী (ﷺ) লিখেছেন, "ফিতনা এতটাই তীব্র হবে—মানুষ এক দিনের মধ্যে বদলে যাবে।" আমাদের সময়ে এমনটা আমরা দেখছি, যখন ভয়ে, চাপে পড়ে আমরা দ্বীনের শিক্ষাকে কেটেকুটে পঙ্গু করে ফেলছি।

তবে আমাদের প্রত্যেকে যদি বদলে যায়, ফেরেশতারা কিন্তু বদলাবেন না, কারণ আল্লাহ্ বলেছেন,

"অতঃপর তারা যদি অহংকার করে, তবে (জেনে নিক যে) তোমার প্রতিপালকের নিকটে যারা রয়েছে, তারা দিন-রাত তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনায় লিপ্ত আছে। আর তারা কখনও ক্লান্তিবোধ করে না।" (সূরাহ্ ফুসসিলাত ৪১: ৩৮)

মিরাজের রাতে বায়তুল মামুরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীজি (ﷺ)-কে জিবরীল (ﷺ) বলেছিলেন, "এটি হলো বায়তুল মামুর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এতে প্রবেশ করেন। যারা বের হন, তারা আর ফিরে আসেন না।" কারণ পরদিন আগত নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতাদের জন্য তারা জায়গা করে দেন, আর এভাবে চলতেই থাকে।

ফেরেশতাদের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই, নেই আমাদেরকেও। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (ﷺ) বলেন, "জমিনে আল্লাহর আব্দালরা আছেন (আব্দাল হলো নেককার লোক, যারা একের পর এক আসতে থাকেন)।" যদিও এই 'আব্দাল' শব্দটি হাদিসে নেই, তবে অন্যান্য হাদিসে শব্দটির নিহিতার্থ এসেছে (যেমন- তাইফাতুল মানসুরার হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদদের আগমন ঘটবে যারা দ্বীনকে পুনর্জীবিত করবেন)। আব্দাল শব্দটির ধারণা কুরআনেও উপস্থিত। যেমন- এক জাতিকে প্রতিস্থাপিত করে তাদের স্থলে আরেক জাতিকে আনার বিষয়টি সারা কুরআন জুড়েই পাওয়া যায়। যেমন- আল্লাহ্ বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার দ্বীন থেকে ফিরে গেলে শীঘ্রই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন; যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন আর তারাও তাঁকে ভালোবাসবে..." (সূরাহ্ মায়েদা ৫:৫৪)

এবং তিনি আরো বলেছেন, "...যদি তারা এগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি এগুলোর ভার এমন সম্প্রদায়ের কাছে সোপর্দ করেছি যারা এগুলোর অস্বীকারকারী হবে না।" (সূরাহ্ আনআম ৬:৮৯)

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন,

"...আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, তখন তারা তোমাদের মতো হবে না।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৩৮)

অন্য কথায়, যারাই ঝরে পড়ে—তারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। প্রতিস্থাপিত হয় নিয়ত চলমান সেই কাফেলার দ্বারা। সেই কাফেলায় নারী-পুরুষ উভয়েই আছে, আর তাদের মাধ্যমেই অন্যদের দেখভাল করা হয়। ইবনু রজব (ﷺ) লিখেছেন, "একদল গাফেল ও আল্লাহ বিমুখ লোকের মাঝে একজন আল্লাহর আনুগত্যকারী থাকলে তাঁর কারণেই তাদের সবার থেকে আযাব হটিয়ে দেওয়া হতে পারে। সে যেন বাকি সবাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। একজন সালাফ বলেছেন, 'গাফেল সম্প্রদায়ের মাঝে একজন আল্লাহর যিকিরকারী মানুষের উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি মতো—যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত একদল সেনাবাহিনীকে নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে এনেছে। গাফেল লোকদের মাঝে যদি এই আল্লাহকে স্মরণে রাখা মানুষগুলো না থাকত—তাহলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত।'" সূরাহ আনফালের একটি আয়াতকে কিছু আলিম এই অর্থেই বুঝেছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না..." (সূরাহ আল-আনফাল ৮:৩৩)

কাজেই সব গল্পেরই একজন নায়ক থাকে। আমাদের কিছু নায়ককে সবাই চেনে, কিন্তু বেশিরভাগকেই কেউ চেনে না। তারা থাকে প্রচ্ছন্ন। তারা গরীব, দুর্বল, অসহায়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর মাঝরাতের হৃদয় নিংড়ানো দু'আটুকু ছাড়া তাদের কাছে দেওয়ার মতো আর কিছুই থাকে না। এমন মানুষদের ব্যাপারেই নবীজি (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ এই উম্মাহকে এর মধ্যকার দুর্বলদের মাধ্যমে সাহায্য করেন—তাদের দু'আ, সালাত, ইখলাসের মাধ্যমে।" আপনার দেহে নীরবে কাজ করে যাওয়া কোষগুলোর মতো তারা হলেন এই উম্মাহর **নেপথ্যের নায়ক।**

কে জানে, হয়তো নিজের অজান্তেই আপনি এদের মধ্যে কাউকে চেনেন!

অথবা, আপনি নিজেই হয়তো তাদের একজন!

সত্যিকারের সুখ

আক্ষরিক অর্থে আক্বল বলতে বোঝানো হয় কোনো কিছুকে সংযত রাখা বা দমিয়ে রাখা। যেমন- রক্তপণকে বলা হয় আক্বল, কেননা রক্তপণে পরিশোধ নিহতের পরিবারকে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত রাখে।

আক্বলকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে—"আক্বল হলো কোনোকিছুর গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- কোনো জিনিসের ভালো বা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে, অথবা জিনিসটি ত্রুটিহীন বা ত্রুটিপূর্ণ কিনা সে ব্যাপারে জ্ঞান।" আবার "দুটি ভালো জিনিসের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম ও দুটি খারাপ জিনিসের মধ্যে কোনটি বেশি খারাপ সেটি বুঝতে পারার ক্ষমতা"—এটাও আক্বল। "ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারার দক্ষতা" একধরণের আক্বল। আক্বল হলো "হৃদয় ও মনের ওপরে পতিত এক প্রকার আধ্যাত্মিক আলো—যার মাধ্যমে আত্মা সহজাত ও বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করে।"

কাজেই বলা যায়, আক্বল হলো আপনার বুদ্ধিমত্তা, আপনার বিবেচনাবোধ। কারণ এই বোধটুকু আপনাকে ভুল করা থেকে বিরত রাখে, এমন কাজ থেকে দূরে রাখে যার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সবচেয়ে দামি উপহারগুলোর একটি হলো এই আক্বল। আর তাই ইসলামি শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য (মাক্বাসিদ) যে পাঁচটি জিনিসকে সংরক্ষণ করা—তার মধ্যে একটি হলো আক্বল। উদাহরণস্বরূপ—মদ এমন একটি জিনিস যা মানুষের আক্বলকে বিকৃত বা অকার্যকর করে দেয়। শরীয়াহ এই বিকৃতির হাত থেকে আক্বলকে নিরাপদ রাখা জরুরি মনে করে। তাই কেউ যদি (প্রকাশ্যে) এক ফোঁটা মদ চেখেও দেখে, ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে—এজন্য তাকে প্রকাশ্যে প্রহার করা হয়।

একইভাবে, শরীরের এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন সাপ্লাই ব্যবহার করে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের বৃহত্তম ও জটিলতম অংশ হলো সেরেব্রাম। এই সেরেব্রাম অংশটি চিন্তা করা ও শেখার প্রক্রিয়া (অর্থাৎ আক্বল) নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় আট শতাব্দী আগে ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) লিখেছিলেন, "বলা হয়ে থাকে, আক্বল হলো আসলে মস্তিষ্ক। অনেক ডাক্তারই এমনটা বলে থাকেন। ইমাম আহমাদ (ﷺ)-ও এমনটা বলেছেন। তাঁর বেশ কয়েকজন ছাত্র বলেছেন যে, আক্বল হৃদয়ে থাকে, পরিপক্ক হলে তা মস্তিষ্কে চলে যায়।

সম্ভবত বিষয়টা এমন—মানুষের চিন্তা আর ধারণার উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক, ইচ্ছাশক্তির উৎস হচ্ছে হৃদয়, আর এ দুটির সাথেই মানুষের আত্মার যোগসূত্র আছে।"

ইবনু তাইমিয়্যাহ সবার চাইতে আলাদা তাঁর জ্ঞানের কারণে নয়, বরং আক্বলের কারণে। জ্ঞান অনেকেরই থাকে, কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যাহ জানতেন কোথায় কোন জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। আর এ কারণেই তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ। তাঁর আক্বল অন্যদের সাথে তার পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। কেউ যদি তাঁর মতো হতে চায়, তাঁর মতো করে উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তাহলে তাকে তার জ্ঞান আর আক্বল—এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাকে জানতে হবে তার জ্ঞান সে কোথায় কাজে লাগাবে, কীভাবে কাজে লাগাবে। এই প্রসঙ্গে আলী ইবনু আবি তালিব (ﷺ) একটি সতর্কবাণী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কারও জ্ঞান যদি তার আক্বলের চেয়ে ভারি হয়ে যায়, তাহলে তা তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" কুরআনের যেসকল আয়াতে আক্বল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম (সূরাহ-বাক্বারা ৪৪) ও শেষ (সূরাহ মুলক: ১০) উভয় আয়াতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে। তাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—তারা যা জানত, তা ব্যবহার করার মতো আক্বল তাদের ছিল না।

একজন মুমিনের আক্বল বলে দেয় সে আসলে কতটুকু দামি। আক্বল হলো মুমিনের যোগ্যতার মাপকাঠি। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন যে, সালাতের সময় সবচেয়ে বেশি আক্বল সম্পন্ন মানুষেরা যেন তাঁর সবচেয়ে নিকটে দাঁড়ায়। কেননা তাঁর খলিফা এমন কাউকেই হতে হবে, যার আক্বল আছে। হাসান আল-বাসরি (ﷺ) বলেছেন, "আক্বল সম্পন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখলে দ্বীন মজবুত হয়।" তিনি কারও প্রশংসা শুনলে বলতেন, "তার আক্বল কেমন? কারও আক্বল পরিপূর্ণ না হলে তার দ্বীনও পরিপূর্ণ হয় না।"

এমনকি ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা একজন মানুষকে তার আক্বল দিয়ে বিচার করত। তারা বলত, "যার আক্বল নেই, সে বেঁচে গেল (অর্থাৎ, তার হারানোর মতো মান-মর্যাদাই নেই)।"

আরও বলা হতো, "আক্বলবিহীন মানুষকে সহজেই চেনা যায়, কারণ সে কোনো কারণ ছাড়াই ক্ষেপে যায়, অর্থহীন কথাবার্তা বলে বেড়ায়, অজায়গায় দানশীল হয়, গোপন জিনিস ফাঁস করে দেয়, সবাইকে বিশ্বাস করে, বন্ধু ও শত্রুর মাঝে পার্থক্য করতে পারে না।"

কারাগারের ভেতরে-বাইরে সবখানে এমন মানুষ অহরহ দেখা যায়। আমি প্রায়ই দেখি মানুষ বিশ্বস্ত ভেবে এমন কাউকে বন্ধু বানায়, যে কিনা পরে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে যায়। একটাই কারণ—তার আক্বল নেই, সে বোঝে না। আজ থেকে ভিন্ন একটি সময়ে, ভিন্ন একটি স্থানে বসে ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) লিখেছিলেন, "তুমি যদি মানুষ

চিনতে না পারো, তাহলে জালিমকে মাজলুম মনে করবে, ঠিককে ভুল মনে করবে, ভুলকে মনে করবে সঠিক। তুমি ধোঁকা খাবে ও প্রতারিত হবে। বিশ্বাসঘাতককে মনে হবে বন্ধু, মিথ্যুক তোমার কাছে আবির্ভূত হবে সৎ হয়ে। আর প্রতিটা অবাধ্য ব্যক্তি তার পাপকাজ, মিথ্যে ও অসভ্যতাকে ঢেকে রাখবে মেকি চাদরে। যেহেতু তুমি জানো না মানুষ কেমন, তুমি এসবের মাঝে কোনো পার্থক্য করতে পারবে না। কাজেই তোমাকে অবশ্যই মানুষ চেনা শিখতে হবে, জানতে হবে তাদের নানারকম ছলচাতুরি সম্পর্কে।" উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)- এর বর্ণনা দিতে গিয়ে যথার্থই বলা হয়েছে, "কাউকে ধোঁকা দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না, আর ধোঁকা খাওয়ার মতো বোকাও তিনি ছিলেন না।"

আলী ইবনু আবি তালিব (ﷺ) বলেছেন, "যার আক্বল আছে, সে দুনিয়ার জীবনের কারণে তার আখিরাতের জীবন নষ্ট হতে দেয় না।"

যার আক্বল আছে, সে অবশ্যই নিজের ভুলগুলো সম্পর্কে জানবে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো খুনীকে যখন তার নিজ ভুলগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে উত্তর দিয়েছিল, "আমার মন হিংসা আর ঘৃণায় পরিপূর্ণ (তাই আমি ভুল করেছি)।" আবু দারদা (ﷺ) একবার বলেছিলেন, "মানুষ ততক্ষণ পূর্ণাঙ্গ বুঝ অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না সে মানুষকে আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে, এরপর যখন সে নিজের দিকে তাকাবে তখন নিজেকে আরো বেশি ঘৃণা করে।"

ইবনু আবদিল বার (ﷺ) বলেছেন, "যার আক্বল আছে, সে জামানার বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে, নিজের জিহ্বাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং ভবিষ্যতে কী আছে সেদিকে মনোনিবেশ করবে।"

ইবনুল জাওযি (ﷺ) লিখেছেন, "শরীরের সবগুলো ইন্দ্রিয়ের চাইতে আক্বল হলো শ্রেষ্ঠ, কারণ আক্বলই ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে শেখায়। শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো ঘটনা ঘটলে তারপর টের পায়, কিন্তু আক্বল সামনে কী আসছে সে সম্পর্কে আগেই ভেবে নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করে। কাজেই আক্বল সম্পন্ন ব্যক্তি যেন কখনোই ভবিষ্যতের ব্যাপারে অবিবেচকের মতো আচরণ না করে।"

আক্বলের বিষয়টি আল-গামিদিয়্যাহর হাদিসে এত স্পষ্টভাবে এসেছে যে, এরচেয়ে ভালোভাবে বোঝানো বোধ করি সম্ভব না। একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যিনা করেছি। আমাকে পবিত্র করুন।" নবীজি (ﷺ) তাঁকে ফিরিয়ে দিলে তিনি পরদিন আবার এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে কেন ফিরিয়ে দিলেন? মাইযকে যেভাবে ফিরিয়ে দিলেন, আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিলেন? আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি গর্ভবতী!" তিনি (ﷺ) বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে প্রসব করার পর এসো।" প্রসবের পর নারীটি তাঁর ছেলেকে কম্বলে জড়িয়ে এনে বললেন, "আমি একে প্রসব করেছি।"

রাসূল (ﷺ) বললেন, "যাও, বুকের দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত একে লালন-পালন কর।" নারীটি তা-ই করল। এরপর একদিন তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলো হাতে একটি রুটি ধরা অবস্থায়। বললেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী! সে এখন নিজে নিজে খাবার খায়।" রাসূল (ﷺ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলিমের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিলেন। এরপর বুক সমান গর্ত খুঁড়ে সে গর্তে নারীটিকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (رضي الله عنه) এগিয়ে এসে নারীটির মাথায় একটি পাথর মারলেন আর তাঁর মুখে রক্তের ছিটা এসে পড়ল...।[৭]

উপরে বর্ণিত সমস্ত দুর্দশা ঘটেছে কেবল এক মুহূর্তের সুখের মূল্য দিতে গিয়ে। এতকিছু কখনোই ঘটত না—যদি সে মহিলা একটি মুহূর্তের জন্য তার আক্বলকে কাজে লাগাত। এর প্রমাণ খালিদ বিন ওয়ালিদ নিজেই—যার মুখে আজ সেই মহিলার রক্তের ছিটা এসে পড়েছে। কারণ এই এক মুহূর্তের জন্য আক্বলই খালিদকে বেশ কবছর আগে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছে। তিনি বর্ণনা করেন, "যখন আল্লাহ আমার কল্যাণ চাইলেন, তিনি আমার অন্তরে ইসলামের জন্য ভালোবাসা স্থাপন করলেন। আমি হুঁশ ফিরে পেয়ে নিজেকে বললাম, "আমি যুদ্ধের ময়দানে এতবার মুহাম্মাদের মুখোমুখি হলাম, প্রতিবারই মনে হয়েছে, আমি সময় নষ্ট করছি, মুহাম্মাদই বিজয়ী হতে যাচ্ছেন।" যুদ্ধে খালিদ মুসলিমদের পরাজিত করেছিলেন সত্যি, কিন্তু খালিদের আক্বল তাঁকে বলছিল—শেষমেশ ইসলামই জয়ী হবে।

সত্যি বলতে, তিনি নিজেই সেই বিজয়ে সাহায্য করেছেন। তিন মাস পরের এক ঘটনায় খালিদের আক্বল আবারও চমক দেখাল। মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির মৃত্যুর পর তাড়াহুড়ো করে খালিদকে তিন হাজার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হলো দুই লক্ষাধিক সৈন্যবাহিনী বিশিষ্ট রোমান জোটের বিরুদ্ধে লড়তে। লড়াই এতটাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল যে তিনি জয়লাভের পরিকল্পনা করেননি—বরং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম রেখে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কী হতে পারে সে চিন্তা করে তিনি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাত নামতেই তিনি ডানদিকের সেনাবাহিনীকে বামে নিয়ে আসলেন, সামনের থেকে পেছনে নিয়ে গেলেন। এসব করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক আওয়াজ করলেন। ভোরবেলা তিনি হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে শত্রুর উপর দ্রুত বেশ কয়েকটি আক্রমণ করলেন। পরিকল্পনা কাজে দিল। শোরগোল আর অচেনা চেহারা দেখে শত্রুরা ভাবল রাতের বেলা নিশ্চয়ই বিশাল পরিমাণ অতিরিক্ত সেনা এসেছে। এতে তাদের মনোবল ভেঙে যায়, শক্তি কমে যায়—আর সেই সুযোগে খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে নিরাপদে সরে যান। ছেষট্টি গুণ বড় একটি বাহিনীর মোকাবেলা করে শেষমেশ মাত্র বারোজন মুসলিম শহীদ হন।

[৭] মুসলিম, আস-সাহিহ, হাদিস নং- ৪৫২৭

কিছুদিন পরের ঘটনা। নবীজি (ﷺ) আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه)-কে যাতুস সালাসিলের অভিযানে নেতৃত্বের ভার দিয়ে প্রেরণ করলেন। মুতা যুদ্ধে রোমান জোটকে সাহায্য করা একটি গোত্রের শক্ত ঘাঁটি ছিল সে জায়গা। রাসূল (ﷺ) তাদের একটি শিক্ষা দিতে চাইলেন। আমর কেবল চার মাস আগে মুসলিম হয়েছেন। কিন্তু এ অভিযানে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো দেখে বোঝা যায় রাসূল (ﷺ) কেন তাঁকে নেতা বানিয়েছেন। প্রথমত, আমর কঠোর নির্দেশ দিলেন যেন সেনাবাহিনী শুধু রাতেই অগ্রসর হয়। দ্বিতীয়ত, বাহিনীর কেউ যেন রাতের বেলা আলো না জ্বালায় সে নির্দেশ দেন। এতে সাহাবিরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এতটাই মনঃক্ষুণ্ণ হন যে খোদ আবু বকর (رضي الله عنه)-ও এই বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনড় রইলেন। বললেন, 'যে আগুন জ্বালাবে, তাকে সেটাতে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' তৃতীয়ত, শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবিরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে চাইলেন। আমর নিষেধ করলেন। প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি কেন তিনি এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে তিনি কী আক্বল খাটিয়েছেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১। তিনি বাহিনীকে রাতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন দুটি কারণে ক) মধ্যাহ্নের তাপ থেকে বাঁচাতে, খ) শত্রুদের চমকে দিতে।

২। আগুন জ্বালালে শত্রুরা বুঝে যেত যে মুসলিমরা সংখ্যায় কম।

৩। শত্রুরা পালিয়ে নিজেদের এলাকায় ঢুকে যাচ্ছিল। তাদের ধাওয়া দিলে তারা লোকবল জড়ো করে পাল্টা আক্রমণে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিত।

এভাবেই খালিদের আক্বল এবং আমরের আক্বল—এই দুই এর হাত ধরে সেই মহাপুরস্কারের ক্ষণটির দিকে মুসলিমরা এগিয়ে গিয়েছিল—মক্কাবিজয়।

এই ঘটনাগুলো আমাদের ধারণা দেয় সালাফরা কেন শ্রেষ্ঠ। তাদের আক্বলই তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছে। আক্বল মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে—এই ঘটনাগুলো তার উদাহরণ। উদাহরণ তাদের জন্য, যারা সালাফদের মতো হতে চায়।

আবারও বলতে হয় যে, আক্বল এক দামি উপহার—বিশেষত আজকের যুগে। কারণ এই জামানায় এমন মানুষের বড়ই অভাব, যারা ঘটনা বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করতে জানে। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, "এমন একটা অন্ধকার সময় আসবে, যখন বিচারবুদ্ধি থমকে দাঁড়াবে, আক্বলসম্পন্ন একজন মানুষকেও পাওয়া যাবে না...।" নিয়ামত সংরক্ষণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো একে স্বীকার করা, এটি কোথা থেকে এসেছে তা স্বীকার করা, এবং এর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া। আল্লাহ বলেছেন,

"...আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেবো..." (সূরাহ ইবরাহীম ১৪:৭)

কিন্তু আপনাকে আক্বলের ব্যবহারও জানতে হবে। ইবনুল জাওযি (رحمه الله) লিখেছেন, "সত্যিকারের সুখ মেলে স্বাভাবিক, সহজাত বিষয়গুলোর মাঝে। সত্যিকারের সুখ খুঁজে পাওয়া যায় দুনিয়ার বাস্তবতা বোঝা ও জ্ঞানের মাঝে; ত্রুটিকে পেছনে ফেলে বিশুদ্ধতা অর্জনের মাঝে, শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে—যদিওবা কখনো কখনো দয়া দেখানোর মাঝে অধিক সুখ মেলে, কেননা দয়া তো তাকেই দেখানো হয় যে চরমভাবে পরাজিত, লাঞ্ছিত। সত্যিকারের সুখের সন্ধান মেলে তিল তিল ধৈর্যের সাথে একটি একটি করে গুণ অর্জন করার মাঝে, একটি একটি করে দোষ বর্জন করার মাঝে। সত্যিকারের সুখ আছে ঘটনার কারণ আর ফলাফলের মধ্যকার গতিপ্রকৃতি বোঝার মাঝে; এই উচ্চাকাঙ্খা নিজের মাঝে ধারণ করার মধ্যে যে—কোনো গুণ অর্জনেই আপনি ব্যর্থ হবেন না।"

সবশেষে তিনি ইতি টানেন এ কথা বলে, "যে উপলব্ধি করে এ জীবনের একটা শেষ আছে, যে উপলব্ধি করে জান্নাতে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে এই দুনিয়ায় আমাদের কাজের অনুপাতে—সে চেষ্টা করবে জান্নাতে পৌঁছানোর আগেই তার থেকে এগিয়ে থাকা যে কাউকে পেছনে ফেলে দিতে। ভেবে দেখুন, জান্নাতে প্রত্যেকের ওপরে অন্তত একজন হলেও আছে যে তার চাইতে উঁচু মাকামের অধিকারী। জান্নাতে যখন একজন মানুষ পৌঁছে যায় তখন প্রত্যেকে তার অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, ওপরে কে আছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু, এখন, এই মুহূর্তে আপনি জানেন আপনার ওপরে কেউ না কেউ আছে। কাজেই নিজের মাঝে সেরা গুণগুলো ধারণ করার প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে ছুটে যান। সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। সময় যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আফসোসের তিক্ত, ভয়াবহ স্বাদ যেন আপনাকে গ্রহণ করতে না হয়। মনে রাখবেন, যারা মারা গেছে, তারা এমন কিছুই করেনি যা আপনি করতে পারবেন না। তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে যান।

যদি আপনি কারো গুণ দেখে বিমোহিত হন, তবে তার মতো হয়ে যান। আপনি এমন কিছু হবেন—যা আপনাকে বিমোহিত করেছিল। আপনি যদি উদারতা ও মহত্বের পথে এগিয়ে যান, তাহলে কোনোকিছু আপনার পথ রোধ করতে পারবে না..."

দাঈদের প্রতি নাসিহা

এই লেখাটি পড়ার আগে প্রথমে আংকেল টম বলতে কী বোঝানো হয় তা জেনে নেওয়া দরকার। আংকেল টম বলতে হীনমন্য প্রজাতির দাসভাবাপন্ন, বিনয়বিগলিত, সেবা প্রদানে-তৎপর এক চরিত্রের দিকে নির্দেশ করা হয়—যে কিনা শাসকশ্রেণীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত। ঐতিহাসিকভাবে এটি একটি কৃষ্ণাঙ্গ চরিত্র—যে নিজেদের নীচু জাত এবং সাদাদের উঁচু জাত মনে করে এবং তাদের চাটুকারিতায় লিপ্ত থাকে।

তারিক মেহান্নার কাছে প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম, আমার আগের প্রশ্নটির বিশদ উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। কিন্তু আমি আপনার কাছে আরো কিছু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আশা করছি। আপনি আগের প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমা দেশের অনেক দাঈকে "আংকেল টম" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আপনার এ কথার সূত্র ধরে বলতে চাই, বর্তমান সময়ে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে দাঈরা জেলে যাবার ভয়ে কথা বলতে চান না। হিকমাহর সাথে এসব বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কীভাবে কথা বলা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? আর যারা এসব ব্যাপারে কথা বলতে ভয় করে তাদের আসলে করণীয় কী?

তারিক মেহান্নার উত্তর: প্রথমত, আমি এই ব্যাপারে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি যে, কেবলমাত্র ভয় পায় বলে এই দাঈরা সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকে। কেউ যদি ইসলামের কথা বলতে ভয় পায়, তাহলে সে চুপ করে থাকবে, ব্যস! কিন্তু আমরা যখন দেখি আংকেল টম নীরবতা ভঙ্গ করে 'অতি উদ্যোগী' হয়ে ইসলামকে কাটছাঁট করে নখদন্তহীনভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেটা সে করছে ইসলামের শত্রুদের সাথে এক টেবিলে বসে, তখন আমরা বুঝতে পারি, নিছক ভয়ের কারণে সে এমনটি করছে না, বরং সমস্যার মূল আরো গভীরে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ইসলামের উপর আদর্শিক আক্রমণ নতুন কোনো ঘটনা নয়, বরং সেটা হয়ে আসছে বেশ কয়েক শতক জুড়েই, এবং প্রত্যেক আক্রমণের জবাবে আলিমদের কাছ থেকে তিনটি ভিন্ন ধরনের সাড়া মিলেছে।

প্রথম দল, এরা এই আক্রমণের মুখে কার্যত নতি স্বীকার করেছে। আক্রমণকারী কাফির সভ্যতার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যে এরা বিমুগ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মা ও মন পুরোপুরি বিকিয়ে দিয়ে মানসিক দাসে পরিণত হয়েছে।

ফলে তারা কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে এবং কাফিরদের ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছে।

দ্বিতীয় দল, তারা কিছু বিষয়ে আপস করে, কিছু বিষয়ে করে না ("মানিয়ে চলো" নীতি)।

তৃতীয় দলে আছেন এমন কিছু আলিম, যাদের অবস্থান উপরের দুই দলের মতো নড়বড়ে নয়। তারা কোনোকিছুতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। সকল বাধা-বিপত্তি ও চাপের মুখেও তারা অবিচল থেকেছেন।

কাজেই, আংকেল টমের সমস্যাটি ভয়জনিত নয়, বরং মূল সমস্যা হচ্ছে তার পরাজিত মানসিকতা। সে ইসলামের শত্রুদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শিক আক্রমণের সামনে পরাভূত হয়েছে। তাই সে এখন মন থেকেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। সে এখন চায় সমাজে যেন তার গ্রহণযোগ্যতা টিকে থাকে এবং বিরোধিতার মুখে পড়তে না হয়। এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আংকেল টম একাকী ঘরে বসে জালিমের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট! না, তার অবস্থা মোটেও এমন নয়! সে মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে এতটাই বন্দী যে, সে জালিমকেও আর জালিম মনে করে না—উল্টো জুলুমের জন্য সে নিজেকেই দায়ী করে এবং জালিমের মন যুগিয়ে চলতে চায় (Stockholm syndrome)!

এসব লোকদের করণীয় কী জানতে চেয়ে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সে প্রশ্নটি তাদের জন্য খাটেই না! আপনি ধরেই নিচ্ছেন তারা কিছু একটা করতে চায়! মনস্তত্ত্বের ভাষায়, বহু আগেই তারা হার মেনে নিয়েছে। যে বিষয়ে প্রশ্ন এবং বাস্তবিক আলোচনার অবকাশ আছে তা হলো, আমরা যারা হার-না-মানা দলের পথ অনুসরণ করতে চাই, যারা উম্মাহকে পুনর্জীবিত করতে চাই, তাদের এ মুহূর্তে কী করণীয়? বিশেষভাবে, আমরা যারা পশ্চিমা দেশে বসবাস করছি, তাদের কী করা উচিত যেখানে ভিনদেশি ও আজিব চেহারার এক ইসলাম পালিত হচ্ছে? যখন ইসলাম থেকে সম্মান আর গৌরবের চাদর খুলে ফেলে ইসলামকেই অপমানিত করা হচ্ছে এমন চরম মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়?

কুরআনে কিছু আয়াত আছে যেগুলো আমাদেরকে গভীর চিন্তার খোরাক দেয়। নির্দিষ্ট করে বললে, মূসা (ﷺ) এবং ফিরআউনের ঘটনার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই ঘটনাটি কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার বর্ণিত, সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত এবং আমরা যে সময়ে বাস করছি তার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আজকে বিশ্বাসী মুসলিম জাতির অবস্থা তৎকালীন বনী ইসরাইলের মতো। ফিরআউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আজ মুসলিমদের শোষণ করছে জুলুমবাজ আমেরিকান সরকার। সেদিনের মূসা (ﷺ) এর মতো আজকে প্রয়োজন একজন মুসলিম নেতার যার দায়িত্ব হবে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করা ও তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া,

একই সাথে জালিমদের শিক্ষা দেওয়া ইসলাম কী। আসুন আমরা দেখি, আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী, একজন সুদক্ষ এবং কুশলী দাঈ হিসেবে মূসা (ﷺ) তার উম্মাহকে নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিয়েছিলেন।

❑ প্রথমেই লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, মূসা (ﷺ) এর কাছে ইসলামের 'ওয়ালা' এবং 'বারা'[৮] এ দুটোর ধারণা ছিল স্ফটিকস্বচ্ছ। ফিরআউন এবং মূসা (ﷺ) এর সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করুন, কোনো লুকোচুরি বা রাখঢাক নেই, কে কোন পক্ষে আছে—সেটা নিয়ে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই। দুটো দলকে মোটা দাগে পৃথক করা হয়েছে। মূসা (ﷺ) ফিরআউন এবং ফিরআউনের দলভুক্ত সকলকে বনী ইসরাইলের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছেন। বনী ইসরাইলকে আশ্বস্ত করে মূসা (ﷺ) বলছেন,

"হতে পারে তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন, আর অচিরেই তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১২৯)

ফিরআউনের বিরুদ্ধে করা আগ্রাসী দু'আ থেকে মূসা (ﷺ) এর বৈরী মনোভাব আরও পরিষ্কার হয়।

"আর মূসা বললেন–"আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে এই দুনিয়ার জীবনে শোভা-সৌন্দর্য ও ধন- দৌলত প্রদান করেছ, যা দিয়ে, আমাদের প্রভু! তারা তোমার পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে। আমাদের প্রভু! বিনষ্ট করে দাও তাদের ধনসম্পত্তি, আর কাঠিন্য এনে দাও তাদের হৃদয়ের উপরে, তারা তো বিশ্বাস করে না যে পর্যন্ত না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরাহ ইউনুস, ১০: ৮৮)

অথচ মূসা (ﷺ) এর কাহিনি বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেছেন,

"অতঃপর ফিরআউন পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফিরআউন, হামান, ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল।" (সূরাহ ক্বাসাস, ২৮: ৮)

ফিরআউনের প্রতি মূসা (ﷺ) যে ধরনের মনোভাব ও মানসিকতা পোষণ করতেন সেটা বোঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শত্রুর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে নিজেকে এবং নিজের উম্মাহকে শত্রুর ষড়যন্ত্রের হাত

---

[৮] 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'–ইসলামি আকিদার একটি মৌলিক বিষয়। ওয়ালা (الولاء) মানে হলো–বন্ধুত্ব, মৈত্রী, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাদি। আর বারা (البراء) মানে হলো–শত্রুতা, সম্পর্কহীনতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' বলতে বোঝানো হয়–আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সমস্ত মুমিন-মুওয়াহহিদদেরকে ভালোবাসা, তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং কাফির-মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের সাথে কোনো ধরনের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা, তাদেরকে আন্তরিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা ইত্যাদি।—ইবনু যাকির

থেকে রক্ষা করার জন্য সুপরিকল্পিত কোনো কৌশল গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। এ কারণেই কুরআনে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন,

"নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর!" (সূরাহ ফাতির, ৩৫: ৬)

আপনার শত্রু কখনোই আপনাকে তার পরিকল্পনা জানতে দেবে না। সে হবে খুব সূক্ষ্ম, শঠতাপূর্ণ, কূটকৌশলী, স্মিতহাস্য, ধীরস্থির এবং ধূর্ত। আপনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনাকে সে আঘাত করে চুরমার করে দেবে। এমনটা যে কেবল বাস্তব জগতে ঘটবে তা নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেই আপনি মনোবল হারিয়ে পরাজয় স্বীকার করতে পারেন। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা সুপ্রসিদ্ধ কৌশল হলো আপনার শত্রু আপনাকে বোঝাবে যে, সে আপনার শত্রু নয় বরং বন্ধু। যেন আপনাকে ব্যবহার করে আপনার বন্ধু অর্থাৎ তার আসল শত্রুকে দমন করতে পারে। এই ফাঁদে পা দেওয়ার অর্থই হলো নিজেদেরকে রক্ষা করার শেষ সুযোগটুকুও হারানো। অধিকন্তু, আপনার ভাই ও বোনদের দিকে বিশ্বস্ততার হাত না বাড়িয়ে সে হাত কাফিরদের সাথে মেলানো হলো মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

"এরা (মুনাফিকরা) দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়..." (সূরাহ নিসা, ৪: ১৪৩)

কাজেই নিজে বাঁচতে এবং উম্মাহকে বাঁচাতে সর্বপ্রথম ধাপটি হচ্ছে 'ওয়ালা এবং বারা' এর ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেন আপনি শত্রুকে বন্ধু ভেবে গুলিয়ে না ফেলেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান সময়ে বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে।

☐ দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি আমাদের খেয়াল করতে হবে তা হলো, "মৌলবাদ", "চরমপন্থা", "সন্ত্রাসবাদ", "উগ্রবাদ"—যত্রতত্র এসকল শব্দের অসতর্ক ব্যবহার। এই শব্দগুলো ধোকাঁবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। গণমানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখাই এসকল শব্দচয়নের উদ্দেশ্য। মূসা (عليه السلام) কে ফিরআউন রুখে দিতে চেয়েছিল "চরমপন্থা দমন" এর নামে!

"আর ফিরআউনের লোকদের প্রধানরা বললো-"আপনি কি মূসাকে ও তার লোকদের ছেড়ে দেবেন দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে এবং আপনার দেবতাদের পরিত্যাগ করতে?" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১২৭)

"ফিরআউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে" (সূরাহ গাফির, ৪০: ২৬)

এবং ফিরআউন নিজেকে প্রগতিশীল, সুশীল এবং উদারপন্থী হিসেবে দাবি করত!

"ফিরআউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই।" (সূরাহ্ গাফির, ৪০: ২৯)

কিন্তু মূসা (ﷺ) যেদিকে মানুষকে আহবান করছিলেন সেটিকে বোঝাতেই মূলত ফিরআউন এই শব্দগুলোর (ফিতনাবাজ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) অবতারণা করেছিল। কারণ মূসা (ﷺ) অবস্থান নিয়েছিলেন ফিরআউনের বিরুদ্ধে। যেসব মিশরীয় মূসা (ﷺ) এর ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি ফিরআউন কী বুঝাতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল:

"বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১২৬)

ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু থেমে এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। ফিরআউন সকলের সামনে মূসার এমন একটি চরিত্র উপস্থাপন করতে চেয়েছিল যাতে মনে হবে মূসা একজন রক্তচোষা বিকারগ্রস্ত লোক, যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ করতে চায়! কিন্তু আমরা কুরআনে দেখতে পাচ্ছি এমন কিছু মুসলিম ছিলেন যারা ফিরআউনের এই মিডিয়া ক্যাম্পেইনে প্রলুব্ধ হয়নি। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন মূসা (ﷺ) সত্য বলছেন, আর ফিরআউন মিথ্যা। তারা জানতেন ফিরআউন মৌলবাদ, ধর্মীয় চরমপন্থা কিংবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, বরং মূসা (ﷺ) এর আহবান অর্থাৎ ইসলাম থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই ধরনের স্পর্শকাতর শব্দ ব্যবহার করছে। কেন? কারণ, মূসা (ﷺ) যে বার্তাটি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তা হলো, আমরা কেবল আল্লাহর কাছে মাথা নত করব, ফিরআউনের মতো কোনো অত্যাচারী জালিমের কাছে নয়। যে মানুষগুলোকে ফিরআউন এতকাল মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছিল তাদের মনে মূসা (ﷺ)-এর এই কথাগুলো গৌরব, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের একটি চেতনা সৃষ্টি করে।

আর আজকেও আমরা দেখছি ইসলামের যেসব ভাবনা মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করবে, ইসলামের যেসব চেতনা ও উপলব্ধি মানুষের সামনে মুক্তির দুয়ার উন্মোচিত করবে, সেইসব বিষয়গুলোর সাথে খুব অপ্রীতিকর লেবেল জুড়ে দিয় নেতিবাচকভাবে গণমানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তাই 'ওয়ালা এবং বারা' হয়ে যায় 'মৌলবাদ',

আত্মরক্ষার জন্য জিহাদের নাম হয় 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'জঙ্গিবাদ', আর শরীয়াহকে অপবাদ দেওয়া হয় 'চরমপন্থা' বলে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি দেখবেন আমজনতাও কোনো চিন্তাভাবনা না করেই এসব সংজ্ঞা অবলীলায় গ্রহণ করছে। এমনকি অনেক আলিম এবং দাঈ পর্যন্ত তাদের কথায় এবং লেখায় কাফিরদের সাথে তাল মিলিয়ে এসব 'পরিভাষা' ব্যবহার করছেন।

লেখার শুরুতে আদর্শিক আক্রমণের জবাবে কার অবস্থান কেমন হয় সেটি আলোচনা করেছিলাম। উপরে যাদের কথা বলেছি তারাই হলো সেই প্রথম দল। এরা দাসসুলভ মানসিকতা বহন করে। এই শ্রেণির আলিমরা আজকে তাগুত সরকার আয়োজিত "Counter-radicalism conference" এ গর্বের সাথে যোগ দিচ্ছে! আপনি কী কল্পনা করতে পারেন, মূসা (ﷺ) ফিরআউনের কাছে গিয়ে আর্তি জানাচ্ছেন যেন বনী ইসরাইলকে সুশীল করে গড়ে তোলা হয়, যেন তাদের মধ্য থেকে মৌলবাদের বীজ নির্মূল করা হয়! কিংবা আমাদের রাসূল (ﷺ) স্পেশাল এজেন্ট আবু জেহেলকে দাওয়াত করে এনেছেন দারুল আরকামে সাহাবিদেরকে "চরমপন্থা দমনে কী করণীয়" তা নিয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য? অবশ্যই না! কাজেই আপনাকে মূসা (ﷺ) এর অনুসারীদের মতো সাবধান থাকতে হবে। এ ধরনের শব্দের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারে প্রতারিত না হয়ে এই শব্দগুলোর ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন।

আরো একটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। তা হলো, হিকমাহ প্রয়োগ করা এবং নমনীয় হওয়া। আপনি আপনার প্রশ্নে হিকমাহর ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। আপনি হয়তো খেয়াল করবেন, এই হিকমাহ গ্রহণ করতে গিয়ে একদল বাড়াবাড়ি করছে, আবার আরেকদল হিকমাহ বর্জন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। একদল লোক আছে শ্রোতার মেজাজ-মর্জির দিকে থোড়াই কেয়ার করে। শ্রোতার জ্ঞানের মাত্রার প্রতি খেয়াল না রেখে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই কথা বলতে থাকে। আবার অনেকে হিকমাহ খাটাতে গিয়ে সত্যকেই গোপন করে বসে যার ফলে ইসলামের মর্মকথার নির্যাসটুকুই নষ্ট হয়ে যায় এবং বিকৃত হয়ে যায়। মূসা (ﷺ) এর দিকে দেখুন। এ দুটোর কোনোটিই তিনি করেননি। আমাদের মতো তিনিও ছিলেন সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মতো তাঁরও দুনিয়াবী শক্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। আমাদের মতো তাঁকেও এক কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল। আর আমাদের মতো, তাঁকে বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছিল যেন তিনি উম্মাহর ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করে।

"তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে. অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০: ৪৩-৪৪)

আবার আপনি যখন অন্য আয়াতগুলোর দিকে তাকাবেন, তখন আপনি মূসা (ﷺ) এর দাওয়াহর মধ্যে প্রজ্ঞার ছাপ দেখবেন। দাওয়াহর ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বনের রীতিকে ঢাল বা সেন্সরবোর্ড রূপে ব্যবহার করে মূসা (ﷺ) কখনোই সত্যকে অস্পষ্ট রাখেননি।

"আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়..." (সূরাহ আরাফ, ৭: ১০৫)

শুধু তাই নয়, নমনীয়তা অবলম্বনের মানে এই নয় যে, জুলুম-নির্যাতনের মুখে ভীরু এবং নরম-সরম হয়ে থাকতে হবে।

"অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল: আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি। আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে"। (সূরাহ ত্ব-হা, ২০: ৪৭-৪৮)

আসুন আমরা এক মিনিটের জন্য থামি এবং এই আয়াতগুলোর দিকে মনোযোগ দিই। এখানে আমরা দেখছি মূসা (ﷺ) একজন নবী, যিনি কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নন, বরং তিনি ছিলেন নিপীড়িত মানুষদের একজন। তিনি ছিলেন সংখ্যালঘু। বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তির সাথে নম্রতা অবলম্বন করতে আদেশপ্রাপ্ত মূসা (ﷺ) তাঁর সংকটাপন্ন উম্মাহকে উদ্ধার করতে তিনটি পদক্ষেপ নিলেন:

- তিনি ফিরআউনের অপকর্মের কথা খুব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করলেন তার জাতির সামনে।
- তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে দাবি করলেন যে, ফিরআউনকে অবশ্যই তার দুষ্কর্মের ইতি টানতে হবে।
- তিনি ফিরআউনকে তার দৌরাত্ম্যের জন্য তার অশুভ পরিণামের ব্যাপারে হুমকি দিলেন।

আপনি দেখবেন, মূসা (ﷺ) আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেননি, কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর মধ্যে কোনো পরাজিত মানসিকতা ছিল না। তাঁর কথায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তাঁর মধ্যে ভীরুতা ছিল না। দুনিয়াবী শক্তির অভাব তাঁর নৈতিক মনোবলে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি তা-ই বলেছিলেন, যা বলা উচিত, যেভাবে বলা উচিত, এবং যখন বলা উচিত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) হিকমাহকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবেই, 'হিকমাহ হচ্ছে উচিত সময়ে, উচিত ভঙ্গিতে, উচিত কথাটি বলা'।[৯]

মূসা (ﷺ) মিনমিন করে কথা বলেননি। তাঁর কথায় দৃঢ়তা ছিল। তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। ফিরআউনের প্রতিক্রিয়া দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি। সে মূসাকে 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'মৌলবাদ'-বিরোধী কনফারেন্সে আমন্ত্রণ করেনি কিংবা মূসাকে তার

[৯] ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকিন*, ২/৪৭৯

সরকারের 'সন্ত্রাসবাদ দমন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে যোগ দিতে অনুরোধ করেনি। অথচ আজকে আমেরিকা কিছু স্বেচ্ছায় বিকিয়ে যাওয়া মুসলিম দাঈকে তার সাহায্যকারী হিসেবে পাচ্ছে! বরং ফিরআউন চেয়েছে মূসাকে হত্যা করতে, যেমন করে যুগে যুগে এই ফিরআউনদের অপকীর্তি প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে মানবাধিকার এবং মুক্তিকামী নেতাদের যুগ যুগ ধরে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। এবং সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে আজ অবধি ...

আমাদের অধিকাংশই ভীতু। আমরা যেকোনো মূল্যে দুশ্চিন্তা পরিহার করে চলতে চাই। লোকের বিরোধিতার মুখে পড়তে চাই না। আমরা চাই সবাই আমাদের পছন্দ করুক। যদিওবা আমরা কখনো বুঝতে পারি যে, একটা সাহসী পদক্ষেপ নেয়া খুব জরুরি, আমরা সেটা নিতে চাই না, কারণ সেটার ফলাফল নিয়ে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত থাকি। লোকে আমাদেরকে কী ভাববে এবং মিডিয়া আঙ্গুল তাক করবে—এই দুশ্চিন্তায় আমরা কেটে পড়ি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ভীরুতাকে "হিকমাহ" কিংবা "বিচক্ষণতা" বলে চালিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে যে ভয় আছে তা আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে নেওয়া অভ্যাস, এটা সহজাত নয়। নিজেকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাবার জন্য আমরা এর আশ্রয় নিই। ভয়কে নিজের জীবন থেকে উপড়ে ফেলুন এবং সাহস দিয়ে একে প্রতিস্থাপিত করুন। ভীরুতার দরুন আপনাকে যে মূল্য দিতে হবে তা সাহসের জন্য দেওয়া মূল্য থেকে অনেক বেশি চড়া।

আপনার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে, সুফিয়ান আস-সাওরি (রহ.) সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে গিয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে ব্যর্থ হলে চরম হতাশার চোটে রক্ত প্রস্রাব করতেন। কাজেই, যখন আপনি কিছু বলার সুযোগ পাবেন তখন চুপ করে থাকবেন না। দ্ব্যর্থকতার আড়ালে নিজেকে নিরাপদ অবস্থানে লুকিয়ে রাখবেন না। এতে আপনার কোনোই উপকার হবে না। মূসা (আ.) কে অনুসরণ করুন। ধরে ধরে সুনির্দিষ্ট করে নামগুলো উচ্চারণ করুন। আমেরিকান সরকারের নাম বলুন। তুলে ধরুন প্যালেস্টাইন, ইরাক আর আফগানিস্তানের কথা। বলুন বোন আফিয়া সিদ্দিকির কথা। এমন প্রতিটি বিষয় তুলে ধরুন যেন জালিমরা জানতে পারে তাদের কাজকর্ম নিয়ে আমরা কী ভাবছি। এটাকে চরমপন্থা কিংবা মৌলবাদ অথবা উগ্রবাদ বলে না, এটা হচ্ছে সত্যকে কোনো কাটছাঁট না করে যেমন-আছে-তেমন-ভাবে প্রকাশ করে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

হিকমাহ মানে নিজেদের দ্বীনকে মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখা নয়। আর এই কারণে তো নয়ই যে, দ্বীন ইসলামের কোনো একটি অংশ সমাজের চোখে অপছন্দনীয়, উচ্চারণের অযোগ্য কিংবা অযাচিত বলে ঠেকে। ইসলামি দাওয়াহর মূল কথাই হলো সত্যকে প্রকাশিত করা, তাকে গোপন করে রাখা নয়।

"আর আল্লাহ্ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১৮৭)

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।" (সূরাহ বাক্বারা, ২: ১৫৯)

যারা কোনো প্রশ্নের উত্তর জানার পরেও নিশ্চুপ থাকাকে শ্রেয় মনে করে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবাণী রেখে গেছেন: "যে ব্যক্তি ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরে জানা সত্ত্বেও তা গোপন করেছে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।" হোক সে ব্যাপারটি আমাদের দ্বীনের 'বিতর্কিত' এবং সমাজের চোখে অযাচিত, অপছন্দনীয়, অনাহূত বিষয়গুলোর একটি। যেমন-ধরা যাক জিহাদ। "আমার হাত-পা বাঁধা, আমার কিছু করার নেই" এরকম ভাব করে থাকবেন না। ইসলামে জিহাদের প্রকৃত ধারণাটি কেমন সেটা ব্যাখ্যা করে দিলেই তো পারেন, এমন তো নয় আপনাকে কেউ বলছে খাপখোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়তে হবে!

যারা জানতে চায় তাদেরকে শুধু জানিয়ে দিন—ইসলামের মূলধারার, সর্বজনস্বীকৃত, প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব জিহাদের ব্যাপারে কী বলছে। আপনি যদি সেই তথাকথিত "বাকস্বাধীনতার দেশ" এ পড়ে থাকেন আর এ কথা বলতে ভয় করেন যে, ইসলাম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শিক্ষা দেয়, সেক্ষেত্রে আপনার উচিত সেই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরতের চিন্তা করা, যেখানে অন্তত এই মৌলিক মানবাধিকারের কথা বলার কারণে আপনাকে জেলে ছুঁড়ে ফেলা হবে না। আমাদের এই দ্বীনে এমন কিছু নেই, কুরআন বা হাদিসে একটা অক্ষরও খুঁজে পাওয়া যাবে না—যার জন্য আমাকে বা আপনাকে বিব্রত হতে হবে, লজ্জিত হতে হবে, কিংবা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে ভয় পেতে হবে। সবকিছু বাদই দিলাম, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা যে বিপ্লব করেছিল, যুদ্ধ করেছিল সেটা জিহাদ নয়তো কী? নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেটাকে জিহাদ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? আর আজকে মুসলিমরা যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ছে সেটাকে জিহাদ বলতে এত বাধছে কেন?

❐ সবশেষে যে ব্যাপারটি আসে তা হলো দাওয়াহর জন্য কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ। এই অজুহাতটি সকলে দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করে এবং যেকোনো কিছুকে জায়েয করে ফেলে। হ্যাঁ, মূসা (ﷺ) ও বনী ইসরাইলও একটি আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিল এবং সে সময়টা ছিল আমাদের সময় থেকে আরো বেশি ভয়ঙ্কর। মূসা (ﷺ) এবং হারূন (ﷺ) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন,

"তারা বলল: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা সীমালঙ্ঘন করবে" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০: ৪৫)

"কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের সন্তানসন্ততি ব্যতীত আর কেউ মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি ফিরআউন ও তাদের পরিষদবর্গের ভয়ে পাছে তারা তাদের নির্যাতন করে..." (সূরাহ ইউনুস, ১০: ৮৩)

"অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন" (সুরা ত্ব-হা, ২০: ৬৭)

তারা কারাবন্দী হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন।

"ফিরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব" (সূরাহ শু'আরা, ২৬: ২৯)

তারা অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন,

"ফিরআউন বলল: ... আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব ..." (সূরাহ ত্ব-হা, ২০: ৭১)

তাদের মধ্যে মৃত্যুভয় ছিল,

"নিঃসন্দেহে ফিরআউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত ..." (সূরাহ কাসাস, ২৮: ৪)

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। FBI কিংবা M15 এর মতো গোয়েন্দাসংস্থাগুলো আজ যা করে বেড়াচ্ছে সেগুলোর প্রত্যেকটি কাজের হুমকি আগেও ছিল, এখনো আছে।

তবে সত্যি বলতে কি, আমাদের সময়টা তুলনামূলক সহজ। চরম আতঙ্কের পরিস্থিতিতে, ফিরআউনের হাতে ভীষণভাবে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা মূসা (ﷺ)-কে জালিমের গড়া ত্রাসের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। তাঁর সাথে আজকের আংকেল টমদের পার্থক্য এই যে, তিনি তাঁর ভয়কে জয় করার জন্য মনঃস্থির করেছিলেন, আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং তাঁর সাধ্যে যা ছিল তা করেছিলেন। তাই আল্লাহও তাঁর জন্য সমুদ্রকে দুভাগ করে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন দৃঢ়। তাঁর মতো যারা ছিলেন তাদের জন্যও অন্ধকার সমুদ্র সেদিন দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। সিয়ার আলাম আল-নুবালা (১০/২৫৭) এ বর্ণিত আছে, নিজের দ্বীন বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানানোর 'অপরাধে' কারাবন্দী ইমাম আহমাদ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন আল-মাওয়ারদি। আল-মাওয়ারদি ইমাম আহমাদকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। ইমাম আহমাদ

তাকে বললেন কারাগার থেকে বের হয়ে অমুক জায়গায় যাও এবং ফিরে এসে আমাকে জানাও তুমি কী দেখেছ। আল-মাওয়ারদি সেখানে গেলেন এবং দেখলেন, সেখানে যেন এক সাগর পরিমাণ মানুষ কাগজ-কলম হাতে বসে আছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী করছ? তারা উত্তর দিল, আমরা ইমাম আহমদ (ﷺ) কী বলেন সেটা শুনার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি যা বলবেন আমরা সেগুলো লিখে রাখব। আল-মাওয়ারদি ফিরে এলেন এবং তিনি যা দেখে এসেছেন তা ইমাম আহমাদকে জানালেন। ইমাম আহমাদ কারাগারে তাঁর কক্ষ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তুমি কি চাও আমি এই লোকগুলোকে বিপথে পরিচালিত করি? তিন বছর কারাগারে থাকার পর ইমাম আহমাদকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

যিনি সত্যিকারের একজন আলিম, একজন মুমিন, তিনি তার ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের উপরে সত্যকে অগ্রাধিকার দেন। যখন রাসূল (ﷺ) আবু বকর (ﷺ) কে সাথে নিয়ে গুহাতে বন্দী ছিলেন, আপনাদের কি মনে আছে তিনি আবু বকরকে কী বলেছিলেন? তিনি বলেননি, আবু বকর ভয় কোরো না। বরং তিনি বলেছিলেন, "আবু বকর, মন খারাপ কোরো না", কারণ আবু বকর তার নিজ জীবনের ভয় করেননি। বরং তিনি দেখছিলেন যদি তারা মুশরিকদের হাতে মারা যান তবে ইসলামের এই আহবান, ইসলামের এই দাওয়াহ থেমে যেতে পারে। আবু বকর খুব ভালো করে জানতেন, ইসলামের দিকে আহবান করলে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ দুটো ব্যাপার অবিচ্ছেদ্য।

ইসলামি দাওয়াহর এটিই একমাত্র পথ। কেউ যদি কোনো প্রকার কাটা-ছেঁড়া ব্যতিরেকে নবীদের দাওয়াহকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয় এবং একইসাথে সে একটা উপভোগ্য ও নির্বিঘ্ন জীবনের স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে ভ্রান্তির জগতে বসবাস করছে। আপনাকে মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে। আরাম-আয়েশের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসতে হবে, যত যাই কিছুর মুখোমুখি হতে হোক না কেন। ইতস্তত বোধ করবেন না। ভয় যেন আপনাকে পেছনে টেনে না রাখে।

আশা করব, উপরের আয়াতগুলো নিয়ে খুব মন দিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন এবং আয়াতের শিক্ষাগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবেন। আমাদের কথায় ও লেখায় যেন আমরা মাথা উঁচু করে নিজেদের প্রকাশ করতে পারি।

একটি নিয়ম

এখানে আসার পরপরই আমাকে 'ইনমেইট হ্যান্ডবুক(Inmate Handbook)' নামে একটা বই ধরিয়ে দেওয়া হয়। এটা মূলত এই জেলের নিয়মকানুন নিয়ে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটা বই। বইটির মধ্যে একটি নিয়ম ছিল এমন:

"পরিষ্কার ও টানটান করে বিছানা গোছাতে হবে। বিছানার চাদর কুঁচকে থাকা চলবে না। মাথার দিক থেকে মোটামোটি ১৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চাদর বিছিয়ে বাকিটুকু গুটিয়ে রাখতে হবে। সব বিছানা সকাল ৭.৩০ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।"

এটা পড়ামাত্রই সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ দিকের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আলস্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: "কাজ, সক্রিয়তা বা প্রচেষ্টার প্রতি অনীহা।" আর এই আলস্যকে সালাফগণ তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন।

❒ উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) বলেন, "দরকারি কিছু না করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোকে আমি ঘৃণা করি।"

❒ ইবনু মাসউদ (ﷺ) বলেন, "এই দুনিয়া বা পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ না করে অলস বসে থাকে এমন ব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করি।"

স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে এই দু'আর মাধ্যমে দিন শুরু করতেন, "... আমি আলস্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই...।"[১০] আসলে অলসতা সুন্নাহর এতটাই বিপরীতধর্মী একটা বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবনে একবারও হাই তোলেননি। ইবনু হাজার (ﷺ) উল্লেখ করেন: "নবীজি (ﷺ) অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি (ﷺ) কক্ষণো হাই তোলেননি। ইয়াজিদ বিন আল-আসামের মুরসাল থেকে ইবনু আবি শায়বাহ এবং আল-বুখারি তাঁর তারিখ গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।"

তাই, জেলখানার নিয়ম হলেও এটা আসলে একটা ভালো নিয়ম। নানান রকম মানুষের সাথে বছরের পর বছর কাছাকাছি থাকার ফলে আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে,

[১০] বুখারি, আস-সাহিহ, দুআ অধ্যায়, হাদিস নং- ৬০০৬

যত সকালসকাল ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করা যায় দিনভর আলস্য ততই কম হয়। উমার (ﷺ) একবার শামে পৌঁছে দেখেন যে, মুয়াবিয়া (ﷺ) কিছুটা শ্লথ এবং মন্থর হয়ে পড়েছেন। তাই মুয়াবিয়াকে দেখে উমারের প্রথম প্রশ্নটিই ছিল: "কী ব্যাপার মুয়াবিয়া? তুমি কি দুহার (সকালের শেষভাগ) সময় ঘুমোও?" সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা সকলেই বেশি ঘুমানোর অভ্যাসকে ঘৃণার চোখে দেখতেন—বিশেষ করে দিনের প্রথম ভাগে।

❒ সাখর আল-ঘামিদির সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "হে আল্লাহ্‌! আমার উম্মাহর ভোরের পাখিদের তুমি বারাকাহ দান করো।"[১১] কোনো অভিযান বা সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় তিনি (ﷺ) সবসময় দিনের শুরুতেই তাদের প্রেরণ করতেন। সাখর নিজে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি ভোরবেলাতেই তাঁর ব্যবসায়িক কাজকর্ম শুরু করতেন। ফলে, একসময় তিনি অস্বাভাবিক রকমের ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন।

❒ আলি ইবনু আবি তালিব (ﷺ) বলেন, "সকালবেলা ঘুমানো অজ্ঞতার লক্ষণ।"

❒ একবার একদল লোক ফজরের সালাতের পর ইবনু মাসউদ (ﷺ)-এর সাথে দেখা করতে আসে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পরও তারা ইবনু মাসউদ (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করতে ইতস্তত করতে থাকে। ইবনু মাসউদ (ﷺ) তাদের এই অস্বস্তির কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তরে বলে যে, তারা এই ভেবে অস্বস্তিবোধ করছে যে হয়তো ওনার স্ত্রী এই সময় ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। ইবনু মাসউদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "আপনারা কী মনে করেন আমার স্ত্রী এতটাই অলস?" (ইবন মুফলিহ আল-হাম্বালি এই ঘটনার উপর মন্তব্য করে বলেন: "এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সকালবেলার এই সময়টুকু অবহেলা করা উচিত না এবং এই সময়ে ঘুমোনোকে নিরুৎসাহিত করা হয়।") বুখারি এবং মুসলিম উভয়েই এই ঘটনাটি তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

❒ ইবনু আব্বাস (ﷺ) একদিন তাঁর এক ছেলেকে সকালে ঘুমুতে দেখে বলেন: "উঠো! তুমি এমন সময় কী করে ঘুমাচ্ছ যখন রিযিক বণ্টন হচ্ছে?"

❒ একজন তাবেয়ী বলেন, "কোনো আলিমকে ফজরের পর ঘুমোতে দেখলে পৃথিবী দুঃখে কেঁদে ওঠে।"

❒ পূর্ববর্তী নবীগণও এমন মনোভাব পোষণ করতেন। নবী দাউদ (ﷺ) সুলায়মান (ﷺ)-কে বলেছিলেন: "অতিরিক্ত ঘুমানোর ব্যাপারে সতর্ক হও। অন্যরা যখন কাজ করে তখন এই অভ্যাস তোমাকে দরিদ্র করে দিবে।"

---

[১১] আবু দাউদ, আস-সুনান, জিহাদ অধ্যায়, হাদিস নং-২৬০৮

❒ ঈসা ইবনি মারইয়াম (ﷺ) বলেছেন, "দুটি স্বভাবকে আমি ঘৃণা করি:

১) রাতে জেগে না থাকা সত্ত্বেও দিনের বেলায় ঘুমানো,

২) কোনো কারণে আনন্দিত হওয়া ছাড়াই উচ্চস্বরে হাসা।"

❒ একজন কবি বলেন: "নিশ্চয়ই সকালবেলার ঘুম মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়। আর বিকেলবেলায় ঘুমুনো তো পাগলামির নামান্তর।"

ইবনু মুফলিহ উপরোক্ত বাণীগুলোর উপর মন্তব্য করে বলেন, "সুতরাং দিনের বেলা ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কারণ এটা প্রাণোচ্ছলতা শুষে নেয় এবং শরীরের পেশিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তাই শারীরিক সক্রিয়তার মাধ্যমে পেশিগুলোকে সচল রাখা উচিত।"

কয়েক মাস আগে আমাকে CMU, Terre Haute থেকে এই জেলে (Marion CMU) নিয়ে আসা হয়। এই ধরনের জেল বদল সাধারণত কোনোরকম পূর্বাভাস ছাড়াই করা হয়। এক ভোরে হঠাৎ ৫টার সময় একজন প্রহরী আমার সেলের তালা খুলে আমাকে অন্য এক জেলে স্থানান্তর করার খবর দিল। আরো বলল যে, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আমার হাতে এক ঘন্টারও কম সময় আছে। আমি বুঝতে পারলাম, এই জেলের ভাইদের সাথে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। তাই সিএমইউর নিকষ কালো অন্ধকার করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে আমি অন্যান্য সেলে থাকা ভাইদের সালাম দিয়ে বিদায় জানিয়ে আসতে গেলাম। এই সময়ে বেশিরভাগ কয়েদীরাই ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু বেশ কয়েকটা সেলে আমি আলো জ্বলতে দেখতে পাই। পা টিপে টিপে আলোকিত সেলগুলোর কাছে গিয়ে আমি কুরআন তিলাওয়াতের মৃদু গুনগুন শুনতে পাই। সেলের দরজা গলে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম প্রতিটি সেলেই আমার ভাইয়েরা কিয়ামুল-লাইলে মগ্ন হয়ে আছে।

❒ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, "জেনে রাখো, একজন মুমিনের সম্মান হচ্ছে তাঁর কিয়ামুল লাইল।"[১২]

❒ তিনি (ﷺ) আরো বলেন, "রাতের শেষ ভাগে বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, যদি তুমি সে সময়ে আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো, তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও।"

❒ তিনি (ﷺ) বলেন, "আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর তিনি বলেন: কে আমাকে আহ্বান করবে, আমি যার ডাকে সাড়া দেব?

[১২] হাকিম, আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, হাদিস নং- ৭৯২১; তাবারানি, মু'জামুল আওসাত, হাদিস নং- ৪২৭৮

কে আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি যাকে প্রদান করব? কে আমার নিকট ইস্তেগফার করবে, আমি যাকে ক্ষমা করব? ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ বলতে থাকেন।"[১৩]

❒ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, "তোমরা রাতের সালাত আঁকড়ে ধর, কারণ এটা তোমাদের পূর্বের নেককার লোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের রবের নৈকট্য দানকারী, গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনকারী। এটা শরীর থেকে রোগ-বালাই দূর করে দেয়।" (ইবনু রজব এই হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, "এই হাদিসের একটি অন্যতম শিক্ষা হলো, কিয়ামুল লাইলের ফলে সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়। এটি শরীরকে নীরোগ করে।")

❒ তিনি (ﷺ) বলেন, "এমনভাবে ইবাদাত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। সেটা না পারলে জেনে রাখো যে তিনি তোমাকে দেখছেন। আর এটাই হচ্ছে ইহসান।"[১৪]

কিয়ামুল-লাইল এর মাধ্যমে মানুষের কাছে সুনাম কুড়ানোর কোনো উপায় নেই। রাতের গভীরে জেলখানার সেলে বন্দী অবস্থায় কাউকে দেখিয়ে দেখিয়ে ইবাদাত করার কোনো উপায় নেই। তাই এই ইবাদাতে কোনোরকম কোনো পার্থিব ফললাভের আশা নেই। আর কিয়ামুল-লাইল তো বাধ্যতামূলকও নয়। বরং হাসান আল-বাসরি (رحمه الله) বলেছেন, এটি হচ্ছে 'সবচেয়ে কঠিন এবং প্রগাঢ়' ইবাদাত। তাহলে বলুন, কী মানুষকে স্বেচ্ছায় এবং খুশিমনে শীতকালের প্রবল শীতের রাতে বিছানা ছেড়ে নেমে এসে বরফশীতল পানি দিয়ে ওযু করে এমন এক সত্তার ইবাদাত করতে প্রেরণা যোগায় যাকে সে দেখতেও পায় না?

❒ আবু সুলায়মান আদ-দারানি (رحمه الله) বলেন, "যারা বিনোদনে প্রমত্ত হয়ে রাত কাটায় তাদের চেয়ে যারা কিয়াম করে তারাই নিজেদের রাতগুলোকে বেশি উপভোগ করে। যদি রাত না থাকত তাহলে আমি এই পৃথিবীতে থাকতে চাইতাম না।"

❒ ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (رحمه الله) বলেন, "রাতে কিয়াম আর দিনে সিয়াম পালন করতে না পারলে বুঝে নিও যে, তোমার পাপকাজ তোমাকে বেঁধে রেখে বঞ্চিত করছে।"

❒ সালাফদের একজন বলেছেন, "চল্লিশ বছর ধরে সূর্যোদয় ছাড়া অন্য কিছু আমাকে বিষণ্ণ করতে পারেনি। (কারণ সূর্যোদয়ের মাধ্যমেই কিয়াম এর সময় শেষ হয়ে যায়)"

তারা সকলেই কিয়ামুল-লাইলকে অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু তাদের ঈমান এই কঠিন কাজকেই তাদের বিশেষত্ব-তে পরিণত করেছে। কপটতা,

---

[১৩] মুসলিম, আস-সাহিহ, হাদিস নং-১৮০৯; বুখারি, আস-সাহিহ, হাদিস নং- ১০৯৪

[১৪] বুখারি, আস-সাহিহ, ঈমান অধ্যায়, হাদিস নং-৫০; মুসলিম, আস-সাহিহ, হাদিস নং-১০২

স্বার্থপরতা আর বস্তুবাদিতায় ডুবে থাকা পশ্চিমা সমাজের কাছে এমন চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

যা-ই হোক, প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি। এই হাদিসটি নিয়ে ভাবুন: "ঘুমানোর সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি গিঁট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের স্থানে সে মোহর এঁটে দিয়ে বলে: তোমার রাত এখনো অনেক বাকি, অতএব ঘুমাও। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিকির করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে ওযু করে তো আরেকটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে সালাত আদায় করে, তো তার সবকটি গিঁটই খুলে যায়, ফলে সে ভোরবেলায় প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল থাকে। অন্যথায় সে অবসাদ ও আলস্য অনুভব করে।"

এই হাদিসটির ব্যাপারে ইবনু হাজার বলেন, "এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মেজাজ ভালো রাখার গোপন চাবিকাঠি কিয়ামুল-লাইলের মাঝে লুকিয়ে আছে।" বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন ঘটনা থেকে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সব বর্ণনা বলে শেষ করা যাবে না, তবে নিচের ঘটনাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন:

❐ আইশা (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কক্ষণো কিয়ামুল-লাইল ত্যাগ করতেন না। অসুস্থ বা ক্লান্ত হলেও তিনি বসে বসে তা আদায় করতেন। অথচ কিয়ামুল-লাইলের কারণে তিনি কখনো ক্লান্ত হননি বরং এর প্রভাব এমন ছিল যে তিনি (ﷺ) কখনো হাই পর্যন্ত তোলেননি। রাতভর কিয়ামুল-লাইলের পরেও দিনের প্রথম প্রহরেই যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়তে তাঁর উদ্যমের অভাব হতো না।

❐ ইবরাহীম বিন শাম্মাস (ﷺ) বলেন, "আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। তিনি কৈশোর থেকেই সারারাত কিয়ামুল-লাইল করতেন।" জীবনের এই সময়ের কথা বলতে গিয়েই ইমাম আহমাদ (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, তিনি কত আগে আগে তাঁর দিন শুরু করতেন। তিনি বলেন, "আমি হাদিস শুনার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইতাম। তখন আমার মা আমার জামা টেনে ধরে বলতেন, 'অন্তত ফজরের আযান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আগে মানুষজন ঘুম থেকে উঠুক'।"

দ্রষ্টব্য: যুহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়াটা (কাইলুলা) সুন্নাহর অংশ। একারণেই ইমাম আহমাদ কিয়ামের জন্য উঠতে পারতেন। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (ﷺ) বর্ণনা করেন, "শীত-গ্রীষ্ম সবসময়েই আমার বাবা দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিতেন। তিনি কখনো এটা ছাড়তেন না এবং আমাকেও এই অভ্যাস রপ্ত করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, "কাইলুলা অর্থাৎ দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নাও কারণ, শয়তানরা তা করে

না"। আনাস (ﷺ), ইবনু আব্বাস (ﷺ) সহ অন্যান্য সাহাবিরাও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। কিয়ামের জন্য সহায়ক আরেকটি অভ্যাস রয়েছে।

তা হলো ইশার সালাতের আগে না ঘুমানো, ইশার পর কথা না বলা এবং জেগে না থাকা। কারণ হাদিসে এসেছে যে, "নবীজি (ﷺ) ইশার আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং ইশার পর জেগে থেকে কথা বলাও অপছন্দ করতেন।"

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিয়ামুল-লাইলের মানে এই নয় যে সারারাত কিংবা রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় জেগে থাকতে হবে। বরং, সুবহে সাদিকের আধাঘন্টা আগে জেগে উঠে দুই রাকাত সালাত আদায় করলে সেটাও কিয়ামুল-লাইল বলে গণ্য হবে।)

আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাইদের সাথে থেকেছি। তাদের মাঝে যারা কিয়ামুল-লাইলের ব্যাপারে নিয়মিত ছিল তাদেরকেই আমি সবচেয়ে মনোযোগী এবং সময়ের সদ্ব্যবহারকারী হিসাবে পেয়েছি। তারা কদাচিৎ হাই তুলত, সতর্কতার সাথে তাঁদের শব্দ চয়ন করত এবং জেলের জীবনযাত্রার মানদণ্ডেও তাঁদের পার্থিব সম্পদ ছিল সবচেয়ে কম। তাঁদের চিন্তা-চেতনা সর্বদা সুন্দরতম বিষয়গুলো ঘিরে আবর্তিত হতো। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই অতীতের মুজাহিদদেরকে ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিতে সাহায্য করেছিল। *বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ* গ্রন্থে ইবনু কাসির (ﷺ) ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিবরণে ইতি টানার সময় একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তখন লাঞ্ছিত অপদস্থ রোমান সৈন্যদের অবশিষ্টাংশ যুদ্ধের বিবৃতি দিতে অ্যান্টিয়কে তাদের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ফিরে গিয়েছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনাবাহিনীর হাতে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হওয়ার কথা হিরাক্লিয়াসকে জানায়।

তা শুনে হিরাক্লিয়াস বলে উঠলো: লানত তোমাদের ওপর! যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তাদের সম্পর্কে আমাকে বলো। তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ নয়?

তারা জবাব দিল: হ্যাঁ।

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করল: তোমাদের সংখ্যা বেশি, নাকি তাদের?

তারা উত্তরে বলল: বরং আমরা তো প্রতিটি যুদ্ধেই সংখ্যার দিক থেকে তাদেরকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছি।

হিরাক্লিয়াস প্রশ্ন ছুঁড়ল: তাহলে, কেন তারা তোমাদের পরাজিত করল?

তখন তাদের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলল: কারণ তারা রাতে জেগে উঠে সালাত পড়ে, দিনের বেলায় সিয়াম রাখে, ওয়াদা পূরণ করে, সৎ কাজে উৎসাহ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, এবং তারা একে-অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। অন্যদিকে আমরা মদ খাই, ব্যভিচার করি, নিষিদ্ধ কাজে মত্ত হই, চুক্তি ভঙ্গ করি, অন্যায় ও

অত্যাচার করি, আমাদের রবকে রাগান্বিত করে এমন কাজে উৎসাহ দিই, আর যা তাকে সন্তুষ্ট করে তাতে বাধা প্রদান করি এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াই।

হিরাক্লিয়াস বলল: তুমি সত্য বলেছ।

ফিতনা

কারাগারে এটা আমার অষ্টম শরৎ। আমি একটা খাঁচার ভেতর থেকে সূর্যের দিকে চেয়ে আছি।

যদিও আমি সরাসরি সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছি, বাস্তবতা হলো আমি পৃথিবীর যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, তা বছরের এই সময়ে সূর্য থেকে কিছুটা হেলে রয়েছে। এর অর্থ হলো, সূর্যের আলো এ জায়গায় একদম সরাসরি না এসে কিছুটা বাঁকা হয়ে পড়ছে। ফলে এর উত্তাপ অনেকটাই কমে গেছে। যে কারণেই আমরা এখানে তীব্র শীত অনুভব করছি। আমরা এই শীতের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর আবর্তন বা কক্ষপথকে পরিবর্তন করে শীতকে দমিয়ে রাখতে পারি না। আল্লাহ এই সময়ের জন্য প্রকৃতিকে এভাবেই সাজিয়েছেন—যা আমরা চাইলেও পরিবর্তন করতে পারি না। আল্লাহ বলেন, "আমিই সময়। আমিই দিন এবং রাতের আবর্তন ঘটাই। আমি যদি চাই তাহলে উভয়কে আটকে রাখতে পারি।"

আমরা সময়ের গতিবিধিকেও পরিবর্তন করতে পারি না। আর সময় তো শেষের দিকেই (কিয়ামাতের দিকে) এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সেই বাস্তবতাকেও পরিবর্তন করতে পারি না যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সময় সংকুচিত হয়ে যাবে।" এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (رحمه الله) বলেছেন, "সময় সংকোচনের অর্থ হলো সময়ের বরকত উঠে যাওয়া। যেমন- হয়তো পুরো একটা দিনে কেবলমাত্র এক ঘন্টা সময়ের সমান বরকত পাওয়া যাবে।" ইবনু আবি জামরাহ (رحمه الله) এ সম্পর্কে লিখেছেন, "বেশ কিছু সময় ধরেই এমনটা লক্ষ্যণীয়। দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী জ্ঞান আছে এমন লোকেরা এ বিষয়টি বেশ ভালো করেই জানে। আগে তারা যে কাজগুলো করতে পারতেন, সেই একই কাজগুলো তাঁরা এখন চাইলেও করতে পারেন না। তাঁরা এই বিষয়ে শুধু আক্ষেপ করে যান— কিন্তু কেন এমনটা হয় তার কোনো ব্যাখ্যা তাঁদের জানা নেই।" ইবনু হাজার (رحمه الله) এই সম্পর্কে বলেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের চেয়ে এখন অনেক দ্রুত দিন পার হয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলতে, এর কারণ হলো, সময় সহ সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাচ্ছে। এমনটা হওয়া আসলে কিয়ামাতের আলামতেরই অন্তর্ভুক্ত..."

সময় যতই কিয়ামাতের দিকে এগিয়ে যাবে, লোকজনের মধ্য থেকে বরকত ততই উঠে যাবে। এটি এমন এক বাস্তবতা যাকে হেরফের করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (ﷺ) একবার কবিতার কিছু লাইন লিখেন:

“চলে গেছেন সেসব মানুষ যাদের আমলগুলো ছিলো অনুসরণীয়

তাঁরা সেসব লোক যারা প্রত্যেক পাপ কাজে বাধা দান করতেন,

আর আমি এখন পড়ে আছি সেইসব লোকদের মাঝে যারা একে অপরের ব্যাপারে এতটাই ভ্রান্তিতে আপতিত

যে খারাপ লোক কেবল আরেক খারাপ লোকেরই অনুসরণ করে।”

তাঁর আগে আবু দারদা (ﷺ) বলে গিয়েছেন, “আগে মানুষ ছিল কাঁটাবিহীন পাতার ন্যায়। এখন তাঁরা কেবলই পাতাবিহীন কাঁটা।”

আর সবারও আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলে গেছেন, “পরহেযগার লোকেরা একে একে মারা যাবে। এরপর শুধুমাত্র নির্বোধ লোকেরাই বাকি থাকবে।”

কয়েক শতাব্দী পরের ঘটনা নিয়ে ইবনু কাসির (ﷺ) লিখেন, “যখন ক্রুসেডাররা বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ইসলামি খিলাফত থেকে স্থানীয় আলিমদের প্রতি নির্দেশ আসলো যেন তাঁরা সেখানকার গভর্নরদের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে দেখা গেল অগণিত মুসলিম শাম থেকে ইরাকে পালিয়ে গেল। অল্পকিছু আলিম যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শাসকদের যুদ্ধ করার জন্য আহবান জানান, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইবনু আকিল। মানুষের মনমানসিকতা তখন কেমন তা সারসংক্ষেপে তুলে ধরেন এভাবে, ‘সবচেয়ে আজব জিনিসগুলোর একটি আমি মানুষের মাঝে দেখেছি তা হলো, কীভাবে মানুষ তার ধ্বংস হওয়া ঘড়বাড়ি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত আত্মীয়স্বজন, আয়রোজগারের ক্ষতি নিয়ে আফসোস করে চলেছে এবং এবং সেজন্য তারা তাদের সময় ও তাদের লোকদেরকে দুষছে। অথচ তাদেরই চোখের সামনে ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, মানুষের মধ্য থেকে দ্বীন হারিয়ে যাচ্ছে, সুন্নাহর প্রচলন উঠে যাচ্ছে, বিদআতের আবির্ভাব ঘটছে, মানুষ পাপের মধ্যে ডুবে থাকছে, অনর্থক এবং ক্ষতিকর কাজে সময় নষ্ট করছে—এসব নিয়ে আমি তাদের কাউকে না দেখলাম দ্বীনের ব্যাপারে আফসোস করতে, না দেখলাম তার জীবনের অনর্থক নষ্ট হওয়া বছরগুলো নিয়ে দুঃখভরে চোখের পানি ফেলতে। এর কারণ আমি মনে করি, এই লোকগুলো তাদের দ্বীন নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। তারা কেবল তাদের দুনিয়াবি লাভ-ক্ষতি নিয়ে আশংকাগ্রস্ত। সালাফরা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত।”

কাজেই এই লোকগুলো পেছনেই পড়ে রইল। তারা বুঝতে পারল না তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ঈমান। ঈমান হারানো নিজের জীবন হারানোর চাইতেও বেশি

ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, "আর ফিতনা-ফাসাদ তো হত্যার চেয়েও গুরুতর।" (সূরাহ বাকারা ২:১৯১) আশ শাওকানি (ﷺ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "দ্বীনের উপর যেকোনো ধরনের ফিতনা আপতিত হওয়া নিহত হওয়ার চেয়েও গুরুতর, তা যেমন রূপই নেয় না কেন।"

এই ফিতনা হতে পারে খুবই সূক্ষ্ম। আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের কাছ থেকেও ফিতনা আসতে পারে। যেমন- অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের মতো মুসলিমরাও ট্রাম্পের শাসনামলে নির্যাতিত হবার ভয় করছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিমরা সমকামি, হিজড়াদের সাথে এক কাতারে মিলেমিশে আছে। সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের বিধিবিধান পৃথিবীর অনেক মানুষের কাছে আপত্তিকরে ঠেকে। আবার এই লোকগুলোই মুসলিমদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল। আর তাই কিছু আমেরিকান মুসলিম সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে নমনীয় করে অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চাইছে। অথচ এই কাজটি করতে গিয়ে তারা একটি ফিতনা থেকে বাঁচতে গিয়ে আরো বড় ফিতনায় আপতিত হয়েছে।

জামাল জারাবজো তাঁর *আত্মার পরিশুদ্ধি* নামক বইয়ে লিখেন,

"মুসলিমদের বুঝতে হবে যে তাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বর্তমান বিশ্বের সকলের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, যারা পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশই বর্তমানে তাদের চিন্তাচেতনায়—বিশেষভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ। অন্যদিকে একজন মুসলিমের জীবন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কোনো মানুষের মতামত বা আদর্শ কখনোই আল্লাহ এবং তার রাসূল (ﷺ)-এর বাণীর সমকক্ষ হতে পারবে না।"

তিনি আরো লিখেন, "বাস্তবতা হচ্ছে, হয় এসব অমুসলিমদের উদ্দেশ্য মন্দ, নতুবা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে যে ওহী এসেছে তা সম্পর্কে বেখবর। সুতরাং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইবাদাত, নীতি-নৈতিকতা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস–এগুলোর কিছুই তাদের নেই, তাহলে মুসলিমদের দেওয়ার মতো তাদের কীই বা আছে? তারা শুধুমাত্র মুসলিমদের ক্ষতিই করতে পারে। যেহেতু অধিকাংশ অমুসলিমরাই ইসলামকে মোটেই বোঝে না, সুতরাং তারা ইসলামকে তাদের নিজেদের 'আধুনিকায়িত' বিশ্বাসের আলোকেই দেখে। এমনকি যাদেরকে ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে হয়, তারাও মুসলিমদের থেকে এমন কিছু চায় যা ইসলাম ত্যাগেরই নামান্তর।"

অবশেষে তিনি লিখেন, "আল্লাহ সেসব (কাফির) লোকদের পরীক্ষা করে দেখবেন যারা নিজেদের আসলেই একনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ মনে করে। কিন্তু তাই বলে মুসলিমদের আচরণের কোনো পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়।

এই মানুষগুলো যতই (আন্তরিকভাবে) চেষ্টা করুক না কেন, তাদের মনের উদ্দেশ্য যতই ভালো মনে হোক না কেন, কিংবা তারা যতই চমৎকার স্লোগান দিক না কেন—(তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না) মুসলিমদের অবশ্যই দ্বীন ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই কাফিররা তাদের চোখে যেটা ভালো বা উত্তম, হয়তো সেটাই মুসলিমদের জন্য চায়, কিন্তু তাদের এই চাওয়া কার্যত এই চাওয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামকে বদলে দিতে চায়। বাস্তবতা হচ্ছে তাদের এই চাওয়া মুসলিমদেরকে ইসলামের দেখানো আত্মশুদ্ধির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যদি এই কাফিররা দাবিও করে, তাদের নিয়ত ভালো, তারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, সেক্ষেত্রেও যা ঘটার তাই ঘটবে—আত্মশুদ্ধির পথে থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে রাখতে তারা শ্রম দিচ্ছে। তাই শেষ কথা একটাই—মুসলিমদের সরল পথে অটল থাকতে হবে এবং অন্যদের দেখানো পথ প্রত্যাখ্যান করতে হবে।"

সরল পথে অটল থাকা শেষ জামানায় এতই কঠিন হয়ে যাবে যে—রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেছেন, "এমন একটা সময় আসবে যে আমার উম্মাহ দাজ্জালের আবির্ভাব কামনা করবে!" কেন এমন হবে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "কারণ তারা (খুব বড় বড়) ফিতনার সম্মুখীন হবে।" এই ফিতনাগুলো হবে খুবই কঠিন প্রকৃতির। লেইনের লেক্সিকন অভিধানে "ফিতনা" শব্দের অর্থ করা হয়েছে "জ্বলন্ত আগুনে পোড়া।" শব্দটির আরো কয়েকটি অনুবাদ করা হয়েছে যেমন, "সোনা কিংবা রূপা গলিয়ে মন্দ থেকে ভালো বের করে আনা", "এমন একটি দুঃখ-দুর্দশা যার মাধ্যমে একজনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করা হয়", এবং আরেকটি অর্থ হলো "প্রলোভন", "পাগলামি, উন্মত্ততা কিংবা অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া"।

বাস্তবতা হচ্ছে সময় যতই শেষের দিকে এগিয়ে যাবে ততই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বরকত উঠে যাবে—যা এই এই অস্থির সময়ের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেবে। আমাদের কিছুই করার থাকবে না। ফিতনা সম্পর্কে ইবনু হাজার আল আসকালানি (رحمه الله) লিখেন, "এসব ফিতনার আবির্ভাব হয় সাহাবিদের সময়েই। এরপরে কিছু কিছু জায়গায় ব্যাপক আকার ধারণ করে অন্যান্য জায়গার তুলনায়। আর এই ফিতনাগুলো যখন সার্বিকভাবে প্রবল আকার ধারণ করবে—তখনই কিয়ামাত আসবে। যদিও এই ফিতনাগুলো সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় এগুলো অনেক বেশি হারে দেখা যাচ্ছে। তাই যখনই এক প্রজন্মের পরে আরেক প্রজন্ম আসে, তখনই অনেক কমতি আর ঘাটতি নিয়ে আবির্ভূত হয়।

এই বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকবে সে পর্যন্ত যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "পৃথিবী অবিচার এবং স্বৈরশাসনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।" যার পরপরই ইমাম মাহদী এসে একে পরিবর্তন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন (আল্লাহর ইচ্ছায়)। খালিদ বিন ওয়ালিদ (رضي الله عنه) যখন রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের বড় বড় ভূমি দখল করে চলছিলেন, তখনও তিনি জানতেন ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যে মুমিনদের

মনে হবে যেন তাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই। তাই তাঁকে যখন ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি সেই ফিতনা সম্পর্কে বলেন, "একজন মানুষ তার আশেপাশে দেখবে এবং নিজেকে প্রশ্ন করবে, যে ফিতনা আর বিপদ-আপদের মাঝে সে দাঁড়িয়ে আছে, তা থেকে মুক্ত কোনো কোনো জায়গা আছে কি? কিন্তু সে এমন জায়গা খুঁজে পাবে না।"

আপনি যেখানেই বাস করেন না কেন, পৃথিবীর সাম্প্রতিক অবস্থা সে কথার সত্যায়ন করছে যা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল ওহীর মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, "এমন কোনো সময় আসবে না যার পরবর্তী সময় এর থেকে আরো খারাপ হবে না।" আমরা এই বাস্তবতাকে বদলাতে পারব না, কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এই প্রতিশ্রুত পরিস্থিতির জন্য সাহাবিদের মতো করে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি। যারা তাদের সময়ে নবীজি (ﷺ)-এর প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারকে নিজ চোখে সত্য হতে দেখেছেন, দেখেছিলেন মদীনার ইসলামি রাষ্ট্র সেই জামানার সবচেয়ে বড় বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত। আল্লাহ্ বলেন,

"মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনী দেখল তখন তারা বলল, 'এটাতো তা-ই যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)তো সত্য কথাই বলেছেন।' এতে তাঁদের ঈমান আর আনুগত্যই শুধু বৃদ্ধি পেল।" (সূরাহ আহযাব ৩৩:২২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মাওদুদি (রহ.) লিখেন,

"যখন তাঁরা বিপদের কালো মেঘ দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা আল্লাহর ওয়াদার কথা স্মরণ করলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে ওয়াদা দেননি যে তাঁরা শুধুমাত্র ঈমান আনলেই কোনো পরিশ্রম ছাড়াই সমস্ত পৃথিবীর ওপর রাজত্ব কায়েম করতে পারবেন এবং ফেরেশতারা এসে তাঁদের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে যাবেন। না, বরং আল্লাহর ওয়াদা হলো যে—তাঁরা যখনই বড় বড় পরীক্ষা পার করবেন, কঠিন পরিশ্রম এবং ফিতনা পার করবেন এবং অনেক বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করবেন—তখনই আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর দয়া দিয়ে ধন্য করবেন এবং তাঁদেরকে ওয়াদাকৃত সেই সাফল্য দিবেন দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।"

তিনি আরো বলেন, "যখন তাঁরা ফিতনাকে ধেয়ে আসতে দেখলেন, তাঁরা তাঁদের ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। বরং তাঁরা আরো দৃঢ় হন। আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করার পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠার সাথে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, ঈমান এবং আল্লাহর উপর ভরসা অন্তরের এমন কিছু গুণাবলি যা কিনা আল্লাহর প্রত্যেক হুকুম এবং দাবির মাধ্যমে বিচার করা হয়ে থাকে। জীবনের প্রত্যেক ধাপে আপনি এমন কিছু অবস্থার সম্মুখীন হবেন যেখানে ঈমান আপনার কাছে দাবি রাখবে কিছু

কাজ করার, অথবা কিছু কাজ থেকে বিরত থাকার, কিংবা আপনার নিজেকে, নিজের সম্পদ, সময়, চাহিদাকে বিসর্জন দেওয়ার। এমন প্রত্যেক পরিস্থিতিতে যারাই আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হবে, তাদের ঈমান এবং একনিষ্ঠতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তাদের ঈমান এবং একনিষ্ঠতা আরো শক্তিশালী এবং পরিপূর্ণ হবে।"

তিনি সবশেষে বলেন, "হ্যাঁ আপনি দুটি কালিমা পড়েই মুসলিম এবং মুমিন হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঈমান কখনো স্থির থাকেনা। এটি বাড়ে এবং কমে। একনিষ্ঠতা কিংবা আনুগত্যের কমতি ঘটার কারণে ঈমান কমে যায়। যদি কেবল কমতেই থাকে তবে কমতে কমতে এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যে—ঈমান আরেকটু কমলেই আপনি মুমিন থেকে মুনাফিকে পরিণত হবেন। অন্যদিকে আপনি যতই একনিষ্ঠ, আনুগত্যশীল এবং নিবেদিতপ্রাণ হবেন, আপনি ঈমানে ততই বলীয়ান হতে থাকবেন। একটি পর্যায়ে আপনি সিদ্দীকের মর্যাদায় উন্নীত হবেন।"

সুতরাং ঈমান হচ্ছে এমন কিছু যা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত করে তুলবে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মুমিনের উদাহরণ হলো নমনীয় গাছের মতো যাকে বাতাস ডানে বামে দোলা দেয়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়—কিন্তু ঠিকই এটি পুনরায় সোজা হয়ে যায়, যতক্ষণ না গাছটি শুকিয়ে যায়।"

শুধু তাই নয়, ঈমান যেকোনো পরিস্থিতিকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। যেমনটি রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। প্রত্যেক পরিস্থিতিই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার কোনো কল্যাণ হয়, সে আল্লাহর শোকর করে। আর যদি কোনো অকল্যাণ হয়, তবে সে ধৈর্যধারণ করে যা তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কারো এমনটা হয় না।"

আর পরিস্থিতি যা-ই হোক, সেটা ঈমানের পূর্ণতা লাভের পথে কোনো বাঁধা নয়। যেমনটি রাসূল (ﷺ) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে বাইয়াত দাও যে তোমরা আমার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে—শক্তিশালী বা দুর্বল অবস্থায়। এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করবে ভালো কিংবা মন্দ সর্বাবস্থায়। এবং তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তোমরা মানুষের তিরস্কার এবং বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বলবে। যদি এমনটি করতে পারো, জান্নাত তোমাদেরই জন্য।"

ইস্তিকামাত: সবচেয়ে বড় কারামাত

সম্প্রতি একটি আর্টিকেল পড়েছিলাম, যেখানে মানুষের মনের উপর টেলিভিশনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "ফ্রন্টাল লোব হলো আমাদের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণকারী অংশের মধ্যে জটিলতম অংশ। মস্তিষ্কের এই অংশটি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিক সিদ্ধান্ত, মনোযোগ—এই বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও ক্রমানুসারিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু টেলিভিশন দেখার সময়টায় মস্তিষ্কের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে অবদমিত হয়ে থাকে। হিপনোটাইজড বা সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ যেমন চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে—টেলিভিশন জিনিসটাও তেমনই। মানুষ যা দেখছে বা তাকে যা বলা হচ্ছে, সেগুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা বা সমালোচনা করার ক্ষমতা খর্ব করে দেয় এই টেলিভিশন।

যেহেতু আমরা এমন একটা যুগে বাস করি যেখানে খবরের সাথেও মিথ্যেকে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাই এই সমস্যাটা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। আপনার অজান্তেই টেলিভিশন আপনাকে নিশ্চিন্তমনে একটা ফ্যান্টাসি আর মোহের জগৎ নিয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে। আর তাই, যা কিছু সত্য, যা কিছু প্রামাণ্য—সেসবের প্রতি আপনার গুরুত্ব কমে যায়।

অথচ বাচ্চাদের সাথে কথা বলার সময় একদম নির্দোষ মিথ্যা কথা বলতেও রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি কোনো বাচ্চাকে মিছেমিছি কিছু দেওয়ার ভান করে ডাক দেয় 'এদিকে এসো, এটা নাও,' তাহলে এটাও মিথ্যে (কথা হিসেবে গণ্য হবে)।" আইশা (رضي الله عنها) বলেন, "সাহাবিরা সবচেয়ে বেশি যে স্বভাবকে ঘৃণা করতেন—তা হলো অসততা। নবীজি (ﷺ)-এর উপস্থিতিতে কেউ মিথ্যে কথা বললে তিনি তাকে এর জন্য ধরে বসতেন, যতক্ষণ না তিনি তার তাওবাহ করার ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছেন।" তাবেয়ীগণ এই অভ্যাস ধরে রেখেছিলেন। কাযী শুরাইখ আন-নাখাঈকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আমি এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে বলতে শুনেছি। তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে?" তিনি জবাব দিলেন, "না।" তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মেও এই স্বভাব প্রবাহিত হয়েছিল। ইমাম আহমাদ (رحمه الله) আহলে কিতাবের কাউকে দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। বলতেন, "আমি এমন কারো দিকে তাকাতেও পারি না, যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যে বলে।" তাঁর মুসনাদে বর্ণিত আছে যে, নবীজি (ﷺ) আমাদেরকে মিথ্যাবাদী দাঈদের থেকে

পলায়ন করতে বলেছেন। হুযায়ফা (ﷺ) বলেন, "সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলকে কল্যাণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণের ব্যাপারে। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই কল্যাণের পর কি কোনো অকল্যাণ আসবে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'
আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করবে?'
তিনি জবাব দিলেন, 'তরবারি।'
আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরপর কী হবে?'
তিনি জবাব দিলেন, 'এক অস্বস্তিকর নীরবতা আসবে।'
আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

তিনি বললেন, 'তারপর আবির্ভাব হবে কিছু দাঈর (আহবানকারী) যারা মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে আহবান করবে। কাজেই তুমি যদি জমিনে কোনো জামাতকে দেখো, তাহলে সে জামাতকে আঁকড়ে ধরো, যদিও তিনি তোমাকে প্রহার করেন ও তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেন। যদি তাঁকে না দেখো, তাহলে জমিনে পালাতে থাকো যদিও তোমাকে গাছের গুঁড়ি কামড়ে ধরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরপর কী?'

তিনি বললেন, 'এরপর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে...'"

আলবানি (ﷺ) এই বর্ণনাকে সহিহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে আমাদের শেখানো হয়েছে দাজ্জালের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে, "যে কেউ শুনবে যে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে, সে যেন অবশ্যই তার থেকে দূরে থাকে (নবীজী (ﷺ) এ কথা তিনবার বললেন)। কারণ কেউ তাকে মুমিন মনে করে তার কাছে যাবে, তারপর তার মোহনীয় কথায় বিভ্রান্ত হতে তার সাথে লেগে থাকবে এবং তাকে অনুসরণ করতে শুরু করবে।"

সত্যি বলতে, কিয়ামাতের একটি লক্ষণ হলো ভুল লোকদেরকে অনুসরণ করা আর সঠিক মানুষদেরকে খারাপভাবে উপস্থাপন করা। নবীজি (ﷺ) বলেন, "কিয়ামাতের আগে রয়েছে প্রতারণার যুগ। সে যুগে সত্যবাদীকে অবিশ্বাস করা হবে, বিশ্বাস করা হবে মিথ্যাবাদীকে। সৎ লোককে বিশ্বাসঘাতক ভাবা হবে, আর অসৎ লোককে ভাবা হবে বিশ্বস্ত।"[১৫] সে সময়টায় মানুষ মুনাফিকদের সাথে মিশতে স্বস্তিবোধ করবে।

যেমনটা ইমাম আহমাদ (ﷺ) বলেছেন, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, একজন মুমিনকে মনে হবে পড়ে থাকা লাশ (কেউ তার দিকে ফিরে তাকাবে না),

[১৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদিস নং-৪৮৪০

আর এর পরিবর্তে মানুষ (সম্মানের সাথে) মুনাফিকদের দিকে নির্দেশ করবে।" আর কালক্রমে মুনাফিকরা খুব স্বচ্ছন্দে নিজেদের নিফাক প্রকাশ করতে শুরু করবে। হুযায়ফা (ﷺ) বলেছেন, "নবীজি (ﷺ)-এর সময়কালের মুনাফিকদের চেয়ে এখনকার মুনাফিকরা নিকৃষ্ট। সেসময় তারা নিজেদের নিফাক গোপন করত, আর এখন তা প্রকাশ করে বেড়ায়।" তিনি আরো বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময় কেউ একটি কথার কারণে মুনাফিক হিসেবে গণ্য হয়ে যেত। আর আজকে আমি মানুষকে সেরকম একটি কথা এক বসায় দশবার বলতে শুনি।"

হুযায়ফা (ﷺ) প্রায় ১৪০০ বছর আগে তাবেয়ীনকে এই কথা বলেছেন। তিনি আজকের কোনো মুনাফিককে দেখলে হয়তো দ্রুত মারা যাওয়ার দুআ করতেন।

আমাদের এই সময়ে নিফাক এতটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার একটি কারণ হলো মানুষ আজকাল কিছু একটা দেখেই অতি সহজে মুগ্ধ হয়ে যায়। নবীজি (ﷺ) মানুষের অন্তরের ব্যাপারে বলেছেন, 'অন্তর এমন অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে যে তা ভালোকে চিনতে পারে না আর মন্দকে দূরীভূত করতে পারে না।' ঠিক যেমন হিপনোসিসের কারণে কিংবা টেলিভিশনে অভ্যস্ত হয়ে বিশ্লেষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার মতো। এরকম পরিস্থিতিতে কেবল তারাই রক্ষা পাবে যারা সত্যিকার অর্থে শরীয়াহকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তারাই সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদের ফুরকান দান করবেন।" (সূরাহ আল-আনফাল ৮:২৯) এর ব্যাখ্যায় আশ-শাওকানি (ﷺ) লিখেন, "আল্লাহর প্রতি ভয় বা তাকওয়া হলো তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ব্যাপারে সচেতন থাকা। আর ফুরকান হলো ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা। এর অর্থ হলো, তিনি তোমার হৃদয়কে শক্তিশালী করবেন, দৃষ্টি প্রখর করে দেবেন, আর হিদায়াত পূর্ণ করে দেবেন—যাতে তুমি সন্দেহের সময় এ দুটির মাঝে পার্থক্য করতে পারো।"

ইমাম মালিক (ﷺ) যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন, "এই উম্মাতের প্রথম অংশ যা দিয়ে সংশোধিত হয়েছিল, পরের অংশও কেবল তার মাধ্যমেই সংশোধিত হবে।" এর অর্থ হলো আচরণে সাহাবিদের মতো হওয়া, পৃথিবীকে তাঁদের মতো করে দেখা, তাঁদের মতো করেই সংজ্ঞায়িত করা। বর্তমানে বিভ্রান্তির সময়ে আমাদের জন্য এটা করা আগের চেয়ে বেশি কঠিন। ইবনু মাসউদ (ﷺ) তাঁর এক ছাত্রকে বলেছিলেন, "তুমি এমন এক সময় বাস করছ, যখন ইলম অর্জনের চেয়ে আমল করা বেশি জরুরি। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন আমল করার চেয়ে ইলম অর্জন বেশি জরুরি হয়ে পড়বে।" এই ইলম অর্জন হয় অধ্যয়নের মাধ্যমে।

আর যেসব বিষয় অধ্যয়ন সবচেয়ে জরুরি, তা হলো সালাফরা ঈমান, কুফর, নিফাক, রিদ্দাহ ইত্যাদিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন? আর সালাফদের এই বুঝ হচ্ছে নবীজি (ﷺ)-এর একটি হাদিসের ওপর ভিত্তি করে যেখানে তিনি বলেছেন

মুসলিমদের সবগুলো দল জাহান্নামে যাবে "আর শুধু একটি দল জান্নাতে যাবে। সেটি হলো জামাআহ।"[১৬]

ইমাম আবু শামাহ (ﷺ) বলেন, "জামাআহর সাথে যুক্ত থাকার আদেশগুলো যখন দেখবে, তখন বুঝবে এর অর্থ হলো হক ও হকের অনুসারীদের সাথে যুক্ত থাকা, যদিও তাদের সংখ্যা হয় অনেক কম আর তাদের বিরোধীদের সংখ্যা বেশি। কারণ হক নির্ধারিত হয় প্রথম জামাআহ অর্থাৎ, নবীজি (ﷺ) ও সাহাবিরা কী অনুসরণ করতেন–সেই ভিত্তিতে। তাঁদের পরে অনেক মানুষ বিদআতে লিপ্ত হয়েছে, তাদের দিকে তাকানো যাবে না।" তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে, ইবনু মাসউদ (ﷺ) আমর বিন মায়মুনকে জিজ্ঞেস করেছেন, "তুমি কি জানো জামাআহ কী?" আমর জবাব দিলেন, "না।" ইবনু মাসউদ ব্যাখ্যা করলেন, "বেশিরভাগ মানুষ জামাআহ ত্যাগ করেছে। জামাআহ হলো যা কিছু আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।" নুয়াইম বিন হাম্মাদ (ﷺ) ব্যাখ্যা করেন, "এর অর্থ হলো জামাআহ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পথভ্রষ্ট হওয়ার আগে তারা যা কিছুর অনুসরণ করত তা আঁকড়ে থাক, যদিও তুমি একা হও। কারণ এক্ষেত্রে তুমি একাই হবে জামাআহ।"

কাজেই আমাদের দেখার বিষয় হলো আকিদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি, মানুষের সংখ্যা আর অনুমোদন দিয়ে হক নির্ধারিত হয় না। মুশরিকরা একবার আল্লাহর ইবাদাত করার বিনিময়ে নবীজি (ﷺ)-এর কাছে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন কিছু বিষয়ে তাদের ছাড় দেন। কিন্তু আল্লাহ নিজেই তখন ওহী পাঠিয়েছেন, "আমি তোমার প্রতি যে ওহী করেছি, তা থেকে তোমাকে পদস্খলিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীতে মিথ্যা রচনা করো। তাহলে তারা তোমাকে অবশ্যই বন্ধু বানিয়ে নিত। আমি তোমাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে।" (সূরাহ বানী ইসরাইল ১৭:৭৩-৭৪) ইবনু আব্বাস (ﷺ) ব্যাখ্যা করেন, "নবীজি (ﷺ) মুশরিকদের প্রতি ঝুঁকে পড়া থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। কিন্তু এটি আমাদের জন্য শিক্ষা যে, শরীয়তের কোনো বিধানের ব্যাপারে মুশরিকদের সাথে সমঝোতায় আসা যাবে না।"

মাক্কী যুগে নাযিলকৃত এই আয়াতের ব্যাপারে সাইয়্যিদ কুতব (ﷺ) লিখেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি যেই প্রস্তাব থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন, সরকারপক্ষ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব দাঈদের প্রতি সবসময়ই করা হয়ে থাকে। তারা সবসময় কূটকৌশলের মাধ্যমে দৃঢ় অবস্থান থেকে তাদেরকে শুধু সামান্য বিচ্যুত করতে চায়। জাগতিক পুরস্কারের বিনিময়ে তারা এর মাধ্যমে একটা সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায়। অনেক দাঈ আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া এই সমঝোতাগুলোকে বড় করে দেখে না। আর সরকারপক্ষও তাদেরকে তাদের আদর্শ পুরোপুরি ত্যাগ করতে বলে

---

[১৬] আবু দাউদ, *আস-সুনান,* হাদিস নং-৪৫৯৭

না। বরং এদিকে সেদিকে হালকা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করে—যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে মিলিত হতে পারে।

যে মানুষটি আদর্শের পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে চায়। বলে—কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তো তুমি তোমার আদর্শকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদর্শের পতাকাবাহীরা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে আপস করতে রাজি হওয়ার পর আসলে সেখানেই থেমে যেতে পারে না। কারণ এরপর যখনই এক পা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। আর এভাবেই দাঈরা ফাঁদে পড়ে।"

সরকারের অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে এরকম লোকের সংখ্যা হাতে গুণে শেষ করা যায়। ইবনু কাসির এমন সব আলিমদের নাম উল্লেখ করেছেন যাদেরকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "দৃঢ়তার সাথে সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন পাঁচজন। তারা হলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল, যিনি ছিলেন তাঁদের নেতা; মুহাম্মাদ ইবনু নূহ আল-জুন্দাইসাবুরি, যিনি মারা যান এবং আহমাদ সহ যাকে মামুনের কাছে নেওয়া হচ্ছিল; নুয়াইম বিন হাম্মাদ আল-খুযাঈ, যিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন; আবু ইয়াকুব আল-বুয়াইতি, যিনি কারাগারে শেকল পরা অবস্থায় মারা যান এবং শেকল বাঁধা অবস্থায় কবরস্থ হওয়ার অসিয়ত করে যান; এবং আহমাদ বিন নাসর আল-খুযাঈ (যাকে কারাগারে হত্যা করা হয়..."

এরা ছিলেন সেই জামানার 'মৌলবাদী'। সত্যি বলতে সেসময়কার মিহনাহ আমাদের সময় থেকে খুব আলাদা কিছু ছিল না। সে সময়ে গ্রীক-দর্শনের আলোকে আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, আর এখন পশ্চিমা ধ্যানধারণার আলোকে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়ে ইসলামকে নপুংসক বানানো হচ্ছে। প্রত্যেককে একটি পথ বেছে নিতে হয়। যারা বিক্রি হয়ে যায়, তাদের চাকরি থাকে, তাদের পিঠ চাপড়ানো হয়। আরেক দল চড়া মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত থাকেন। দ্বিতীয় দলটির ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'নুনিয়্যাহ'তে লিখেছেন,

"আল্লাহ্ তাঁর ওয়াস্তে ভোগকৃত কষ্টগুলো বৃথা যেতে দেন না,
বান্দার একাকীত্ব, ইয়াকীন, ভালোবাসা ও বুঝের সাক্ষ্য দেয় শত্রুর বন্যা,
দুর্বলতা তো এটাই যে, শয়তানের মুষ্টিমেয় বন্ধুর কাছে সে দিয়েছে ধর্ণা,
একদল পিছু হটলে আরেকদল আক্রমণ করে, এটাই জায়গায় সংখ্যাধিক্যের ছলনা,
একাকীকে জিজ্ঞেস করো মুহুর্মুহু আক্রমণের মুখে কী তার ভাবনা,
এ যেন শেষ হবার নয়, কবেই শেষ হয়ে গেছে কল্যাণের জামানা,
তাই তো সে হাতে অঙ্গার ধরা ব্যক্তি, জানতে চাও তার অন্তর পুড়ে যাবার ভাবনা,
আল্লাহ্ জানেন তার অন্তরের খবর, এই জানাই কি যথেষ্ট না?
হৃদয়ে এমনকিছু ঘটে, যা সেই মহান দানকারী ছাড়া কেউ জানতে পারে না।

কল্যাণ, তাওহীদ, সবর, সন্তুষ্টি, শোকর আর কুরআনের আইনের স্থাপনা...”

“শত্রুর বন্যা” ধেয়ে আসার এই ওয়াদা শয়তান করেছিল যা কুরআনে উল্লেখিত আছে, “তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পেছন দিয়ে, তাদের ডান দিয়ে, তাদের বাম দিয়ে তাদের কাছে অবশ্যই আসব...” (সূরাহ্ আল-আরাফ ৭:১৭) ইবনু আব্বাস (ﷺ) বলেন, “কিন্তু সে উপরের দিকের কথা বলতে পারেনি, কারণ সে জানে আল্লাহ্ তাদের ঊর্ধ্বে আছেন।” এ এক অলৌকিক ব্যাপার যে, ইতিহাসের কঠিনতম শত্রুরা তাদের সব মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে একটিমাত্র আদর্শকে মুছে ফেলার জন্য মহাজোট গঠন করেছে, কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষরা তাদের নীতি থেকে এক চুলও সরবে না। তারা সেই একই উত্তর দেবে যা ইমাম আহমাদ (ﷺ) রক্তাক্ত অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমাকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ থেকে কিছু দাও, আমি তার সত্যায়ন করব।” এটিই আসলে সর্বশ্রেষ্ঠ কারামাত। ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) বলেছেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ কারামাত হলো ইস্তিকামাহ (অটলতা) বজায় রাখা।”

আজকের লোকেরা যেমন ইমাম আহমাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পায়, তিনি ঠিক তেমনি তাঁর পূর্বেকার লোকদের থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন—যারা জীবনের চেয়ে সত্যকে বেশি ভালোবাসতেন। ইমাম আহমাদ (ﷺ) রাক্কায় থাকাকালীন মিহনার সময়কার এক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-বুশানজি (ﷺ) বলেন, “রাক্কায় অবস্থানকালে লোকেরা আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদ) সেসব বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, যেখানে প্রমাণ করা হয়েছে জীবন বাঁচানোর জন্য মুখে স্বীকৃতি জানানো জায়েয। তিনি জবাব দিলেন, ‘তাহলে খাব্বাব (ﷺ)-এর হাদিসটির ব্যাপারে কী বলবে, যেখানে বলা হয়েছে তোমাদের আগে এমনও লোক ছিল যাকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে কিন্তু সে তাঁর দ্বীন ত্যাগ করেনি?’ এই কথা বলার পর আমরা তাঁকে মানানোর আশা ছেড়ে দিলাম।”

কারাগারের ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করেও ইমাম আহমাদ (ﷺ) শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান, তবে সেটা আসল কথা নয়। আসল কথাটি ইবনুল জাওযি (ﷺ) লিখেছেন, “ইমাম আহমাদ এমনি এমনি বিখ্যাত হননি। মানুষ তাঁর কবর যিয়ারাতে যেত কারণ তিনি অসাধারণ কিছু করে গেছেন। কী অসাধারণ সম্মাননা যা দিগন্ত ছেয়ে ফেলে, কী এক সৌন্দর্য যা জীবনকে অলঙ্কৃত করেছে, কী এক মর্যাদা যা অমর্যাদাকে মুছে দিয়েছে! এ সবই তো কেবল দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তি। আর আখিরাতের পুরস্কার তো অবর্ণনীয়! অন্যদিকে ভেবে দেখুন বাকি আলিমদের কথা, তাদের কবরগুলো আজ অজানা, অবহেলিত। কারণ তাঁরা একটি সহজ পথ বেছে নিতে চেয়েছিলেন, বেছে বেছে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক ব্যাখ্যাগুলো আঁকড়ে ধরেছিলেন আর সরকারের সহযোগী হয়েছিলেন। তাই তাদের ইলমের বরকত আজ হারিয়ে গেছে, তাঁদের সম্মান মুছে গেছে, আর মৃত্যুশয্যায় তাঁরা পান করেছিলেন অনুশোচনার পেয়ালা থেকে ...”

১০ মুহাররাম: একটি সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা

দেয়ালে ঝুলে থাকা হিজরি ক্যালেন্ডারটি মনে করিয়ে দিচ্ছে আজকে মুহাররামের দশ তারিখ। হিজরি ১৪৩৪ সাল।

ইতিহাসের পাতায় ভর করে চলে গেলাম ১৪৩৩ বছর আগের ঠিক এই দিনে। মদীনাতে সেদিন একটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথন হয়। বিখ্যাত সাহাবি এবং আলিম আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, তাঁর চাচাতো ভাই অর্থাৎ শেষ নবী ও আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির কাছে প্রেরিত শেষ রাসূল, মুহাম্মাদ (ﷺ) একদল ইহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা ঐদিন সিয়াম পালন করছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের কাছে জানতে চান তারা কেন সিয়াম পালন করছিল। তারা উত্তরে জানাল, "এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিন। এই দিনে আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (عليه السلام) ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরআউন ও তার লোকজনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই মূসা (عليه السلام) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিনে সিয়াম রাখতেন। তাই আমরাও এইদিনে সিয়াম রাখি।"[১৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "এই দিনে আল্লাহ মূসা (عليه السلام) ও বনী ইসরাইলকে ফিরআউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "মূসা (عليه السلام) এর ওপর তোমাদের চাইতে আমরা বেশি হকদার।"

এই সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতাটি ভালো-বনাম-মন্দ, ঈমান-বনাম-কুফরের চিরায়ত দ্বন্দ্বের দিকে নির্দেশ করে। আজকের এই দিনে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার উপলব্ধি হলো, এ লড়াইয়ের এখনও শেষ হয়নি। আমার মাথায় কিছু ভাবনার জন্ম হলো, সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

---

[১৭] মুসলিম, আস-সাহিহ, হাদিস নং- ২৭১৪

ক. ইতিহাসের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে:

কয়েক হাজার বছর আগে বনী ইসরাইল ছিল এক অত্যাচারিত, নিপীড়িত জাতি। তারা পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী স্বৈরশাসকের অধীনে বাস করত। তাদেরকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মুক্তির দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ মূসা (ﷺ) কে পাঠান। আল্লাহ হাজার হাজার নবী দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন, মূসা (ﷺ) ছিলেন তাদেরই একজন। আল্লাহ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন মূলত তিনটি বিষয়ের উপর শিক্ষা দিতে।

- মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ।
- সুতরাং আমরা কেবলমাত্র তাঁরই কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে বাধ্য এবং আমাদের কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। (অর্থাৎ তাওহীদ)
- তাওহীদ সঠিকভাবে প্রয়োগের পন্থা একমাত্র নবীদের শিক্ষার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। (অর্থাৎ ইসলামে)

এজন্যই হিজরতের পর মূসা (ﷺ) এর সর্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল বনী ইসরাইলিদের কাছ থেকে এ বিষয়গুলো মেনে চলার প্রতিশ্রুতি নেওয়া। বনী ইসরাইলের যে ছোট্ট দলটি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল তাদেরকে নিয়েই মূসা (ﷺ)-এর যুগের মুসলিম সমাজটি গড়ে উঠে। তারা তাওহীদভিত্তিক আকিদার ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ হয়। মূসা (ﷺ) তার অনুসারীদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা টেন কমান্ডমেন্টস (Ten Commandments) নামে পরিচিত। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবী-রাসূলগণ মূলত একই নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই নবী-রাসূলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নূহ (ﷺ), ইব্রাহিম (ﷺ) ও ঈসা (ﷺ), আর মুহাম্মাদ (ﷺ) ছিলেন এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন। তাদের সকলের শিক্ষার মূলকথা ছিল এক। যারা এই শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, তারাই নবীগণের প্রকৃত অনুসারী। আর তাই আজকে যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অনুসরণ করছে অর্থাৎ মুসলিম জাতিই এই আকিদা-বিশ্বাসের প্রকৃত দাবিদার, উত্তরসূরী এবং সংরক্ষক। অন্য সকল জাতি (ইহুদি, খ্রিষ্টান) এই শিক্ষাকে হয় বিকৃত করে ফেলেছে নয়তো পুরোপুরি অস্বীকার করছে। তাই আমরা মুসলিমরাই মূসা (ﷺ) এর যোগ্যতর উত্তরসূরী এবং সব জাতি থেকে মূসা (ﷺ) এর প্রতি আমাদের হকই বেশি। তাই রাসূল (ﷺ) মদীনার ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "মূসা (ﷺ) এর ওপর তোমাদের চাইতে আমাদের হক বেশি।"

কিন্তু বনী ইসরাইলিরা কী করেছে? তাদের উত্তরসূরীরা কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গই করেনি, তারা তাদের আসমানী কিতাবকেও বিকৃত করেছে। তারা পরবর্তী

নবীদের অস্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা নিজেরাই ফিরআউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মূসা (ﷺ) এর প্রকৃত শিক্ষার অনুসারীদের ওপরেই তারা ফিরআউনি কায়দায় নিপীড়ন চালাচ্ছে, অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে মূসা (ﷺ) এই একই শিক্ষায় দীক্ষিত করে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের অন্যায়-অবিচারের নির্মমতা আমরা এখন প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য জায়গায়।

সুতরাং ঈমান এবং কুফরের মধ্যকার এ চিরন্তন লড়াইয়ে সকল নবী রাসূলই অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিহাসজুড়ে খুব কম সংখ্যক মানুষই নবী-রাসূলদের পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। এই লড়াইয়ের চরিত্রগুলোই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হলেও—মূল লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি একই থাকে।

খ. এই সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা কেবল এ সংঘাতের ইতিহাসকেই তুলে ধরে না, বরং এর অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ধারণা দেয়।

বনী ইসরাইলের প্রতি মূসা (ﷺ) এর প্রতিশ্রুতিকে আল্লাহ কুরআনে তুলে ধরেছেন এভাবে,

"মূসা তার কওমকে বললেন, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের রব শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১২৮-১২)

এরপর আল্লাহ বর্ণনা করেন কীভাবে তিনি জালিমদের ধ্বংসের সূচনা করেন এবং এই ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করেন। তাদের ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দার মাধ্যমে:

"তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফিরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১৩০)

কিন্তু তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি। বরং, "তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১৩২)

তারা যে শুধু উদ্ধত আচরণ করল তাই নয়, উপরন্তু তাদের সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্য কেবল বৃদ্ধিই পেল।

"ফিরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।" (সূরাহ কাসাস, ২৮: ৩৯)

এবার আল্লাহ তাদেরকে তাদের রাজত্বের অবশ্যম্ভাবী পতনের দিকে নির্দেশ করে আরো পাঁচটি সতর্ককারী নিদর্শন দিয়ে জবাব দিলেন। মজার ব্যাপার হলো এই নিদর্শনগুলোর প্রথমটি ছিল একটি বন্যা।

"সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম বন্যা ..." (সূরাহ আল-আরাফ, ৭: ১৩৩)

কিন্তু এরপরও তাদের অবিশ্বাস এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রইল। অবশেষে একসময় তাদের অত্যাচারী শাসন শেষ হলো, মদীনার ইহুদিদের ভাষায়, "আল্লাহ তাঁর নবী মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরআউন ও তার লোকজনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার লোকজনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।" আল্লাহ নিজেও এই ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন,

"সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভুখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাইলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছে সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।" (সূরাহ আরাফ, ৭: ১৩৬-১৩৭)

প্রতাপশালী ফিরআউন এককালে নিজেকে পৃথিবীতে ইলাহ হিসেবে দাবী করত। কিন্তু শেষকালে তার সাম্রাজ্যের পতন, রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে আর্থার ফেরিলের সেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি মনে করিয়ে দেয়:

"রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাই যে রোমান সাম্রাজ্য অধঃপতিত হতে হতে একসময় ধ্বংস হয়ে যায়।"

এটি এক কালোত্তীর্ণ সত্য। তাওহীদের অস্বীকারকারী এবং তাওহীদবাদীদের বিরোধিতাকারী প্রতিটি জাতি, সমাজ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তথ্যটি প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এরূপ অশনিসংকেতবহ ঘটনার মধ্যে রয়েছে আমেরিকায় স্যান্ডি নামক ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং জেনারেল পেট্রাউস, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের

নেতৃত্ব দিয়ে শেষকালে পরকীয়ার অভিযোগে চাকরিচ্যুতি। এ খেলায় অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের পরিণতি আমাদের সামনে উন্মুক্ত।

গ. হাজারো ফিরআউনীয় কারাগারের একটির অসংখ্য সেলের একটি সেলের টেবিলে বসে এই লেখাটি যখন আমি লিখছি তখন অতীতের সাথে বর্তমানকে মিলিয়ে নিতে গিয়ে আরেকটি বিষয় আমার মাথায় এসেছে।

আমি চোখ বন্ধ করে বনী ইসরাইলের একজন মুসলিমের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম।

সারা রাত ধরে হেঁটে চলেছি। দীর্ঘ রাতের শেষে সূর্যোদয়ের সময় হয়ে এলো প্রায়। অবশেষে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। সামনে আদিগন্ত জলরাশি। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই মেরুদন্ডে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল। ফিরআউনের স্পেশাল এলিট ফোর্স আমাদের পাকড়াও করতে ছুটে আসছে, আছে ফিরআউন নিজেও। আমি অস্থির হয়ে ডানে-বামে তাকালাম। আমার সহযাত্রী ভাই-বোনেরাও প্রযুক্তিগতভাবে যোজনে-যোজনে এগিয়ে থাকা এক শত্রুবাহিনীর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। ফেরআউনের বাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তারা কি আমাদের ধরে ফেলবে? নাকি তার আগেই আমরা সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করব? কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। একজন আর্তনাদ করে মূসা (ﷺ) কে বলল, "আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম!" (সূরাহ শুআরা, ২৬: ৬১)

মূসা (ﷺ) বলে উঠলেন, "কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।" (সূরাহ শুআরা, ২৬: ৬২) হঠাৎ তিনি হাতের লাঠিটি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করলেন আর সাথে সাথেই সমুদ্রের পানি দুভাগ হয়ে উঁচু পর্বতের চূড়ার মতো আকার ধারণ করল। মাঝখানে তৈরি হওয়া পথ দিয়ে আমরা সমুদ্র অতিক্রম করলাম। যেতে যেতে পিছু ফিরে ফিরআউন আর তার বাহিনীকে একনজর দেখার চেষ্টা করলাম। কুফর, অহংকার আর অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক সেই বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবে যেতে দেখলাম। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও আমরা নিজেদের জীবনের ভয় করছিলাম। ফিরআউন ও তার বাহিনী ভেবেছিল শীঘ্রই তারা আমাদের ধরে ফেলবে। আমরাও ভেবেছিলাম এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম! কিন্তু যখন তারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান মনে করছিল আর আমরা নিজেদের সবচেয়ে বেশি অসহায় মনে করছিলাম—ঠিক তখনই চোখের পলকে পাশার দান উল্টে গেল।

ঈমান আর কুফরের এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এমনই হয়।

অতঃপর আমি পবিত্র কুরআনের সূরাহ ক্বামারে এলাম। এখানেও চল্লিশ নং আয়াতে এসে আবার ফিরআউনের উল্লেখ পেলাম,

"আমি কুরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।" (সূরাহ আল ক্বামার, ৫৪: ৪০-৪৪)

এই আয়াতের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি মন্তব্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল মক্কায়। তখনকার মুসলিমদের অবস্থা ছিল মূসা (ﷺ) এর সময়ের বনী ইসরাইলিদের মতো অত্যাচারিত। কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না তারা। আজকের অনেক মুসলিমও এর মাঝে নিজেদের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারে। সুন্দর সেই মন্তব্যটি করেছিলেন স্বয়ং উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)। তিনি বলেছিলেন, "যখন সূরাহ ক্বামারের এই আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কারা পরাজিত হবে? কাদের পাকড়াও করা হবে?"

কারণ উমার (ﷺ) যা শুনছেন তার সাথে বাস্তব পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কেননা এই ৪৪নং আয়াতে বলা হচ্ছে, কাফিরদের দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে, অথচ মুসলিমরাই কিনা তখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছে! যাই হোক, অল্প কয়েক বছর পরেই দৃশ্যপট বদলে গেল। উমার (ﷺ) এবং তাঁর সাথীরা মক্কার তপ্ত রোদের মাঝে নয় বরং শত শত মাইল দূরে বদরের প্রান্তরে নিজেদের আবিষ্কার করলেন। সেখানে তারা অত্যাচারী সরকারের হাতে বন্দী নন, বরং একটি যুদ্ধের ময়দানে সেই অত্যাচারী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আর আমরা জানি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধটিতে মুসলিমরা ত্বরিত জয়লাভ করে আর পৌত্তলিক কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। উমার (ﷺ) বললেন, "যখন বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বর্ম পরিধান করছিলেন এবং বারবার বলছিলেন, "এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে"—ঠিক তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই আয়াতটি আসলে কোন দলের কথা বলছে—তার আগে নয়।"[১৮] আল্লাহ চাইলে মুহূর্তের মাঝেই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারেন। সূর্য ডুবছে। আমার ইফতারের সময় হয়ে এলো।

[১৮] সানআনি, আবদুর রাযযাক, তাফসিরুল কুরআন, ২/২০৯; ইবনু কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, ৭/৪৮২

বৈচিত্র্য

বসন্তের প্রথম দিনটিতে এই কামরায় পা রেখে দেখুন, বাহিরের দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত। মাথার ওপর তাকালে আপনি লক্ষ কোটি মাইল দূর থেকে ছুটে আসা সূর্যের কিরণরশ্মি দেখতে পাবেন। অথচ যে পৃথিবীর বুকে আপনি দাঁড়িয়ে, সেই পৃথিবীটাকেই আপনার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে কারাগারের প্রাচীরগুলো।

মানুষ কীভাবে দেখে? কয়েকশত বছর আগে, ইরাকের এক গণিতবিদ ইবনু আল হাইসাম এ প্রশ্নের জবাবে তাঁর কিতাব *'আল মানাযির (Book of Optics)'*-এ বলেছিলেন, আমরা দেখতে পাই কারণ আলোকরশ্মি বস্তুর ওপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে। তবে যে যুগে তিনি এ কথা লিখেছেন, তখন পশ্চিমের বেশিরভাগ চিন্তাবিদের ধারণা ছিল তার উল্টো। আমাদের চোখ থেকে আলোকছটা বের হয়েই নাকি বস্তুর ওপর পড়ে! কালের পরিক্রমায় ইবনু হাইসামের কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে, আমরা যা দেখি তা চারপাশের বস্তু থেকে আসা প্রতিফলিত আলো। চক্ষুগোলকের ভেতরে ও চারপাশে রেটিনা নামের যে পাতলা আবরণী আছে, তাতে আছে লক্ষ লক্ষ সংবেদনশীল কোষ; যেগুলো প্রতিফলিত আলোকে শোষণ করে নেয়, এরপর সেগুলোকে ইলেকট্রিক সিগন্যালে পরিণত করে মস্তিষ্কে পাঠায়। বাকি কাজ মস্তিষ্কের। এইসব ইলেকট্রিক সিগন্যালকে সাজিয়ে-গুছিয়ে "রঙিন চিত্র" হিসেবে মস্তিষ্ক আমাদের সামনে হাজির করে। এই হলো আমাদের দেখতে পাওয়ার প্রক্রিয়া। আল্লাহ তাআলা "পৃথিবীতে যেসব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন..." (সূরাহ নাহল ১৬:১৩) সেসব আমরা এভাবেই দেখতে পাই।

যদিও বসন্তের রঙিন সমাহার এখান থেকে নজরে আসে না, কিন্তু এই যে রঙের অস্তিত্ব, এই বিষয়টা দুএকটি গুঢ় রহস্য উন্মোচন করে দেয় ঠিকই। কিছুক্ষণ আগেই একটি আয়াত উল্লেখ করেছি। ঐ একই সূরাহর আরও গভীরে আছে মৌমাছির উদরস্থ মধুর কথা। আল্লাহ বলেছেন, "তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়...।" (সূরাহ নাহল ১৬:৬৯) এই মধুও হয় নানা রঙের—সাদা থেকে শুরু করে গাঢ় বাদামী (amber)—এক এক গাছের রস থেকে তৈরি হয় এক এক জাতের মধু। আবার এই গাছগাছালিরও কত রঙ! আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেন, "তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের

ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তা দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেছেন?" (সূরাহ যুমার ৩৯:২১)

কুরআনের অন্যখানে তিনি জানতে চাইলেন, "তুমি কি দেখোনি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদগত করি? পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ-সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ। অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে..." (সূরাহ ফাতির ৩৫:২৭-২৮)

অসীম মহাবিশ্বের উদাহরণ টানার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা রং আর ভাষার মত সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকেও চিহ্ন বা নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হচ্ছে মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের বৈচিত্র্য..." (সূরাহ রুম ৩০:২২)

লক্ষ্য করুন, ওপরের প্রত্যেকটি আয়াতে যেখানেই রঙের অস্তিত্বের কথা এসেছে, সেখানেই একে যুক্ত করা হয়েছে জ্ঞানের সাথে। আয়াতগুলোর শেষ হয়েছে এভাবেই—"সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে", "নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে", "নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে", "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" দশজনের কাছে এগুলো কোনো চিন্তার উদ্রেক করে না, কিন্তু জ্ঞানী লোক মাত্রই বুঝবেন—প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রঙের এমন বৈচিত্র্য থাকার অন্তর্নিহিত অর্থ কী।

এমন বৈচিত্র্য আপনি দেখবেন মুসলিম উম্মাহর ক্ষুদ্র ভাগ—আত তাইফা আল মানসুরার মাঝেও! এই ক্ষুদ্র অংশটির মাঝেও কত বৈচিত্র্য রয়েছে। সাদা বর্ণের চেচনিয়ান থেকে শুরু করে কালো বর্ণের নাইজেরিয়ান, আর এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সব রঙের মানুষ বিদ্যমান, অথচ তাদের উৎস কিন্তু একটাই! আশ-শাওকানি (ﷺ) বলেছিলেন, "পুরো মানবজাতি কেবল এক নারী ও এক পুরুষ থেকে আগত, এবং একটি সাধারণ জাতি (মানবতা) ও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের (কথা বলার ক্ষমতা) দ্বারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু মানুষ একে অপরের থেকে এতটা স্বতন্ত্র হয়ে যায় যে, পৃথিবীর দুটি মানুষ সম্পূর্ণরূপে একরকম হয় না, বরং প্রত্যেকের মাঝেই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। আর এই যে বৈচিত্র্যের মাঝে অনন্য এক সৃজনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে—এটা তারাই বুঝবে যারা চিন্তাশীল।"

যারা চিন্তা করে, প্রকৃতির রূপ-লাবণ্য আর মানবজাতির সৌন্দর্যের বিষয়টিও তাদেরকে নাড়া দেয়। কতটা নাড়া দেয়? নবীজি (ﷺ)-এর একটি সহিহ হাদিস থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারি। মিরাজের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, "(মিরাজের সময়) আমি সায়্যিদুনা ইউসুফের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, আর

তাকে দেখে বুঝতে পারলাম সমস্ত সৌন্দর্যের অর্ধেক তাকে দেওয়া হয়েছে।" সায়্যিদুনা ইউসুফ (ﷺ) এত সুপুরুষ ছিলেন যে সাহাবি ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) তাঁর চেহারাকে একটি ঝলমলে আলোর সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন[১৯], "তাঁর চেহারা এতো অপূর্ব ছিল যে কোনো নারী জরুরি দরকারে তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি মুখ ঢেকে ফেলতেন, তিনি এই ভয় পেতেন যে নারীরা তাকে দেখে ফিতনায় পড়ে যাবে।" আর সত্যিই, যখন একদল নারী তাকে দেখল, তারা বলে উঠল, "কখনোই নয়, এ ব্যক্তি মানুষ নয়, এ তো এক মহান ফেরেশতা!" (সূরাহ ইউসুফ ১২:৩১) আশ-শাওকানি (رحمه الله) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, "সায়্যিদুনা ইউসুফ (ﷺ)-এর মানবীয় দিকটিকে তারা উপেক্ষা করেছিল। তিনি ছিলেন অসম্ভব মাত্রায় সুপুরুষ। এমন সৌন্দর্য্য মানুষ এর আগে কখনও দেখেনি। মানুষের দৃষ্টি এ পর্যন্ত যাকেই দেখেছে, তারা কেউ তাঁর সৌন্দর্যের ধারেকাছেও আসতে পারবে না। আর এই অস্বাভাবিক সৌন্দর্যের কারণে তারা তাকে মানবসমাজের একজন না বলে, ফেরেশতাদের একজন হিসেবে বর্ণনা করল। যদিও তারা কোনোদিন ফেরেশতাকে দেখেনি, তবে তাদের মন বলছিল যে ফেরেশতারা মানবজাতির চাইতে রূপে, গুণে ও অন্যান্য সকল দিকে নিশ্চয়ই উন্নতই হবে।"

স্বয়ং নবীজি (ﷺ)-কে বর্ণনা করার সময়ে আল-বারা ইবনু আযীব বলেছিলেন, "আমি তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আর কিছুই দেখিনি।"

তেমনি নবীজি (ﷺ)-ও লক্ষ রাখতেন যেন তাঁর সাহাবিদেরকে দেখতে সুন্দর লাগে। একটি সহিহ হাদিসে এসেছে, তিনি নিজে একবার আবদুর রহমান ইবনু আউফ (رضي الله عنه)-কে কালো পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন, পাগড়ি থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ শিষ ঝুলে ছিল, আর নবীজি (ﷺ) বলেছিলেন, "এটাই উত্তম আর দেখতে বেশি সুন্দর লাগছে।"

একবার নবীজি (ﷺ)-এর সূরাহ আর-রাহমানের তিলাওয়াত শুনে এক কাফির ব্যক্তি (কাইস বিন আসিম আল-মিনকারী) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের তুলনা দিয়েছিলেন অঙ্কুরিত তরুর সাথে। তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, সৌন্দর্য্য একে (কুরআনকে) সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এর মধ্যে আছে মিষ্টতা। এর মূলে রয়েছে প্রচুর পানি, এর পল্লবিত ফলগুলো হলো এর চূড়া। এই কথাগুলো কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য রব নেই, এবং আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" আর তাই নবীজি (ﷺ) আমাদের বলেছেন, "তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে কুরআনকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তোল।"

---

[১৯] তার মানে এই না যে, ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) ইউসুফ (ﷺ)-কে দেখেছেন। তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে শুনে বলেছেন।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, “কুরআনের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের কণ্ঠকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে নাও।”

বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্য্যের অভাব কারাগারকে কারাগার বানায়। কিন্তু বন্দী জীবনের এই ধূসর দিনগুলোকে রঙিন করে তুলতে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না। একটি কুরআনের কপি আর কামরায় মোটামুটি একজন ক্বারী থাকলেই চলে। মুসলিম কারাবন্দীরা একে অপরের কুরআন শুনে এই বদ্ধ ঘরেও যে অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের স্পর্শ অনুভব করে—তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব না। আমাদের মনে পড়ে যায়—বাইরের পৃথিবীটায় কুরআনের মাধ্যমে এমন আবেগী হতে পারাটা কতোই না দুঃসাধ্য ব্যাপার!

কুরআনের বার্তাবাহক জিবরীল (ﷺ)-ও এই সৌন্দর্য্যে শরীক হয়েছেন। নবীজি (ﷺ)-এর সহিহ বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন জিবরীল (ﷺ)-কে তাঁর প্রকৃত অবয়বে দেখলেন, তখন তাঁর “ডানাগুলো থেকে বাহারি রঙের রত্ন ঝরে পড়ছিল, যাদের প্রকৃতি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।” আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, “তাঁর পালকগুলো রঙবেরঙের মণিমুক্তোয় সজ্জিত ছিল।”

জিবরীল (ﷺ)-কে তাঁর স্বরূপে দেখার ঘটনাটি ঘটেছিল সিদরাতুল মুনতাহা নামক স্থানে—যার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজি (ﷺ) বলেছেন, “এরপর তিনি (জিবরীল) আমাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছালেন, আর তা এমন সব রঙে রঞ্জিত ছিল যেগুলো দেখে আমি চিনতে পারলাম না!” এ ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য, কেননা মানুষের চোখ প্রায় এক কোটি রঙকে আলাদা-আলাদাভাবে চেনার ক্ষমতা রাখে।

সিদরাতুল মুনতাহার অবস্থান সেই সুদূর ষষ্ঠ আসমানে। কিন্তু আসমানের সৌন্দর্য্য বাড়তে বাড়তে একদম নিচের এই প্রথম আসমানেও এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।” (৬৭:৫)

যদি আপনাদের কেউ উৎসাহী হয়ে প্রিজমের মধ্য দিয়ে এই নক্ষত্ররাজি দেখে, তবে দেখতে পাবে কীভাবে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ বিভক্ত হয়ে রঙিন আলোর বর্ণালি সৃষ্টি করে। আর যখন একটা নক্ষত্র জ্বলেপুড়ে যায়, এর প্রতিটি উপাদান পুড়ে গিয়ে নিজস্ব রঙের একটি স্বাক্ষর এঁকে রেখে যায়। নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসা এই বর্ণালি দেখেই বিজ্ঞানীরা টের পায় সেই নক্ষত্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য। আর যেমনি করে আলোর মাধ্যমে রঙের উৎস ও অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তেমনি রঙের দ্বারাই উন্মোচিত হয় আলো ও এর উৎস। কুরআন হলো নূর। (৬৪:৮) আর এর উৎস হলেন আল্লাহ।

আর আল্লাহ তাআলা বারবার উল্লেখ করেছেন রঙ সৃষ্টির কথা, এর একটা উদ্দেশ্য হলো যেন আমরা তাঁর সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানতে পারি। নবীজি (ﷺ) এ পুরো বিষয়টিকে এক কথায় প্রকাশ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য্য ভালোবাসেন।"

আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্যকে এতই ভালোবাসেন যে এমন একটি ঋতু সৃষ্টি করেছেন, যাকে চেনাই যায় তার সৌন্দর্য দিয়ে! এই ঋতুর কথা বলতে গিয়ে ইবনু রজব (ﷺ) বলেন, "বসন্ত বছরের সবচেয়ে সুন্দর সময়। বসন্তে জান্নাতের মাধুর্যের কথা মনে পড়ে যায়, সেখানকার সুখী জীবনের কথা মনে আসে...। এক সালাফ ছিলেন, যিনি সুগন্ধি গাছপালা ও ফলমূল বেচাকেনার দিন বাজারে হাজির হতেন। তিনি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন—এরপর আল্লাহর কাছে জান্নাতের দুআ করতেন।"

বসন্তের শেষদিকে প্রচুর আঙ্গুর ফলে। নবীজি (ﷺ) সালাতুল কুসুফের পর একবার একটা খুতবা দিয়েছিলেন। তখন বলেছিলেন, তিনি জান্নাতের আঙ্গুর ফল ঠিক তাঁর চোখের সামনে দেখতে পেলেন। তিনি সেগুলো ধরার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাত সে পর্যন্ত পৌঁছাল না। উপস্থিত সাহাবিদেরকে তিনি বললেন, "যদি আমি কেবল একমুঠো ভরা আঙ্গুর আনতে পারতাম, তাহলে পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই আঙ্গুরই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হতো।" অথচ পৃথিবীর বুকে চাষ করা লক্ষ লক্ষ টন আঙ্গুরের গুরুভাগ মদ তৈরির পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনি করে, একটি ফলের মাধ্যমে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছে—কেউ জান্নাতে, আর কেউ জাহান্নামে। আবার একই উৎস থেকে আগত পানিও আঙুরের মধ্যে নানারকম বৈচিত্র্য এনে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "এবং জমিনে বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্র রয়েছে— একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খেজুরের গাছ রয়েছে - একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই..." (১৩:৪)

অর্থাৎ একই ফল শুধু যে নানান বর্ণের হয় তাই-ই নয়, বরং স্বাদেও নানান রকম হয়ে থাকে।

মানুষের বেলায়ও বৈচিত্র্যের এই সূত্র খাটে। শাইখ হাফিজ আল-হাকামি *মাআরিজ আল ক্বাবুল এ* লিখেছেন, "মানুষ তার ঈমানের স্তর অনুযায়ী দ্বীনের ক্ষেত্রে এক এক রকম পর্যায়ে পৌঁছে। এ কারণেই, কেউ কেউ বাকিদের তুলনায় উত্তম হয়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও উচ্চস্তরের মানুষ হলেন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী আল্লাহর আম্বিয়াগণ। আর সবচেয়ে নিচু স্তরে রয়েছে তাওহীদে বিশ্বাসী সে সকল লোক, যারা ভালো-খারাপ দুধরণের কাজই করে। এই দুই পর্যায়ের লোকের মাঝে রয়েছে আরও বিভিন্ন স্তর ও

মর্যাদার ঈমানদার ব্যক্তি, যাদের কথা কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন।"

শাইখ হাকামি আরো বলেন, "তাদের অন্তরে যেমন ঈমানের পরিমাণ সমান নয়, তেমনি বাহ্যিক ভাবে সেই ঈমানের প্রকাশেও তারতম্য ঘটে। সত্যি বলতে কী, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে- তারা সবাই মিলে যদি একই সময়ে একই স্থানে থেকে একটি বিশেষ কাজ করে, সেই কাজের মধ্যেও অনেক ফারাক থেকে যায়!

যেমন, জামাতের সালাত। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে—সবাই একইভাবে দাঁড়াচ্ছে, রুকু-সিজদা করছে, উঠছে এবং বসছে। সবাই একইভাবে তাকবির-তাহমিদ-তাহলীল বলছে, কুরআন পড়ছে। সবার একই সমান গতি, একই মসজিদের এক ইমামের পিছে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে সালাত আদায় করছে।

কিন্তু আদতে তাদের মাঝে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। কারো জন্য এই সালাত হলো আনন্দের উৎস! তার ইচ্ছে করে যেন এই সালাত কখনও শেষ না হয়! আর কারো কাছে মনে হয় সে জেলখানার সবচেয়ে দমবন্ধ করা কামরায় আটকা পড়েছে—যত জলদি সালাত শেষ হবে, তত জলদি সে রক্ষা পাবে! তার হয়তো সালাত ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, এমনকি জামাতে কেন যে শরীক হতে এলো—এই ভেবেও আফসোস হয়! কেউ আল্লাহর ইবাদত করার সময় তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা অনুভব করতে থাকে। এমনভাবে সালাত আদায় করে—যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে। আর কারো মন এতটাই বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে যে—সে কী বলছে, কী করছে, এমনকি কত রাকাত সালাত পড়ছে সেটাও স্মরণ থাকে না। একজন সাধারণ দর্শকের চোখে এসবের কিছুই ধরা পড়ে না। কিন্তু যদি চোখের পর্দা তুলে নেওয়া হতো, তবে সে দেখতে পেত একটি কাজের মধ্যেও কতো বৈচিত্র্য, কত ব্যবধান! আর এ বৈচিত্র্য মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখেন, পর্যবেক্ষণ করেন ও তার আমলের হিসাব রাখেন। তিনি সব দেখেন ও সব জানেন—কোনকিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।"

শাইখ আরো বলেন, "একই ব্যাপার জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কখনও দেখা যায়, একই আমীরের নেতৃত্বে একটি দল যুদ্ধ করছে এবং তারা সবাই একই মতের অনুসারী। তারা একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে, সমান সমান প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং একই ধরণের শক্তির অধিকারী। কিন্তু তাদের মাঝে একজন যুদ্ধ করছে অন্ধ আনুগত্যের কারণে; আরেকজন যুদ্ধ করছে লোক দেখানোর জন্যে, যাতে করে সবার কাছে সে সাহসী খেতাব পায়; আর আরেকজন যুদ্ধ করছে যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মালামাল লাভের আশায়। তবে, এমন এক ব্যক্তিও আছে, যে লড়াই করছে কেবলি আল্লাহর কালামকে মর্যাদা দেয়ার জন্যে আর এই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ—যে আল্লাহর পথ ব্যতীত অন্য আর কোনো পথে যুদ্ধ করে না।

এই ব্যক্তির জন্যেই তার প্রত্যেক চলাফেরা, দুশ্চিন্তা ও ক্ষুধা নেক কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

একইভাবে যাকাত, হজ্জ, সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ—অর্থাৎ ঈমান থেকে উৎসরিত প্রতিটি কাজের জন্য একই ব্যাপার প্রযোজ্য। মানুষ এগুলো কাজে তারতম্য করবে, আর কারো কারোটা বাকিদের চেয়ে উত্তম হবে। কার আমল কত ভালো হবে—তা নির্ভর করবে তার জ্ঞানের মাত্রা এবং ঈমানের দৃঢ়তা দ্বারা।"

তাই বলা চলে এই পৃথিবীটা আসলে বিভিন্ন রকম বর্ণালি আর বৈচিত্র্যের সমাহার মাত্র—আর পরের জীবনটাও ঠিক তাই। শাইখ ইতি টেনেছেন এভাবে-

"(ঈমানের) এই স্তরই নির্ধারণ করবে তোমার মৃত্যু কীভাবে হবে।
এই স্তর বলে দেবে কোন অবস্থানে তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে।
এই স্তর বলে দেবে মাওক্বিফে দাঁড়িয়ে তুমি কতোটা ঘর্মাক্ত হবে।
এই স্তর বলে দেবে তোমার আমলসমূহ কেমন হবে আর মীযানে তাদের ওজন কতখানি হবে।"

পতাকা তুলে নাও

জীবনে চলার পথে আমরা নানান ধরনের মানুষের সাথে পরিচিত হই। তবে আমরা আমাদের পছন্দসই শ্রেণির সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। তাদেরকে নিয়ে, তাদেরকে ঘিরে আমাদের জীবন সাজাই। তাই কুরআন খুললে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহ্ আপনাকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা যেন এইসব শ্রেণির কার্যক্রম এবং পরিণতি দেখে সঠিক শ্রেণিটির অংশ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেজন্য কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই:

মুমিনরা 'অর্থহীন বিষয়ে লিপ্ত হয় না' (২৩:৩) আর 'অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি তাদের সামনে উপস্থিত হলে তারা নিজেদের সম্মান সমুন্নত রেখে বিনয়ের সাথে সেসব বিষয় এড়িয়ে যায়' (২৫:৭২)। অন্যদিকে 'এমন মানুষও আছে যারা অর্থহীন কথাবার্তায় নিমজ্জিত থাকে' (৩১:৬)। এই দুই শ্রেণীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি কোন দলের অংশ হতে চান। তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

সামনে এগোলে আল্লাহ্ আপনাকে অন্য এক শ্রেণির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এরা 'অসহায়দের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না'(৮৯:১৮) এবং 'নিজেদের ধন-সম্পদ গভীরভাবে ভালোবাসে'(৮৯:২০)। একই সাথে তিনি এদের বিপরীত শ্রেণির সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন যারা "অন্যদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং দারিদ্র্যের হুমকির সম্মুখীন হয়েও নিজেদের উপর অন্যের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়'। (৫৯:৯)

আপনি পরিচিত হবেন তাদের সাথে 'যারা নিতান্ত অলসভাবে এবং লোক দেখানোর জন্য সালাতে দাঁড়ায় আর আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে।' (৪:১৪২) এবং তাদের সাথেও 'যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী এবং একাগ্রচিত্ত' (২৩:২)।

এমন মানুষও আপনার জীবনে আসবে যারা শুধুই 'ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে আর চতুষ্পদ জন্তুর মতো খাওয়া-দাওয়া করে'(৪৭:১২) আবার সেই সমস্ত চিন্তাশীল



লোকেরা আপনাকে নাড়া দিয়ে যাবে যারা 'আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে' (৩:১৯১)।

'নিজের প্রবৃত্তিকেই রবের আসনে বসিয়ে নিয়েছে' (৪৫:২৩) এমন মানুষের পাশাপাশি 'অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে' (২:১৬৫) এমন মানুষও আপনি দেখতে পাবেন।

এমনকি আপনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবেন যে, ১৪০০ বছরের পুরোনো কুরআন কি অবিকলভাবে আজকের এই পৃথিবীর গল্প আপনাকে শোনাচ্ছে! কুরআন যেন আমাদের সময়ের নেতৃবর্গ আর সরকারসমূহের কথাই বলছে 'যারা পৃথিবীর বুকে অত্যাচারের নেতৃত্ব দেয় এবং পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে অনুগত করে রাখে আর তাদের মাঝেই এক দলের সন্তানদের হত্যা করে তাদের উপর অত্যাচার চালায়' (২৮:৪) আর 'যারা অনুগত হতে অস্বীকার করে তাদের জেলে বন্দী করে রাখার ভয় দেখায়।'(২৬:২৯) এই শাসকেরা 'মুসলিম নারী শিশুদের আগুনের মুখে ঠেলে দেয়' (৮৫:৫) 'শুধু এই কারণে যে তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে।' (৮৫:৮) অথচ এই অত্যাচারীরাই নিজেদেরকে অর্থবিত্ত ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী এবং সভ্য সমাজের মুখপাত্র দাবী করে। (২৮:৭৬) আর এতেই কেউ কেউ ধোঁকা খেয়ে তাদের কুফর এবং অন্যদের উপর তাদের অত্যাচারকে বেমালুম ভুলে গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাদের সমাজ- সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবে, যদি তাদের মতো হতে পারতাম!(২৮:৭৯) কিছু সত্যনিষ্ঠ আলিম মানুষকে সচেতন করতে উঠে দাঁড়ায়(২৮:৮০)। এর ফলে কিছু মুসলিম জেগে ওঠে এবং শত্রুর ভূমিতে নিগৃহীত হওয়ার পর ইসলামের ভূমিতে হিজরত করে (১৬:১১০) এবং কেউ কেউ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নির্যাতিত নারী-পুরুষ এবং শিশুদের রক্ষার্থে আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করে (৪:৭৫)। তবে অধিকাংশ মানুষই দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তোলা এসব শত্রুর ভূমিতে থাকাটাই পছন্দ করে(৪:৯৭)। শুধু তাই নয় বরং গৃহপালিত দাসের মতো 'বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না'(৩:১৬৮) এটুকুও যেন যথেষ্ট নয়। যেই অত্যাচারীরা –

পরিষ্কারভাবে 'একে অপরের সহযোগী'(৮:৭৩, ৪৫:১৯),

যারা চায় আমরা যেন ইসলামকে কাটছাঁট করি, (৬৮:৯)

আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাদের অনুসরণ করলেই শুধু যারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে, (২:১২০)

সেই অত্যাচারী কাফির গোষ্ঠীকে দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট কিছু মুসলিম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে। তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের সেই মিত্রদের আশ্বাস দিয়ে বলে,

"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" আমরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আছি।'(৫৯:১১) কিন্তু যেহেতু 'এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়' (৪:১৪৩), তাই তারা মুমিনদেরকেও আশ্বস্ত করে বলে যে আমরা তো বিশ্বাসী (২:১৪) আর আমরাও তো ইয়ে...মানে... আসলে উম্মাহর বিজয়ই চাই। আর তাই 'যারা পরীক্ষায় পড়লেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়' (২২:১১) এমন মানুষদের সাথে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। তবে আপনি এমন মানুষের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করবেন 'যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে' এবং 'যাদের সংকল্প বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি' (৩৩:২৩)

আর এভাবেই কুরআন পড়ার সময় মানবজাতির সর্বোত্তম থেকে শুরু করে সর্বনিকৃষ্ট পর্যন্ত নানান বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মানুষ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আপনার সামনে উপস্থাপিত হয়। হাসান আল-বাসরি (ﷺ) বলেন, "তোমাদের আগে যারা এসেছিল তারা কুরআনকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তার সংকলন হিসাবে দেখত। তারা রাতের বেলায় এগুলো নিয়ে চিন্তা করত আর দিনের বেলায় সেগুলোকে কাজে পরিণত করত।"

সুতরাং এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, 'আমি এদের মধ্যে কোন দলটির অংশ হতে চাই? আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি?'

কুরআন আপনার সামনে ঠিক এই চ্যালেঞ্জটাই ছুঁড়ে দেয়।

রিদ্দা বা দ্বীন ত্যাগ: কারণ এবং প্রতিকার

দ্বীন ত্যাগের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরকালের জন্য জাহান্নামের অভিশপ্ত স্থানে ঠাঁই করে নেয়, যদি না সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে। দ্বীন ত্যাগ করলে ক্ষতি আর কারো নয়, ক্ষতি তার নিজের। রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সময় এমন মানুষও ছিল যারা রাসূল (ﷺ)-কে সরাসরি দেখেছে, তাঁর কথা শুনার সৌভাগ্যলাভ করেছে, তাঁর সাথে চলাফেলা করেছে, তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছে, এমনকি এদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করেছে– কিন্তু এরপরেও তাদের কেউ কেউ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং এরকম সামান্য কোনো ব্যক্তি ইসলামে থাকল কী থাকল না– তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এতে আমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না।

ইসলাম ছেড়ে চলে যাবার কারণগুলো নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করাটা বেশ কঠিন, কিছু কিছু ব্যাপার ব্যক্তিগতও বটে। কিন্তু আমি এতটুকু বলব যে– এক ধরনের শুষ্ক ইসলাম পালন করার ফলে এই পরিণতি ঘটে। এই বিশেষ ধাঁচের ইসলামচর্চায় ইবাদাত আর আত্মশুদ্ধির জন্য সময় থাকে না। মূল মনোযোগ থাকে খবর পড়ায় আর বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক করায়। ফলে, রিদ্দা বা দীনত্যাগ তারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

এই ধারার মানুষদের লেখাগুলোতে আবার চোখ বুলিয়ে দেখুন, দেখবেন আমি ঠিকই বলছি।

আমরা অনেক সময় কোনো ব্যাক্তির বিপ্লবী কথাবার্তা শুনে তাকে "ভালো দ্বীনি ভাই" ভাবা শুরু করি, তখন এমনটা হতে পারে যে আমরা তার বিদ্রোহী চেতনাকে দ্বীনের প্রতি আন্তরিক উৎসাহ ও নিষ্ঠা বলে ভুল করছি। প্রকৃতপক্ষে এমনটা হতে পারে যে ঐ ব্যক্তির জন্য ইসলাম হলো শুধুমাত্র "এই মাসের স্পেশাল অফার"।

এরকম হওয়ার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো–তার কথাবার্তা ও দ্বীনি পড়াশোনার মাঝে অন্তর কোমলকারী বিষয়সমূহের নগণ্য উপস্থিতি। কখনোই নফল ইবাদাত না করা

এবং ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হিসেবে অনুধাবন করার চেষ্টা না করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

এই ধরনের মানুষগুলোকে শুধুমাত্র বিতর্কিত এবং আমোদজনক বিষয়গুলো নিয়ে তর্কে মেতে থাকতে দেখা যায়। কারণ শুধুমাত্র স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাকি সবার চাইতে আলাদা প্রমাণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই মানুষগুলো ইসলামে প্রবেশ করে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে নয়।

তারা পুরোন কথা শুনতে আগ্রহ পায় না, সবসময় নতুন কিছুর জন্য অস্থির হয়ে থাকে। শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে এটাই তাদের ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে উঠার কারণ। এই ধরনের লক্ষণগুলো অন্য যাদের মধ্যে দেখা যায় তাদেরকে নিয়েও আমার ভয় হয়। খুব বেশি দেরী হয়ে যাবার আগেই নিজেকে রক্ষা করুন। দ্বীনের মাঝে বিতর্ক আর বিনোদন খোঁজা বন্ধ করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সম্পর্কে জানতে, তাঁর সম্পর্কে সচেতন হতে চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

কারো কারো কাছে হয়তো এটা একঘেয়ে, বিরক্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই আপনাকে রক্ষা করবে। সবসময় বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না, এবং তার বদলে প্রতিদিন চোখ বোলানোর জন্য নিচের বইগুলোকে আপনার টেবিলে স্থান দিন:

- আল কুরআন

- রিয়াদুস সালেহীন, ইমাম নববী

- আল আদাবুল মুফরাদ, আল বুখারি

- আয যুহদ, ইমাম আহমাদ

এই বইগুলো শুধুশুধু লেখা হয়নি। এই সিলেবাসটি নিয়মিত ধরে রাখার চেষ্টা করুন। এগুলো নিয়মিত পড়লে আপনার হৃদয়ের চারপাশে একটি দুর্গ গড়ে উঠবে। যখন ফিতনার আঘাত আসবে তখন এই দুর্গই আপনাকে রক্ষা করবে। এবং নিশ্চিত থাকুন আজ হোক, কাল হোক, ফিতনার এই আঘাত এক সময় আসবেই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একটি হাদীস আছে যা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য-

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব, কুতায়বা ও ইবনু হুজর আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর

বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন| সহীহ মুসলিম| অধ্যায়ঃ ১| কিতাবুল ঈমান | হাদিস নাম্বার: ২১৪)

আমরা অত্যন্ত কঠিন এক সময়ে বসবাস করছি। এই সময়ে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখা জ্বলন্ত কয়লা আঁকড়ে ধরে রাখার মতো–এরকম আরো অনেক কিছুই আমি বলতে পারি, কিন্তু এগুলো আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন।

আমাদের মূল সমস্যা হলো, আমাদের ঈমান ও দ্বীনকে দৃঢ় করার যে ধীর, ক্লান্তিকর এবং কঠিন পথটি আছে, তা আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। অথচ এই পথটিই আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে। আমাদের শক্তিশালী করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য যে পরীক্ষা রেখেছেন তাঁর জন্য আমাদের প্রস্তুত করবে।

ইসলাম প্রকৃত পুরুষদের দ্বীন। এই দ্বীন সংগ্রামের দ্বীন। অধ্যবসায়ের দ্বীন। ধৈর্যের দ্বীন। এবং পরীক্ষার দ্বীন।

আপনি অবশ্যই পরীক্ষিত হবেন–এবং একজন প্রকৃত পুরুষ মাত্রই ভালো মন্দ সকল অবস্থা নির্বিশেষে আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে। আর যারা নামকা ওয়াস্তে আল্লাহর ইবাদাত করে, তারা বিপদের প্রথম আভাস পাওয়া মাত্র চাপের মুখে নতি স্বীকার করে।

এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমাদের কারো কারো মনে আমাদের অজান্তেই এক ধরনের গোপন অহংকার কাজ করে। দৃঢ়, স্থির সংকল্প হবার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের ওপরই ভরসা করি এবং ভাবতে শুরু করি আমরা বর্তমানে 'ইলম, আকিদা, ঈমানের যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছি সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেই। আমি এরকম অসংখ্য ভাইকে দেখেছি যে, তাঁরা কখনো দ্বীন অথবা সুন্নাহ ছেড়ে দেবেন আমি তা কখনো কল্পনাও করিনি– কিন্তু তাই হয়েছে। এবং এরকম হবার মূলকারণ আমাদের এই ধরনের চিন্তাধারা।

প্রকৃত সত্য এই যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আপনাকে এই দ্বীন, এই ঈমান দান করেছেন–এবং এটাই শেষ কথা। কিন্তু যখন আপনি নিজের উপর ভরসা করা শুরু করবেন, এবং দ্বীন পালন করতে সক্ষম হবার জন্য গোপনে নিজেকে কৃতিত্ব দেওয়া শুরু করবেন–তখন আল্লাহ আপনাকে আপনার নিজের রাস্তাতেই ছেড়ে দেবেন। আর নিজের দৃঢ়তা, স্থিরসংকল্পতার জন্য যখন আপনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন–তখন শেষ পর্যন্ত তিনিও আপনার সাথে থাকবেন।

এই কারনেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সব চেয়ে বেশি যে দু'আটি করতেন তা হলো, "ইয়া মুক্বলিব্বাল ক্বুলুব, ছাব্বিত ক্বলবি 'আলা দ্বীনিক"–আল্লাহ যেন তাঁর হৃদয়কে দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখেন। ঈমানের প্রশ্নে আমরা সকলেই আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল।

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, অনেকেই আন্তরিকভাবে নিয়মিত এই দু'আ করেনি। তারা তাদের অন্তরের এই গোপন অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের কারণেই এই অবস্থায় (রিদ্দা) উপনীত হয়েছে।

এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মুরতাদের পরিবর্তে এক হাজার নও মুসলিম ইসলামে প্রবেশ করে। যেইদিন আমরা নিশ্চিত হলাম যে এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেছে, সেই একইদিনে আমি মসজিদে বসে ৫৫ বছর বয়স্ক একজন হিস্পানিক ব্যক্তিকে শাহাদাহ গ্রহণ করতে দেখেছি।

তাই মনে রাখবেন যখন কেউ মুরতাদ হয়ে যায়–তখন যা ক্ষতি হবার তার পুরোটাই তার–আমাদের না।

আমাদের কাজ হলো আমাদের হৃদয়গুলোকে দূর্গে পরিণত করা। কারণ যে বৈরী ও কষ্টকর সময়ে আমরা বসবাস করছি এবং সামনে যে ফিতনা আসছে–এটিই হলো তার মোকাবেলা করার একমাত্র উপায়।

স্মৃতিকাতরতা

অতীতকে মাথায় নিয়ে যারা বিশ্বকে দেখে, তাদের চিন্তাভাবনার ধরনই আলাদা। যদি এক কাপ কফি তাদের সামনে থাকে, তারা শুধু কফির কাপটাই দেখে না। তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে—একটি কফি গাছের চারা বড় হয়ে উঠেছে, যথেষ্ট ফল ও দানা উৎপাদন করার পর তা সংগ্রহ করে, মাড়িয়ে, শুকিয়ে, পরিশোধিত করে, খোসা ছাড়িয়ে, সেঁক দিয়ে, ঠাণ্ডা করে, পরিষ্কার করে, আর গুঁড়ো করে—তারপর এই কফির কাপ এসে হাজির!

এ কারণে, তালাক দেওয়ার সময় স্ত্রীকে দেওয়া মোহরানা যে ফিরিয়ে নেওয়া অবৈধ—এই বিধান বর্ণনা করার সময় আল্লাহ তাআলা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, অতীতে একটা সময় ছিল যখন সে তার স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়েছে (সূরাহ নিসা, ৪র্থ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

অতীতকে বিবেচনায় না আনলে অবিচার হয়ে যেতে পারে। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে ইবনু আকিল (ﷺ) লিখেছেন, "তোমার যদি মনে হয় এখনকার মানুষগুলো অনুগত, বিশ্বস্ত—তাহলে তুমি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছ। মানবজাতির নেতা রাসূল (ﷺ) আমাদের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তাঁর বার্তা যেন আমরা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেই। তাহলে তিনি কিয়ামাতের দিন আমাদের জন্য শাফাআত করবেন। আল্লাহ তাঁকে বলতে বলেছেন, 'এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে আত্মীয়তার ভালোবাসাটুকু ছাড়া আর কিছুই চাই না।' (সূরাহ শুআরা ৪২:২৩)। তিনি ছিলেন বলেই ক্ষুধার্তরা খাবার পেয়েছে, দুর্বলেরা পেয়েছে শক্তি। এরপরেও তারা তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করেছে, তাঁর বংশধরদের জেলে পুরেছে, হত্যা করেছে। তাঁর সাহাবিদের হত্যা করা হয়েছিল—উমার (ﷺ)-কে মসজিদে, উসমান (ﷺ)-কে তাঁর বাড়িতে। অথচ তাঁদের দ্বীনদারি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা আর সংযম সাধনার কোনো কমতি ছিল না। তখনই মানুষ এমন ছিল, কাজেই এখনকার মানুষগুলোও তাদের মতোই হবে।"

প্রাচীন আরবি ভাষাবিদ আল-আসমা'ই একবার বলেছিলেন, "কারো বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে চাইলে তিনটি জিনিস দেখবে: ঘরের প্রতি তার টান কেমন, ভাইদের জন্য তার আকুলতা কতো, আর অতীত জীবনের জন্য তার আফসোস আছে কি না।"

এই তিনটি জিনিসই একটি সূত্রে গাঁথা—নস্টালজিয়া বা স্মৃতিকাতরতা। আল-আসমা'ইর দেওয়া এই সংজ্ঞার মতো করেই ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে 'নস্টালজিয়া'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, "স্মৃতিকাতরতা হলো অতীত জীবন, ঘরবাড়ি, দেশ বা পরিবার-পরিজনের কাছে মানসিক বা শারীরিকভাবে ফিরে যাবার ঐকান্তিক বাসনা।" স্মৃতিকাতরতা থাকাকে আল-আসমা'ই বিশ্বস্ততা পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ধরেছেন কারণ নাগালের বাইরে যা আছে, তার শাথে বন্ধন যে ছিন্ন করতে পারে না, নাগালের মধ্যে থাকা জিনিসের প্রতিও সে সহজে বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না।

কালের পরিক্রমায় যা কিছু ক্ষয়ে যাবার কথা ছিল, স্মৃতিকাতরতা সেগুলোকে ধরে রাখে। কারাগারে দীর্ঘদিন কাটাতে কাটাতে বাইরের পৃথিবীকে রীতিমতো আলাদা একটি সৌরজগৎ মনে হতে থাকে। আবার আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের আহলুল কিতাবদের মতো সাদৃশ্য ধারণ করতে নিষেধ করেছেন, সেটা করেছেন এই কারণে যে "তাদের উপর এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে..." (সূরাহ আল-হাদীদ ৫৭:১৬)। আমেরিকার দিকেই লক্ষ্য করুন, কট্টর বিশুদ্ধতাবাদী খ্রিষ্টানদের হাতে স্থাপিত এই দেশে কালের পরিক্রমায় যা কিছুকে অপবিত্র ভাবা হতো, সেগুলোই আজ পবিত্র, আর পবিত্রতা ঢাকা পড়েছে ময়লার স্তূপে।

হুযায়ফা বিন আল-ইয়ামান (ﷺ) একবার হাতে কিছু সাদা পাথর নিলেন। তারপর আশপাশের লোকদের বললেন, "এই দ্বীন হলো এই পাথরগুলোর মতোই উজ্জ্বল।" আরেক হাতে তিনি এক মুঠি মাটি নিলেন। সেই মাটি নিয়ে পাথরগুলো ঢেকে দিলেন যতক্ষণ না সে পাথরগুলো পুরোপুরি মাটিতে ঢাকা পড়ে যায়। তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম করে বলছি! এক একটি প্রজন্ম আসবে যাবে আর তারা এই দ্বীনকে এভাবেই কবর দিতে থাকবে।" নবীজি (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর কয়েক বছর যেতে না যেতেই সাহাবিরা স্বচক্ষে এই বিচ্যুতিগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন।

❐ আবু আদ দারদা (ﷺ) বলেন, "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যদি আজ ফিরে আসতেন, তবে তিনি তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের সাথে আজকের যুগে কেবল একটিই মিল পেতেন, আর সেটি হচ্ছে সালাত।"

❐ আলী বিন আবি তালিব (ﷺ) বলেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন দশজনের মধ্যে নয়জন মানুষই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে।"

❐ আনাস বিন মালিক (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো, এটা ছাড়া আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর যুগের সাথে আমি আজ আর কোনো কিছুর মিল পাই না।"

❐ হাসান আল-বাসরি (রহি.) বলেন, "সাহাবিদের যুগের কেউ যদি আজ হাজির হতেন, তাহলে ইসলামের কোনোকিছুই দেখে চিনতে পারতেন না।" তারপর তিনি গালে হাত রেখে বলেন, "শুধু সালাত ছাড়া।" তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম! সৎকর্মশীল পূর্বসূরি (সালাফ)-দের না দেখেও, বিদআত আর দুনিয়ার দিকে আহ্বানকারীদের মাঝে থেকেও যারা এই যুগে এসব থেকে আল্লাহর হেফাজতে থাকে, যাদের অন্তর নেককার সালাফদের স্মৃতিতে কাতর থাকে, তাঁদের জীবনধারা ও পদচিহ্ন অনুসরণে ব্যস্ত থাকে, তারা বিশাল পুণ্য আদায় করে নিচ্ছে। এমনটাই হবার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ।"

❐ মাইমুন বিন মিহরান (রহি.) বলেন, "কোনো সালাফ যদি আজ হাজির হতেন, তাহলে তিনি তোমাদের কিবলামুখী হওয়া ছাড়া আর কিছুই চিনতে পারতেন না।"

❐ উম্মুদ্দারদা (রা.) বলেন, "আবু আদ দারদা একবার খুব রেগেমেগে আমার কাছে এলেন। আমি রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম! আজকের মানুষদের মাঝে আমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কিছুই চিনতে পারি না, শুধু তাদের জামাতে সালাত আদায় করা ছাড়া।"

❐ আবু হুরায়রা (রা.) একবার তিলাওয়াত করলেন, "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, আর তোমরা দলে দলে লোকদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখো..." (সূরাহ আন-নাসর ১১০:১-২)। তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম! মানুষ যেভাবে দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করেছিল, আমি আজ তাদের সেভাবেই দলে দলে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখি।"

❐ ইবনুল কাইয়্যিম (রহি.) বলেন, "ইসলাম শুরুর দিকে যতটা অপরিচিত ছিল, আজ তার চেয়েও বেশি অপরিচিত।"

এই কথাগুলোর বেশিরভাগই আজ থেকে ১৩০০ বছরেরও বেশি আগে বলা। এই প্রতিটি কথাই মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের *মুফিদুল মুস্তাফিয* কিতাবে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ইসলামের এক মুজাদ্দিদ। তাঁর জীবন কেটেছে যুগের পর যুগ আবর্জনায় ঢাকা পড়ে থাকা উজ্জ্বল শ্বেতপাথরগুলো তুলে আনতে, সেগুলো তুলে এনে তিনি বিশ্বকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর আন্দোলন পুরো নাজদ এলাকা জুড়ে একটি রাষ্ট্রের রূপ নেয়। তাঁর মৃত্যুর পর পশ্চিম দিকে তায়েফ শহর জয় করার মাধ্যমে রাষ্ট্রটি আরো বড় হয়। এর এক বছর পর তারা মক্কা দখল করে। দুই বছর পর মদীনা দখল করে। এরপর তারা উত্তর দিকে মনোনিবেশ করে এবং ইরাক ও শামে আক্রমণ শুরু করল। নাজদের কেন্দ্রে থাকা এই ইসলামি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে মিশরের উসমানী শাসক মুহাম্মাদ আলী এমন এক সেনাদল প্রেরণ করলেন, যারা ঠিকমতো সালাতও পড়তে জানত না। ঠিক দুইশ বছর আগে ১৮১৮ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে এর রাজধানী দিরইয়্যার পতন হয় মিশরীয় ও তুর্কিদের হাতে। ইসলামের স্বপ্নরাষ্ট্র পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। এই আন্দোলনের আলিম ও আমীরদের নির্যাতন করা হয়, বেয়োনেটের সাথে বেঁধে রাস্তায় গুলি করে টুকরো টুকরো করা হয়। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের তিন ছেলে আব্দুল্লাহ, আলী ও ইবরাহীমকে তাঁদের পরিবারের অনেককে সহ বন্দী করা হয়। সেখান থেকে সুদূর মিশরে নিয়ে যাবার পথে তাঁদের অনেকেই মারা যান। তাঁদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন সাউদকেও তাঁর দুই সহযোগী সহ গ্রেফতার করে আরো দূরে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের শিরশ্ছেদ করে তিনদিন জনসমক্ষে মাথা ঝুলিয়ে রাখার পর তাঁদের দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

কিন্তু মাত্র সাত বছরের মাথায় এই আন্দোলন আবারও সুসংগঠিত হয়ে ফিরে এলো এবং নাজদের বেশিরভাগ অংশ পুনর্দখল করে নিতে সক্ষম হলো। মানুষ এত অপ্রতিরোধ্য হয় কী করে? নিছক ইলমের বহরের কারণে এমনটা হয় না, কেননা কতো ইলমধারী লোকই তো আজ চাটুকার আর ইসলামের দুশমনে পরিণত হয়েছে। বরং এই অপ্রতিরোধ্যতার কারণ হলো ইসলামের প্রতি বজ্রকঠিন আনুগত্য, যেমনটা সালাফদের ছিল। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নিজেই স্পষ্ট বলেছেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আমি কোনো সুফি, ফিকহি, বা মাযহাবের দিকে ডাকছি না। ইবনুল কাইয়্যিম, আয-যাহাবি, ইবনু কাসির সহ যেসকল ইমামকে আমি প্রচণ্ড সম্মান করি, তাঁদের দিকেও ডাকছি না। আমি ডাকছি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে। আর আমি ডাকছি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহর দিকে, যা তিনি উম্মাহর শুরু ও শেষের সকলকে অনুসরণ করতে বলে গেছেন।" গোটা বিশ্ব যদি উঠেপড়ে লাগে, তবেও অতীতের সাথে এই বন্ধন ছিন্ন হবার নয়। সত্যি কথা বলতে তিনি কিন্তু *মুফিদুল মুস্তাফিয* লিখেছিলেন তাঁর আপন বিশ্বাসঘাতক ভাইয়ের জবাবে, যিনি দিরইয়্যাহতে বিদ্রোহের সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

অতীতের সে সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করুন, যে সময়টায় আপনার কাছে মনে হয়েছিল এই বন্ধন ছিঁড়ে যাবার নয়! অতীতের সেই অবস্থার সাথে আপনার এখনকার অবস্থার তুলনা করুন। হয়েছেটা কী বলুন তো! সময় পেরিয়েছে আর আপনি পাল্টেছেন। ঈমানের শিখা আপনার অন্তরে ধীরে ধীরে নিভে গেছে। ফলে চারপাশের জাহিলিয়াতে আপনি উষ্ণতা খুঁজেছেন। আপনার ভালো-মন্দের জ্ঞান পরিণত হয়েছে অর্থহীন মরীচিকায়। সেই দিনটিতে ফিরে যাওয়াকে লক্ষ্য বানান, যে দিনটি সালাফদের যুগের জন্য স্মৃতিকাতরতাময় ছিল। ইবনু রজব (রহ.) একবার লিখেছেন, "মানুষের মূল্য তার বাসনার সমান। যার বাসনা হলো দুনিয়া, তার চেয়ে সস্তা কেউ নেই। দুনিয়া তো একেই নীচ, যে একে পেতে যায় সে আরও নীচ। একজন সালাফ বলেছেন, 'হৃদয় সবসময় কিছু না কিছুর চারপাশে ভেসে বেড়ায়। কোনো হৃদয় ওড়ে আরশ ঘিরে,

কোনোটা আবর্জনা ঘিরে...' আর যার বাসনা আল্লাহ, সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। কারণ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে মহান।"

যদি আপনি আসলেই এমনটা হতে পারেন, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে আপনার মর্যাদা আরো বাড়বে। উমার বিন আব্দুল আযীয (ﷺ) খলিফা হওয়ার পর উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) এর নাতি সালিম (ﷺ) এর কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন, "উমার কীভাবে কী করতেন, তার বর্ণনা দিন যাতে আমিও একই কাজ করতে পারি।" সালিম (ﷺ) জবাব দিলেন, "আপনি যদি উমারের মতো কাজ করতে পারেন, তাহলে আপনি উমারের চেয়ে উত্তম হবেন। কারণ আপনি যে যুগে বাস করছেন, সেটা উমারের যুগ নয়। আর আপনার সমসাময়িক লোকেরা উমারের সমসাময়িক লোকদের মতো নয়।" এরপর তিনি তাঁর জামানার সব আলিমের কাছে একই অনুরোধ করলেন। সবাইই ঠিক সালিমের মতোই উত্তর দিয়েছিলেন।

এর ব্যাখ্যায় আল-কুরতুবি (ﷺ) লিখেছেন, "সময় যখন প্রতিকূল হয়, জ্ঞানী ও ধার্মিক মানুষগুলো যখন হারিয়ে যায়, পাপ ও সংশয় যখন ছড়িয়ে পড়ে, মুমিনরা যখন দুর্বল হয়, ফাসিকরা যখন সবল হয়, দ্বীন যখন তার সূচনালগ্নের মতো অপরিচিত হয়ে পড়ে, আর এই দ্বীনকে ধারণ করা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার মতো কঠিন হয়ে পড়ে—তখন উম্মাহর শেষের যুগের মানুষগুলোর ঈমান ও নেক আমল প্রথম যুগের মানুষদের ঈমান-আমলের মতো দামি হয়ে যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন বদর আর হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ। এভাবে যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে, সে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবে। আল্লাহ যাকে চান, তাকে সাহায্য করেন।"

ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ যুগে যদি উমার বিন আব্দুল আযীযকে সালিম এই কথা বলে থাকেন, তাহলে ১৩০০ বছর পরের স্মৃতিকাতরদের উদ্দেশ্যে তিনি কী বলতেন? তিনি বুঝেই উঠতে পারতেন না কী বলতে হবে। এর বদলে হয়তো তিনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করতে বসে যেতেন। ঠিক এই কাজটিই ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) করেছেন তাঁর 'কাসিদা নুনিয়্যাহ' কবিতায়:

> হে রব্ব! তারা গুরাবা তোমার সাহায্যপ্রার্থী, আর তুমি দয়ালু মেহেরবান;
>
> হে রব্ব! তারা মাযলুম তারা ছাড়া, যাদের আছে প্রচণ্ড ঈমান;
>
> সব ছেড়ে তারা করেছে তোমার সন্তুষ্টি সন্ধান
>
> দুনিয়ায় যখন তাদের ছিল এরই প্রয়োজন; তারা চেয়েছে তোমার কাছে নিরাপত্তাবিধান
>
> যা সকল সমস্যার দেয় সমাধান; তারা বেছে নিয়েছে তোমার ওহীর বিধান
>
> করেনি ভিত্তিহীন মতাদর্শের অনুসরণ;

হে রব্ব! দৃঢ় রাখো তাদের ঈমান সংশয়গ্রস্তদের যেন তারা দেখাতে পারে পথ; অস্বীকারকারীদের উপর তাদের করো বিজয়দান

যারা সত্যকে মানে ও জ্ঞানবান; আহলুস সুন্নাহর সাহায্যকারীদের ঘটাও উত্থান

যুগে যুগে তাদের কষ্টের করো অবসান; নেতা বানাও তাদের, যারা তাকওয়াবান

ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস তাদের করো দান; তোমার আদেশেই হোক তাদের পথের সন্ধান

দূর হোক মানবরচিত মিথ্যে আহ্বান; সত্যের মাধ্যমে তাদের দাও সম্মান

দাও মহাবিজয়, তুমিই তো কর্তৃত্ববান; গুনাহ্ মাফ করো তাদের, উচ্চ করো অবস্থান তুমিই তো শান্তিদাতা, মহা ক্ষমাবান; সব প্রশংসা তোমারই তরে কুরবান

যে প্রশংসা তোমায় সন্তুষ্ট করে, অফুরান অফুরান; ভরিয়ে দেয় যা জমিন ও আসমান প্রশংসা তোমার সারা কাল, সারা দিনমান; তোমার রাসূল মুহাম্মাদকে জানাই সালাম ও সম্মান

তোমার নিরঙ্কুশ সন্তুষ্টি তিনি যেন পান; আরও যেন পান তাঁর অনুসারী সাহাবি ও যুগে যুগে আগত বুজুর্গান...

আমিন

কালো জাদু

একদিন আমি এনপিআর[২০] শুনছিলাম। একটি রুটিন বক্তব্য শুনে একটি স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

অনুষ্ঠানের অতিথি ছিলেন এক মুসলিম দেশের জনৈক ঔপন্যাসিক। এক প্রশ্নের সময় উপস্থাপক কথা শুরু করলেন এভাবে, "অনেক সচেতন আমেরিকান বলাবলি করছেন যে ট্রাম্পের আড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তার কারণে অনেক মুসলিম মৌলবাদী হয়ে যাচ্ছে। নাহলে এরা আমেরিকাপন্থীই থাকত।" কথাটা শুনে এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক যে হয় আপনি প্রো-আমেরিকা হবেন (অর্থাৎ, আমেরিকানিজম বা আমেরিকার আদর্শে বিশ্বাসী হবেন), আর নয়তো আপনার কোনো সমস্যা আছে। অতিথিকে দেখে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল, কথাবার্তায় বেশ বাকপটু ছিলেন। কিন্তু তিনিও এ প্রশ্নের উত্তরে বলে দিলেন যে, যারা প্রো-আমেরিকা নয়, যারা মৌলবাদী, তাদের সংখ্যা আসলে খুবই কম, তারা "খুবই সংখ্যালঘু", বাদবাকি সবাই মডারেইট—ইত্যাদি গৎবাঁধা কথাবার্তা।

কথাবার্তাগুলো গৎবাঁধা হলেও এসব শুনে আমার মনে অন্য একটা স্মৃতি মাথা চাড়া দিল। এক যুবকের কথা মনে পড়ে গেল যার সাথে আমি অন্য একটা কারাগারে একসাথে ছিলাম। সে রোবটের মতো হাঁটাহাঁটি করত, সামনে-পিছে, প্রতিদিন-সারাদিন। গোসল ছাড়া কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দিত, কাপড়ও বদলাত না। আর প্রতিদিন সে প্রচুর চিনি খেত, অথচ তার আগে থেকেই ডায়বেটিস ছিল। যখনই আমি তাকে এসব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নসিহত করতাম, সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাত যেন আমি একটা পাগল! সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমি তাকে উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলেই জানতাম। সে পড়াশোনা করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে। এমনকি একটা স্বপ্নে একবার মাত্র শুনতে পাওয়া একটা কবিতা পাঁচ মিনিট ধরে সে আমাকে খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল। তার সাথে কয়েকবার কথাবার্তা বলে এবং কয়েকবার তার উপর কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করার পর আমি বুঝতে পারলাম যে—তার ওপর জাদুর আসর আছে। শৈশব থেকেই সে এতে আক্রান্ত।

---

[২০] National Public Radio- NPR, এটি আমেরিকার একটি রেডিও স্টেশন, এর সদরদপ্তর ওয়াশংটন ডিসিতে।

আলিমরা বলেন, যে জিনিসটির মাধ্যমে জাদু করা হয়েছে, সে জিনিসটি যতদিন অক্ষত থাকে—জাদুর প্রভাবও ততদিন চলতে থাকে। আপনি যত বুদ্ধিমানই হোন না কেন, জাদুগ্রস্ত অবস্থায় জাদু আপনার চিন্তাশক্তি ঘোলা করে দিতে পারে। আপনার যুক্তিবুদ্ধি, বিবেচনাবোধ ছিনিয়ে নিতে পারে। এনপিআর ইন্টারভিউ দেখে আমার সেই যুবকের কথা মনে পড়ে গেল। তাগুতের ব্যাপারটিও এমন। সে যুবকটি যেমন করে জাদু দ্বারা প্রভাবিত, তেমন অনেকের অন্তর এখন তাগুতের প্রতাপ দ্বারা প্রভাবিত, মোহাবিষ্ট। তাগুতের প্রতাপ যখন শেষ হয়ে যায়, জাদুও ছুটে যায়। এর অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে কুরআনে, ইতিহাসে আর বর্তমান যুগে।

কারুনের কাহিনী পড়ে দেখুন। দেখবেন মাত্র এক দিনের ব্যবধানে কীভাবে তার ব্যাপারে মানুষের ধারণা পুরোপুরি পাল্টে গেছে! আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন,

"কারুন শান-শওকতের সাথে তার সম্প্রদায়ের সামনে হাজির হলো। যারা দুনিয়ার জীবন কামনা করে, তারা বলে উঠল, 'হায়! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাদের জন্যও যদি তা হতো! সত্যই সে মহাভাগ্যবান ব্যক্তি।'

যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলল, 'ধিক তোমাদের প্রতি। আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতর তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। আর সত্যপথে অবিচল ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা প্রাপ্ত হয় না।'

অতঃপর আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম কারুনকে ও তার প্রাসাদকে। আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোনো দল ছিল না, আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারল না।

গতকাল যারা তার মর্যাদার ন্যায় কামনা করেছিল, তারা সকলে বলতে লাগল, 'হায়! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের যার জন্য ইচ্ছে রিযিক বর্ধিত করেন আর যার জন্য ইচ্ছে হ্রাস করেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তিনি আমাদেরও ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিতেন। হায়! কাফিররা সাফল্যমণ্ডিত হয় না।" (সূরাহ্ আল-ক্বাসাস ২৮:৭৯-৮২)

কাজেই যখন তাগুত কারুন 'নেই' হয়ে গেল, তখন মানুষের ওপর থেকে তার জাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে গেল, আর মানুষ তার মোহ থেকে বেরিয়ে আসলো।

এমনটা ঘটেছিল কারুনের অনেক আগেও, ইবরাহীম (ﷺ) এর জাতির সাথে। ইবরাহীম (ﷺ) তাঁর জাতির মূর্তিগুলো টুকরো টুকরো করে ফেলার পরই কেবল তাঁর লোকেরা সুদীর্ঘকালের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে সম্বিত ফিরে পায়। এমনকি "তারা বিষয়টি নিয়ে মনে মনে চিন্তা করল এবং পরস্পর বলাবলি করল, 'তোমরা নিজেরাই তো অন্যায়কারী।" (সূরাহ্ আম্বিয়া ২১:৬৪)

এমনটা ঘটেছে কারুনের অনেক পরেও। নিজের মূর্তিগুলোকে ময়লার স্তূপে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে এবং এদের সাথে একটি মরা কুকুরকে বাঁধা অবস্থায় দেখেই কেবল আমর ইবনুল জামূহ (রা.) এর বোধোদয় ঘটে। তাঁকে হিদায়াত দেওয়ার কারণে তিনি আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কবিতা রচনা করেন। কবিতার একাংশ এমন,

তিনি সেই সত্তা, যিনি বাঁচালেন আমাকেই

আমি কবরের আঁধারে বন্দী হবার আগেই।

আধুনিক ইতিহাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেই কেবল অসংখ্য মুসলিম টের পান যে, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মাঝে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা কতটা ভুল ছিল।

কিন্তু একই ভুল থেকে আজ বের হতে পারছে না অনেক মুসলিম দাবিদার, যারা আজকে ইসলাম ও আমেরিকার আদর্শের মধ্যে সমন্বয় করতে চাওয়ার সেই পুরোনো ভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তাদের ভাষায় যারা "খুবই সংখ্যালঘু", সেই মৌলবাদী সম্প্রদায় যখন তাদেরকে এ জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তখন তারা এমনভাবে তাকায় যেন এরাই হচ্ছে পাগল, এরাই ভ্রান্তির মধ্যে আছে! ওপরে যা বললাম, আলিমরা বলেন, যে জিনিসটির মাধ্যমে জাদু করা হয়েছে, তা যতদিন অক্ষত থাকে, জাদুর প্রভাবও ততদিন চলতে থাকে।

আলিমরা আরেকটি জিনিস বলেন। তা হলো, জাদুকররা নিজেরাও জানে যে, তাদের প্রভাব কেবল দুর্বল হৃদয়ের ব্যক্তির উপরই খাটে। যাদেরকে আল্লাহ ঈমান ও ইলম দিয়ে শক্তিশালী করেছেন, তাদের ওপর জাদুর প্রভাব নেই। লক্ষ্য করুন, যারা কারুনের যশ আর ধনদৌলত দেখে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তারা কারুনের জাদুর প্রভাব থেকে বের হয়েছে সত্যি, কিন্তু "যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল" তারা কখনও সেই জাদু দ্বারা প্রভাবিতই হননি। কেন? কারণ তাদের জ্ঞান ও ঈমান তাদেরকে জাদু থেকে রক্ষা করেছে। কারুনকে মাটি খেয়ে নেওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা তার পরিণতি দেখতে পাচ্ছিলেন।

"IUGULA, VERBERA, URE!"

ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী সমাজ হচ্ছে প্রাচীন রোম। এমনকি এর পতনের ১৬ শতক পরেও এর আইন, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলেই এখনো বিদ্যমান।

এই রোমান সাম্রাজ্যও গড়ে উঠেছিল "বল প্রয়োগে ধ্বংস করো"—এই মতবাদের ভিত্তিতে। প্রাচীন রোমানরা তাদের নিজেদের হাতে অন্যদের নিপীড়নের মাঝে কোনো রকম বর্বরতা দেখতে পেত না। বরং এই বর্বরতা তাদের জন্য ছিল আনন্দ ও উপভোগের উৎস! বিখ্যাত রোমান কলোসিয়ামে ৫০,০০০-এরও বেশি মানুষ একসাথে বসে নিয়মিতভাবে munus iustum atque legitumum (ল্যাটিন; ইংরেজিতে A Proper and Legitimate Gladiator Show বা একটি সুষ্ঠু ও বৈধ গ্লাডিয়েটর প্রদর্শনী) নামক একটি প্রদর্শনী উপভোগ করতে আসত। সারাদিন ধরে চলা এই "খেলা"গুলোকে তিনটি অংশে ভাগ করা হতো।

প্রথম অংশকে বলা হতো Venatio (বন্য প্রাণী শিকার বা "Wild Beast Hunt")। এটা সারা সকালজুড়ে চলত। সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে বন্য জীবজন্তুদের রণক্ষেত্রে জড়ো করা হতো, এক এক বার একসাথে কয়েকটি করে পশু ময়দানে ছাড়া হতো। তারপর কোনো অভিজ্ঞ শিকারী এগুলোকে হত্যা করত। কখনো কখনো পশুগুলোকেই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরার জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, ভালুক, সিংহ, চিতা, এমনকি উটপাখি ও সারসও এনে হত্যা করা হতো। আর এসবের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মানুষের মনোরঞ্জন। চিত্তবিনোদনের খোরাক হিসেবে গড়ে ১০, ০০০ প্রাণী প্রতিবছর এভাবে জীবন দিত।

দিনের প্রথম অংশে বন্য পশু হত্যার পর শুরু হতো দ্বিতীয় অংশ "The Ludi Meridiani" (মধ্যপ্রহরের খেলা-Midday Games)। পশুর বদলে এই পর্বে যেত মানুষের জীবন। অপরাধী বা যুদ্ধবন্দীদের দর্শকদের সামনে ময়দানে এনে ছেড়ে দেওয়া হতো। আর দর্শকরা উল্লসিত হয়ে তাদের মরতে দেখত। কখনো কখনো তাদেরকে আমৃত্যু একে অপরের সাথে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করে মরতে বাধ্য করা হতো। তবে

অধিকাংশ সময় তাদের সিংহ বা ভালুকের সাথে ময়দানে ছেড়ে দেয়া হতো। সেই সিংহ আর ভালুকগুলো তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। এই খেলাগুলোর একজন সাক্ষী ও রোমান কবি, মার্শাল এমন এক বন্দীর কথা লিখেছিলেন। সেই বন্দীকে কলোসিয়ামে এনে উল্লসিত দর্শকদের সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

শেষ অংশটা ছিল মূল আকর্ষণ: দি গ্ল্যাডিয়েটরস। দুইজন মানুষকে আনা হতো যারা ছোরা বা তরবারির (Gladiator শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Gladius থেকে, যার অর্থ তরবারি) সাহায্যে একে অপরের সাথে লড়াই করত। পরাজিত জন তার বাম হাতের তর্জনী উঁচিয়ে হার স্বীকার করে নিত। দর্শকরা তখন তার ভাগ্য নির্ধারণ করত হয় "Missus!" (বের করে দাও! (Dismissal)) কিংবা "Lugula, Verbera, Ure!" (কাটো! মারো! পুড়িয়ে দাও! (Slit his throat, beat him, and burn him)) বলে। অধিকাংশ গ্ল্যাডিয়েটররা ছিল দাস তবে রোমান ঐতিহাসিক Suetonius লিখেছেন যে, যেসব কর্মীরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকত তারা কোনো ভুল করলেও সম্রাট তাদের ময়দানে নেমে আমৃত্যু লড়তে বাধ্য করতেন।

জীবনের প্রতি তাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এইরকম পাশবিকতা আর সংজ্ঞাহীন বর্বরতা প্রাচীন রোমের নাগরিকদের আনন্দের একটি উৎস ছিল। এটি এখনো আধুনিক পশ্চিমা (আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান) সংস্কৃতির ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়। কারণ তারাও জীবনকে শুধুই একটা ভোগের বিষয় হিসেবে দেখে। তারা কোনোরকম আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ধার ধারে না। এই মানসিকতা পশ্চিমা সমাজ আজও ধরে রেখেছে। গত শতাব্দী থেকে তা প্রকাশ পায় তাদের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরতর হওয়া পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে। এই নীতির মূল বিষয়বস্তু হলো অপরের শোষণ ও অত্যাচার। আর এ দুটিই সমান গতিতে চলে।

রোমানদের উত্তরাধিকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও খুব একটা ভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশরা তাদের নব নব সংযুক্ত উপনিবেশগুলোকে কাজে লাগিয়ে এদের বসবাসকারীদের শোষণ এবং ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে নিজেদের ঠাঁটবাট বজায় রাখত। উদাহরণ হিসেবে ইন্ডিয়াকেই দেখা যাক। ব্রিটিশরা একে ছেড়ে যাবার সময় এটা অনেকটা বিবর্ণ লাশের মতো অবস্থায় ছিল। একগাদা মানুষ ও অর্থনৈতিক ধ্বংসাবশেষের বোঝায় ন্যুব্জ একটি ভূখণ্ড। এমনকি স্বাধীনতার আগমুহূর্তেও চার্চিল গান্ধীকে একজন "naked little fakir" (fakir: ফকির বলতে মুসলিম (বা ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দু) ধর্মীয় তপস্বী বোঝায় যে শুধুই দান-দক্ষিণায় চলে) বলে সম্বোধন করার ঔদ্ধত্য দেখায়। অথচ তখনও গান্ধী ইংরেজদের জেলে বন্দী ছিলেন।

পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার অন্যান্য স্থপতিদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, বেলজিয়ান, ফ্রেঞ্চ বা ইটালিয়ান—সবার সাম্রাজ্যই প্রসারিত হয়েছিল শোষণ এবং হত্যার মাধ্যমে। ক্ষমতা ধরে রাখতেও তারা একই কাজ করতে থাকে।

লিবিয়ায় প্রাচীন রোমানদের সরাসরি বংশধর ইতালির দখলদারিত্বের সময় দেশটির জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মানুষ মারা যায়। ইতালিয়ানরা গ্রামের বয়স্কদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে প্লেন আকাশে ওড়ার পর ওপর থেকে ফেলে দিত। (পরবর্তী সময়ে আমেরিকানরা ভিয়েতনাম যুদ্ধে এবং রাশিয়ানরা আফগানিস্তানে একই কাজ করেছিল)।

আমি এই কথাগুলো লিখছি ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের প্লাইমাউথ শহরে বসে। এই শহরটি কিন্তু সবসময় শুধু ইংরেজিভাষী সাদা চামড়াধারীদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

একই কথা প্রযোজ্য এই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যাকে মারটিন লুথার কিং জুনিয়র "পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে বড় কাণ্ডারী" বলে সম্বোধন করেছেন। আমেরিকা, যার যুদ্ধাস্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অনিয়মিতভাবে লাখ লাখ নিরীহ ও নিষ্পাপ মানবজীবনের অবসান ঘটিয়ে চলেছে—জাপান, ভিয়েতনাম, ইরাক, পানামা, আফগানিস্তান বা অন্য কোথাও—সবই করেছে সে তার বৈশ্বিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য (দুঃখিত, বলা উচিত স্বাধীনতা ছড়ানোর জন্য!)।

প্রাচীন রোমের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি ও নাগরিকদের চর্চিত মানসিকতার সরাসরি সম্পর্ক ছিল। কলোসিয়ামে হওয়া এই খেলাগুলো শুধুই অপরিকল্পিত বিনোদন ছিল না, প্রত্যেকটা খেলা দর্শকদের জন্য এক একটি প্রতীকী অর্থ ধারণ করত। Venatio-তে বন্য জন্তু হত্যা প্রতিনিধিত্ব করত কীভাবে রোম দূরবর্তী বন্য এলাকাসমূহ জয় করেছে; রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সংঘটিত নিষ্ঠুরতাকে LudiMeridiani-তে মানুষ হত্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। অন্যভাবে বলতে গেলে স্টেডিয়ামটা তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যেরই একটা Microcosm বা সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল। একটি যেন আর একটির দর্পণ প্রতিবিম্ব।

কেউ একজন ক'দিন আগে আমাকে লেখা এক চিঠিতে তার পর্যবেক্ষণ থেকে লিখেছিল, অন্যের ক্ষতি করে নিজের উন্নয়ন আমেরিকান সমাজের একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। স্কুলগুলোতে বুলিইং (Bullying: অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা অহেতুক নিরীহ/দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের হেনস্থা করা) এর মাত্রা, খেলাধুলার নামে বর্বরতা/নির্মমতাকে উৎসাহ প্রদান, টিভিতে রিয়েলিটি শো গুলোর মাধ্যমে মিথ্যা, প্রতারণা ও চুরিকে মহিমান্বিত করার চর্চার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকট। আইন ব্যবস্থার অসৎ প্রকৃতির দিকে তাকান যা মানুষের জীবনকে শুধু আইনের সাথে সংশ্লিষ্টদের পদোন্নতি ও ক্রমবর্ধমান আইন প্রয়োগকারী বাজেট বানানোর উপকরণে পরিণত করেছে। ওয়াল স্ট্রীটের দুর্নীতি দেখুন; ফ্রেডি ম্যাক এর মতো কত বন্ধকের দালাল নিজেদের ক্লায়েন্টদের ক্ষতি করার জন্যই বিনিয়োগ করেছে। সেনাবাহিনীর দিকে তাকান; এইতো কয়েকদিন আগে পেন্টাগন এর পরিসংখ্যানে এসেছে যে, পুরুষ সৈন্যদের দ্বারা নিজ সেনাবাহিনীরই মহিলা সৈন্য ধর্ষিত হবার ঘটনা ৩০% বৃদ্ধি

পেয়েছে। নিজেদের সহযোদ্ধাদের দ্বারাই! তারা নিজেদের সাথেই যদি এমন আচরণ করে তো আবির জানাবিদের[২১] সাথে কীরকম আচরণ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এমনকি একজনের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথেও অন্যকে আক্রমণ ও অনিষ্ট সাধন জড়িয়ে থাকে—এক একজন প্রার্থী টিভিতে বিজ্ঞাপনের পিছে কোটি কোটি ডলার খরচ করে শুধু তার প্রতিপক্ষকে লাঞ্ছিত করে প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদাহানি করার জন্য। এই যদি হয় তাদের নিজেদের মধ্যেই একে অপরের প্রতি আচরণ তাহলে চিন্তা করুন 'অন্য'দের প্রতি কেমন হবে তাদের আচরণ!

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের এই মানসিকতার প্রতি খেয়াল করুন। দেখতে পাবেন যে, উভয় ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। আর এই সাধারণ মূলনীতিটি হচ্ছে—ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য যা প্রয়োজন তা-ই করুন, যদি তা অন্যের ক্ষতি করা বোঝায় তবে তাই। প্রাচীন রোমের সেই কলোসিয়াম ছিল সমস্ত রোমান সাম্রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। আর বর্তমান যুগে তাদের উত্তরসূরীদের জন্য সতর্কবার্তা এই—যে সমাজের সর্বস্তরে এই বস্তুবাদী মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাই ছিল তাদের সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ।

[২১] আবির জানাবি এক ইরাকি কিশোরী। যাকে আমেরিকান সৈন্যরা গণধর্ষণ করে, হত্যা করে এবং লাশ পুড়িয়ে দেয়।

এক অব্যর্থ তীর

আজকে আমি *টাইম* ম্যাগাজিনের বর্তমান সংখ্যাটি হাতে পেলাম। ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'দ্যা প্রটেক্টর' শিরোনামে একটি আলোকচিত্র আছে। ছবিটির ক্যাপশানে লেখা, "১৪ই আগস্ট উত্তর কায়রোর রাবা'আ আল-আদাউয়িয়া মাসজিদের কাছে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সময় একজন আহত ব্যক্তির গায়ের উপর দিয়ে একটি মিলিটারি বুলডোজার যাওয়ার চেষ্টা করলে এক মিশরীয় নারী সেটির পথরোধ করে দাঁড়ান।" ভাষায় বর্ণনা দিয়ে এই ছবির প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। ক্যাপশানে বলা আছে যে, lightbox.time.com-এ গিয়ে ছবিটি দেখা যাবে। প্রবন্ধটি পড়ার সময় দয়া করে ছবিটি চোখের সামনে রাখুন।



এই ছবিটি সিরিয়া, ফিলিস্তিন বা ইরাকেরও হতে পারত। কিন্তু এটি আসলে মিশরের। ছবিটি দেখে আমার মিশরের অতীত ইতিহাস মনে পড়ে গেল। ইতিহাসে বিশাল স্থান জুড়ে আছে মিশরের অবদান। এই গুণগুলো এসেছে আর গিয়েছে। কিন্তু একটি রয়ে গেছে। মহান আলিম ইবনু আকিল একবার বলেছিলেন, "কোনো যুগের মানুষদের অন্তরে ইসলামের মূল্য কেমন, তা যাচাই করতে হলে মসজিদের দরজায় ভিড়ের দিকে তাকালে হবে না। হজ্জের আহ্বানে মানুষ কীভাবে সাড়া দেয়, তা দেখলেও হবে না। বরং ইসলামের শত্রুদের তারা কীভাবে মোকাবেলা করছে, সেটা দেখুন।" কায়রো, আলেক্সান্দ্রিয়া বা অন্যান্য জায়গার সড়ক ও মসজিদে সেক্যুলারিস্টরা মুসলিমদের ভয়

দেখাচ্ছে, গুলি করছে আর পুড়িয়ে মারছে। তারা এসব করছে কেবল একটিমাত্র কারণে—ইসলাম। আজ যা ঘটছে, তা মিশরের দীর্ঘ ইতিহাসে চলমান ঘটনাপ্রবাহের একটি টুকরো মাত্র। এই ইতিহাস জুড়ে রয়েছে এমন সব নারী-পুরুষের কাহিনী, যাদের জীবন ইসলামের প্রতিরক্ষা আর এর শত্রুদের মোকাবেলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। বর্তমানের আলোচনায় ইতিহাস সবসময়ই প্রাসঙ্গিক। অন্য যেকোনো সময়ের মতই আজকের সময়টিও ইতিহাস থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু মাইলফলক নিয়ে আলোচনা না করলেই নয়।

ছবিটিতে 'প্রটেক্টর' বা 'রক্ষাকারীর' ভূমিকায় আছেন এক মিশরীয় নারী, আমাদের আলোচনাও শুরু হোক সহস্র বছর আগের তেমনি আরেক মিশরীয় নারীকে দিয়ে।

❐ "হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, আমি আপনার প্রতি ও আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, তাহলে এই কাফিরকে আমার কোনো ক্ষতি করতে দেবেন না!" কথাগুলো বলেছিলেন সারাহ (ﷺ)। স্বামী ইবরাহীম (ﷺ)-এর কাছ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল মিশরের এক পৌত্তলিক রাজা। তার সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন সারাহ। সে যখনই সারাহকে ধরতে এগিয়ে আসলো, তখনই তার দেহ অচল হয়ে গেল। সে এতে এতটাই আতঙ্কিত হলো যে, সারাহ (ﷺ)-কে তো মুক্ত করে দিলই, সাথে একটি উপহারও দিয়ে দিল। উপহারটি হলো এক মিশরীয় দাসী, নাম তাঁর হাজেরা (ﷺ)। কালক্রমে হাজেরার গর্ভে জন্ম নেন ইসমাঈল (ﷺ)। ইবরাহীম (ﷺ) এই মা-ছেলেকে নিয়ে গেলেন জনশূন্য তৎকালীন মক্কায়। তাদেরকে সেখানে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে হাজেরা তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন, "আমাদের এই জনশূন্য উপত্যকায় সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ফেলে রেখে আপনি কোথায় চললেন?" তিনি জবাব না দিয়ে হেঁটে যেতে থাকেন। হাজেরা তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এ কাজ করতে কি আল্লাহ আপনাকে আদেশ দিয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" অপরিচিত, জনমানবহীন, নিজভূমি মিশর থেকে সুদূরে অবস্থিত এক জায়গায়, শিশুপুত্রকে নিয়ে একা অবস্থান করা হাজেরা এমন এক জবাব দিলেন, যা আজকের খুব কম মানুষই আন্তরিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। তিনি বললেন, "ও! তাহলে তো আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করবেন না!" অল্প কিছু সময় পরেই জিবরীল (ﷺ) হাজির হয়ে এ কথার সত্যায়ন করে বললেন, "একাকীত্বের ভয় করবেন না। এখানে আল্লাহর এক ঘর হবে, যে এই ছেলে তার পিতার সাথে মিলে নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ত্যাগ করেন না।"

সত্যিই কয়েক বছর পর ইবরাহীম (ﷺ) ফিরে এসে ছেলের সাথে মিলে কাবা নির্মাণের কাজ শুরু করলেন, যার দিকে মুখ করে আজ আমরা প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সহ সকল আদনানী আরবের আদিমাতা এই মিশরীয় নারী।

❒ কেটে যায় বেশ কিছু প্রজন্ম। তারপর এক নবী নিজেকে আবিষ্কার করলেন মিশরীয় কারাগারের অন্ধকূপে। তিনি হলেন ইউসুফ (ﷺ)। ইউসুফ (ﷺ) একদিন তাঁর কারাসঙ্গীকে স্পষ্ট, শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে শোনালেন, "যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাত অস্বীকার করে—আমি তাদের পথ ত্যাগ করেছি। আর আমি অনুসরণ করি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে। আমরা কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করার অধিকার রাখি না। এটি আমাদের উপর ও মানবজাতির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ। হে আমার কারাসঙ্গীগণ! বহুসংখ্যক মনিব উত্তম, নাকি অদ্বিতীয় ও পরাক্রমশালী আল্লাহ? তিনি ছাড়াও অন্য যেসবের উপাসনা তোমরা কর, সেগুলো তো কেবল তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি করা কিছু নাম। আল্লাহ এগুলোর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করবে না। এটিই সঠিক পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" (সূরাহ ইউসুফ ১২:৩৭-৪০)

কারাগারের ভেতরে দাওয়াতী কার্যক্রম চালানোর যে একমাত্র বর্ণনাটি কুরআনে আছে, তাতেই ইসলামের মৌলিক সব বিষয় বর্ণিত হয়ে গেল।

❒ আরো বেশ কয়েক প্রজন্ম পরের কথা। পূর্ব মিশরের সিনাই মরুভূমির পবিত্র তুয়া উপত্যকায় নিজেকে আবিষ্কার করেন আরেক নবী, মূসা (ﷺ)। আল্লাহ সরাসরি কথা বলছিলেন মূসা (ﷺ) এর সাথে। তাঁকে প্রেরণ করছিলেন সে যুগের সবচেয়ে বড় তাগুত ফিরআউনের কাছে এক মিশনে। মূসা তাঁর রবের কাছে স্বীকার করলেন যে, তিনি ভয় পাচ্ছেন (২০:৪৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে অভয় দিলেন। ফিরআউনের কাছে গিয়ে মূসা (ﷺ) আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, একেবারে তার মুখের উপর (৭:১০৩-১০৫, ২০:৪৭-৫৬, এবং ২৬:১০-২৮)। তারপর গোপনে মুসলিম জনতাকে বের করে নিয়ে গেলেন দাসত্বের শেকল থেকে ও মিশর থেকে। সাগরতীরে এসে পথ শেষ হয়ে যেতে দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে মূসাকে বলেছিল, "আমরা তো ধরা পড়ে যাবো!" (সূরা আশ-শু'আরা ২৬:৬১) সেই অতীতের ভীত মূসা আজ তাদের অভয় দিচ্ছেন, "না! বরং আমার রব নিশ্চয় আমার সাথে আছেন, তিনি আমায় পথ দেখাবেন!" বলা বাহুল্য, তাঁদের চোখের সামনে অলৌকিকভাবে সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় আর মূসা (ﷺ) তাদের নিয়ে পার হয়ে যান। ফিরআউন আর তার সেনাবাহিনী একই পথ ধরে ধাওয়া করার চেষ্টা করল। কিন্তু এর বদলে দলেবলে ডুবে গেল সোজা জাহান্নামের অতলে। সাগর পাড়ি দিয়ে মূসা অবশেষে ফিরে এলেন সেই সিনাইয়ে (কী পরিহাস! সেখানে এখন ৭০০ আমেরিকান সেনা অবস্থান করছে)।

❒ আরো কিছু প্রজন্ম গেল। হাজেরা (ﷺ) এর এক আরব বংশধর (ﷺ) তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমরা একদিন মিশর জয় করবে।" নবীজী (ﷺ)-এর একটি সহিহ হাদীসে এসেছে, "তুমি যখন সেটি জয় করবে, সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। তাদের নিরাপত্তা ও আত্মীয়তার হক রয়েছে।" এই আত্মীয়তা হলো হাজেরা (ﷺ) এর মাধ্যমে মিশরীয়দের সাথে বংশীয় বন্ধন। মিশর তখন ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের এক প্রদেশ। এক দশক পর আমর বিন আল-আস (ﷺ) মিশরকে উমার (ﷺ)-এর খিলাফতের ছায়ায় নিয়ে এলেন। জিযিয়া পরিশোধ করা হলো। আফ্রিকান ভূমিতে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হলো কায়রোর কাছে, নীল বদ্বীপে সৃষ্ট ত্রিভুজের ঠিক শীর্ষবিন্দুতে। কিছুদিনের মধ্যেই মিশর হয়ে উঠল ইসলামি জ্ঞানের শক্ত প্রাণকেন্দ্র, আলিম ও আবিদদের মিলনমেলা। ইলমের দিক দিয়ে মিশরে যিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছিলেন তিনি হলেন সাহাবি উকবাহ ইবনু আমীর (ﷺ)। মিশরীয়রা তাঁকে খুবই ভালোবাসত এবং তাঁর কাছ থেকে সুন্নাহর অনেক জ্ঞান লাভ করে। সালাফদের মধ্যকার মুজাহিদদের এক শক্ত ঘাঁটিতেও পরিণত হয় অঞ্চলটি। মহান ইমাম আল-আরাজ (সাহাবি আবু হুরায়রা (ﷺ) এর খুব ঘনিষ্ঠ সহচর) বলেন, "রিবাতের (সীমান্তপ্রহরার) জন্য শ্রেষ্ঠ উপকূল হলো আলেক্সান্দ্রিয়ার উপকূল।" সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ একবার আলেক্সান্দ্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন, "এটি আল্লাহর তূণীর, যাতে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ তীরগুলো জমিয়ে রাখেন।"

❒ আরো কয়েক প্রজন্ম পর মিশর নিজেকে আবিষ্কার করল পৌত্তলিক ফাতিমি রাজাদের খপ্পড়ে। সিরিয়া থেকে স্বয়ং সালাহউদ্দীন আইয়ুবী এগিয়ে এলেন। ফাতিমি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মিশরকে ফিরিয়ে দিলেন খিলাফতের অধীনে। মুসলিম বিশ্বের জন্য জ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে পুনরায় ফিরে এলো মিশর। যেমন- ইবনু কাসির লিখেছেন যে, সালাহউদ্দীন কায়রোতে নিজের বাসা থেকে সুদূর আলেক্সান্দ্রিয়ায় যান সেখানকার আলিমদের সান্নিধ্যলাভ ও তাঁদের সাথে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা অধ্যয়ন করার জন্য। মিশর আবারও পরিণত হয় মুজাহিদদের কেন্দ্রে। এই মিশর থেকেই সালাহউদ্দীন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে টানা সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই শুরুটা হয় হাত্তিনে ক্রুসেডার শক্তিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে (তাও আবার ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস!)। তারপর একে একে অ্যাকর, টায়ার, বৈরুত, সিদন, নাযারেথ, নাবলুস আর আশকেলন বিজিত হয় মাত্র তিন মাসের মাথায়। সবশেষে হানেন চূড়ান্ত আঘাত–৮৮ বছরের ক্রুসেডার দখলদারিত্বের পর জেরুজালেম পুনরুদ্ধার। তখন থেকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের পরাশক্তি মিশর।

❒ তিন বছর পর (১১৯০ সালে) রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট যখন তৃতীয় ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তিনি জেরুজালেম আক্রমণের আগে মিশর দখল করে মুসলিমদের শক্তি চূর্ণ করার পরিকল্পনা করলেন। পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৭) আসতে

আসতে এটিই তাদের অফিশিয়াল স্ট্র্যাটেজিতে পরিণত হয়। ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইটালিয়ান ক্রুসেডার জোটের নেতৃত্ব দিয়ে হাঙ্গেরি থেকে রাজা অ্যান্ড্রু বের হন মিশরের উদ্দেশ্যে। দিমইয়াত শহরে নেমে তারা মুসলিমদের এক বাহিনীর মুখোমুখি হয়, যারা এতটাই দুর্বল ছিল যে, ইবনু কাসির (ﷺ) বলছেন, "তারা ক্রুসেডারদের কাছে প্রস্তাব করে, যদি তারা দিমইয়াত শহরটি ছেড়ে দেয় তাহলে তারা জেরুজালেম সহ সালাহউদ্দীনের হাতে বিজিত সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চল তাদের হাতে দেবে।" ক্রুসেডাররা তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তারপর আল্লাহ চাইলেন যে, তাদের রসদ শেষ হয়ে যাবে। তাদের রসদ সরবরাহ করতে জাহাজ রওনা দিল। কিন্তু তা জলীয় সেনাবাহিনীর (নীলনদের বন্যা) কবলে পড়ে ডুবে যায়। তারপর দিমইয়াত চারদিক থেকে প্লাবিত হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা নিজ বাহিনীর উপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তারপর মুসলিমরা তাদের উপর শক্ত অবরোধ আরোপ করে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে। ফলে তারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়ে যায়।" ক্রুসেডাররা প্রথম প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে হয়তো জেরুজালেম ফিরেই পেত। কিন্তু এর বদলে তারা মিশর থেকে লাথি খেয়ে বের হয় আর খালি হাতে ইউরোপে ফেরে।

❒ ত্রিশ বছর পর (১২৪৯) ফ্রেঞ্চরা ষষ্ঠ ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে আবারও মিশরের দিকে অগ্রসর হলো। এবারও তারা দিমইয়াতে এসে দ্রুত তা দখল করে নেয়, সেইসাথে নিকটস্থ শহর আল-মানসুরাও। এবারও পাশার দান শীঘ্রই উল্টে যায়। ইবনু কাসির (ﷺ) লিখেন, "বুধবার ৩রা মুহাররাম মহান সেনাপতি তুরান শাহ্ দিমইয়াতের যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডার বাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন ও তাদের ৩০,০০০ সেনা হত্যা করেন। কেউ বলে তিনি ১ লাখ হত্যা করেছেন। তাঁরা প্রচুর পরিমাণ গনিমতও লাভ করেন আলহামদুলিল্লাহ।" এরপর তিনি এক অবাক করা তথ্য দেন, "যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেঞ্চ রাজা ও তাঁর ভাই"- এই ফ্রেঞ্চ রাজা হচ্ছেন রাজা নবম লুইস! আল-মানসুরার দার ইবনু লুকমান কারাগারে রাজা লুইস বন্দী থাকেন। তাঁর পায়ে শেকল পরানো হয়। বিশাল অংকের মুক্তিপণ পরিশোধ করতে পারার আগ পর্যন্ত তিনি বন্দী থাকেন। এর পরই কেবল তিনি মিশর থেকে বের হওয়ার অনুমতি পান। ইউরোপে ফিরে যান লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে। লুইস এই পরাজয়ে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ২০ বছর পর (১২৭০) আরেক ক্রুসেডের জন্য ফ্রান্স থেকে বের হওয়ার সময়ও এই দুঃসহ স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়। এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবতরণ করার পর তাঁর সেনাবাহিনীতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি তাতে মারা যান।

❒ মিশরের পশ্চিম প্রান্ত যখন ক্রুসেডার আক্রমণের কবলে, ঠিক সে সময়ই পূর্ব প্রান্তে ধেয়ে আসলো আরও ভয়াবহ এক হুমকি। মঙ্গোলরা তখন ছিল ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মিশনের মাঝামাঝি পর্যায়ে। আর তারা ছিল ইতিহাসের

সবচেয়ে বর্বর সেনাদল। মঙ্গোলদের এক বিশেষ যুদ্ধকৌশল ছিল 'Seige Warfare'।[২২] ইবনু কাসির (ﷺ) লিখেন, "ছেলে-বুড়ো, মুসলিম-অমুসলিম মিলিয়ে এত দেশের এত মানুষ তাদের হাতে নিহত হয়েছে, যা গুনে শেষ করা সম্ভব না। সাধারণত কোনো শহরের সকল যোদ্ধা ও পুরুষ এবং প্রচুর নারী-শিশু হত্যা করেই তারা সেখানে প্রবেশ করত। তাদের যা দরকার হতো, তা লুট করত; আর যা দরকার নেই, তা জ্বালিয়ে দিত। যেসব রেশমি কাপড় তারা সাথে করে নিয়ে যেতে পারত না, সেগুলো স্তূপ করে জমিয়ে আগুনে ভস্ম করে দিত আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখত। তারা ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলত, আর যা কিছু কোনোভাবে ধ্বংস করতে পারত না, সেসব পুড়িয়ে ফেলত। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর! তারা মসজিদ পোড়াতে সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব হয়ে থাকত। সেইসাথে অন্য এলাকা অবরোধের সময় মুসলিম বন্দীদের তারা সেনা ও মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। বন্দী যদি দক্ষ যোদ্ধা না হত, তাহলে তাকে মেরে ফেলত।"

আরেক ইতিহাসবিদ ইবনু আসির (ﷺ) মঙ্গোলদের এসব অনাচার চাক্ষুস দেখেছেন এবং এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু কাসির (ﷺ) লিখেন, "ঐ মঙ্গোলরা এমন সব কাজ করেছে, যা না অতীতে শোনা গেছে আর না বর্তমানে শোনা যায়। ভেবে দেখুন, চীনদেশের শহরতলী থেকে উঠে আসা একটি দল। বছর না পেরোতেই তাদের একটি দল আর্মেনিয়ার সীমান্তে পৌঁছে যায়, আরেক দল হামদান হয়ে ইরাক অতিক্রম করে। আল্লাহর কসম! আমাদের পরের প্রজন্মরা ইতিহাসের বইয়ে এসব কথা দেখে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তাদের এ জন্য দোষও দেওয়া যায় না। তবে তারা জেনে রাখুক যে, আমি এবং আমার সমসাময়িক ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে হুবহু একই বর্ণনা লিখে গেছি।" তিনি আরও বলেন, "আদম (ﷺ)-এর সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানবজাতি এ ধরনের বিপর্যয়ে পড়েনি বললেও অত্যুক্তি হবে না। নারী, পুরুষ, শিশু কাউকেই ছাড়ত না এই লোকগুলো। তারা গর্ভবতী নারীর পেট চিরে ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলত।"

উত্তর চীন থেকে সিরিয়ার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত দখলের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। যেমন- চেঙ্গিস খান কীভাবে তুর্কিমেনিস্তানের মার্ভ শহরে প্রবেশ করেছে তার বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, "মঙ্গোলরা তারপর চেঙ্গিস খান সহ মার্ভের দিকে রওনা হলো। আরব-অনারব মিলিয়ে প্রায় ২ লাখ সেনা এর সুরক্ষায় চারদিকে শিবির স্থাপন করে। মুসলিমরা পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যায়।" তারপর মঙ্গোলরা "পাঁচদিন যাবত শহরে অবরোধ আরোপ করে। তারা এ শহরের প্রশাসককে নিরাপত্তার মিথ্যে আশ্বাস দেয়। শহরবাসীরা বেরিয়ে এলে মঙ্গোলরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের হত্যা, লুটপাট ও নানারকম নির্যাতন করা হয়। সব মিলিয়ে এক দিনে তারা সাত লক্ষ মানুষ হত্যা করে।"

---

[২২] দীর্ঘদিন ধরে একটি শহর বা দুর্গকে অবরুদ্ধ করে রাখা যেন তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়

তিনি বর্ণনা করেন, "মানুষ তাদের ভয়ে এতটাই তটস্থ হয়ে থাকত যে, শহরের একদিক দিয়ে একজন মঙ্গোল প্রবেশ করে একশ সেনার মুখোমুখি হলে কেউই ওই একজনের মোকাবেলায় এক পা সামনে বাড়াত না। ঐ একজনই এক এক করে সবাইকে হত্যা করত আর কেউই আত্মরক্ষার্থে একটা আঙুলও তুলত না। তারপর সে একাই পুরো এলাকা লুট করত। এমনও হয়েছে, তাদের এক মহিলা পুরুষ সেজে এক বাড়িতে ঢুকে একাই সবাইকে হত্যা করেছে।"

তারা তাদের পথের সবকিছু এমনভাবে ধ্বংস করত যে, কথিত আছে ঘোড়ায় চড়ে কেউ তাদের পেছন পেছন গেলে কোনোকিছুতেই হোঁচট খেত না। আমরা জানি, এই ধ্বংসযজ্ঞ শীঘ্রই বাগদাদে গিয়ে পৌঁছে। বাগদাদের গুরুত্ব হলো এটি সেসময়কার ইসলামি খিলাফতের রাজধানী ছিল। ইবনু কাসির (ﷺ) বলেন, "বাগদাদে তারা কত মুসলিম হত্যা করেছে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে ৮ লক্ষ, কেউ বলে ১৮ লক্ষ। আবার কেউ বলে ২০ লক্ষ।" যেটাই হোক, একবার ঢোকার পর মঙ্গোলরা টানা চল্লিশ দিন যাবত হত্যাযজ্ঞ চালায়। ইবনু কাসির (ﷺ) বলেন, "ওই চল্লিশ দিন শেষে বাগদাদ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া কাউকে কোথাও হাঁটতেও দেখা গেল না। ছোট পাহাড়ের মতো মৃতদেহের স্তূপ বানানো হলো রাস্তায়। তার উপর বৃষ্টি হয়ে লাশগুলো পঁচতে শুরু করল। দুর্গন্ধে শহরের বায়ু দূষিত হয়ে গেল। ভয়ানক প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল সিরিয়া পর্যন্ত। অনেকেই এ রোগে মারা যায়।" মহান আলিম ইবনুল জাওযির ছেলে মুহিউদ্দীন ইউসুফও মারা যান। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হালাকু খানের নির্দেশে খলিফা আল-মুতাসিমের মৃত্যুদণ্ড। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো উম্মাহ হলো খলিফা-শূন্য।

মঙ্গোলরা পশ্চিমের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখতে চাইল। ফুরাত নদী পার হতে তারা সেতু নির্মাণ করল এবং সিরিয়ার আলেপ্পোতে পৌঁছে গেল। ইবনু কাসির বর্ণনা দেন, "তারা সাত দিন যাবত এতে অবরোধ বসিয়ে রাখে। তারপর এর অধিবাসীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শহর দখল করে এবং এত মানুষ হত্যা করে, যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তারা সেখানকার সম্পদ লুট করল, নারী-শিশুদের দাস বানাল, আর বাগদাদের অধিবাসীদের সাথে যা করেছিল, আলেপ্পোবাসীর সাথেও তাই করল।"

এরপর ইবনু কাসির লিখেন যে, "সাইফুদ্দীন কুতুয নামের এক ব্যক্তি একবার এক স্বপ্ন দেখেন। কুতুয বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলছেন, 'তুমি মিশরের ভূমি শাসন করবে এবং মঙ্গোলদের কোমর ভেঙে দেবে।'" কুতুয এ স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর বাল্যকালে এবং সত্যি সত্যিই বড় হয়ে তিনি মিশরের শাসক হন, আর ঠিক সে সময়টায় মঙ্গোলরা পার্শ্ববর্তী সিরিয়ায় তাণ্ডব চালাচ্ছে। তাদের পরের লক্ষ্য মিশর, তা জানতে পেরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তারা আক্রমণ করার আগেই তিনি আক্রমণ করবেন। তিনি মিশরে তাঁর সেনাবাহিনী জড়ো করে সিরিয়া

অভিমুখে রওনা হলেন মঙ্গোলদের উচিৎ শিক্ষা দিতে। শুক্রবার, ২৫শে রামাদান, সিরিয়ার আইন জালুত নামক স্থানে মঙ্গোলদের মুখোমুখি হয় কুতুযের বাহিনী। প্রচণ্ড লড়াই হয়। কুতুয এতই সাহসী ছিলেন যে, ইবনু কাসিরের বর্ণনামতে, তাঁর ঘোড়া নিহত হওয়ার পরও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অন্য সেনাপতিরা পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি অন্য কারো ঘোড়া নিলেন না কেন? শত্রুরা আপনাকে দেখতে পেলে আপনাকে মেরে ফেলত এবং আপনার কারণেই ইসলাম ধ্বংস হয়ে যেত।" তিনি জবাব দেন, "আমার ব্যাপারে বলতে হয় যে, এমনটা হলে আমি তো সোজা জান্নাতে চলে যেতাম। আর ইসলামের একজন রব আছেন, যিনি কখনোই একে পরিত্যাগ করবেন না।" ইবনু কাসিরের বর্ণনায়, কুতুয ও তাঁর সেনারা তারপর শুরু করেন "মঙ্গোলদের ধাওয়া করা। তাদের তাড়া করে আলেপ্পো নিয়ে যাওয়া হয় এবং কেউ কেউ দামেশকে পালিয়ে যায়। রবিবার, ২৭শে রামাদান সকালে আইন জালুত যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ আসে। দামেশকের মুসলিমরা মঙ্গোলদের ধাওয়া করতে থাকে। তাদের হত্যা ও বন্দী করে, নিজেদের সম্পদ পুনরুদ্ধার করে এবং বন্দীদের মুক্ত করে।" যুদ্ধ শেষ হয়, মঙ্গোলরাও সিরিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়।

মুসলিম বিশ্বে মঙ্গোল আগ্রাসনের সমাপ্তি ঘটানোর পর সাইফুদ্দীন কুতুয মিশরে ফেরত যান।

❒ পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় পর ফ্রেঞ্চরা ফিরে আসে, এবার নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে। নেপোলিয়নের থাবা থেকে মিশরকে মুক্ত করতে যারা এগিয়ে আসেন, তাঁদের একজন হলেন আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রশাসক মুহাম্মাদ কুরাইয়িম। কিন্তু তিনি একসময় ফ্রেঞ্চদের হাতে বন্দী হন। তাঁকে কায়রো নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর কাছে এত মোটা অংকের মুক্তিপণ চাওয়া হয়, যা পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়ন তাঁকে হত্যা করে।

❒ মিশর দখলে রাখার সময় নেপোলিয়ন একটি কারাগার নির্মাণ করেন। কুখ্যাত লিমান তুরাহ। মোটামুটি দেড়শ বছর পর এক কৃশকায় মধ্যবয়সী মানুষ নিজেকে এই কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে আবিষ্কার করেন। নির্যাতনকারীদের নির্যাতনের দাগ তখনও তাঁর শরীরে। মানুষটি তাঁর কারাগারে উঠে বসলেন এবং লিখতে শুরু করলেন। পরের দশকে কারাগারে বসেই তাঁর কলম থেকে যে শব্দমালা প্রবাহিত হলো, তা কংক্রিটের দেয়াল ভেদ করে বাইরের বিশ্বে বেরিয়ে এলো। দশকের পর দশক হয়ে আজ পর্যন্ত তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষটির নাম সাইয়্যিদ কুতুব। রাহিমাহুল্লাহ।

❒ আল-কুদস আল-আরাবির ১০/৯/১৪৩৪ হিজরি, শুক্রবার (৮.৬.২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ) সংখ্যায় হিবাহ যাকারিয়ার লেখা একটি প্রবন্ধ আছে। শিরোনাম "রাবেয়া স্কয়ারের নিহতদের ঘিরে হর্ষধ্বনি"। প্রবন্ধটি এভাবে শুরু হয়, "রাবেয়া চত্বর এবং আল-ঈমান মসজিদের মাঝের রাস্তাটি (যা প্রায় ৩৫০টি লাশের মর্গে পরিণত হয়েছে)

বেশি দীর্ঘ নয়। নিহতদের আপনজনেরা তাঁদের পুত্রদের লাশ সনাক্ত করতে হাঁটছেন এতে। রক্তাক্ত কাহিনীর কিছু খণ্ডাংশ তুলে ধরেছিল এই রাস্তাটি। অটোমেটিক রাইফেল সহ নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুটে আসা অ্যামিউনিশানের মাঝে ছড়িয়ে আছে সিগারেটের ফিল্টার। মসজিদ/মর্গের প্রবেশপথে পরিবারগুলো যখন জড়ো হলো, তখন সেখানে দেখা গেল নানারকম চেহারা ও নানারকম আঞ্চলিক ভাষা। মিশরের সর্বদক্ষিণ থেকে সর্ব-উত্তর পর্যন্ত সব ধরনের মানুষ এখানে। কিন্তু তাদের সবার অন্তরে একই বেদনা—প্রিয়জন হারানোর বেদনা। কারো পুত্র, কারো কন্যা, কারো ভাই, কারো স্বামী।" প্রবন্ধটিতে তারপর চারজন মুসলিমের কাহিনী বর্ণনা করা হলো, যারা সেক্যুলারিস্টদের হাতে নিহত হয়েছেন:

"...এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনী হলো উম্ম আব্দুর রহমানের কাহিনী। তিনি পুত্রের লাশ দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠে বলতে থাকেন, 'তার আগামীকাল বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার জন্য আজ আমরা আনন্দ করছি।'" প্রবন্ধে এরপর বলা হলো ছেলেটির পুরো নাম আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ আস-সাইয়্যিদ, ২২ বছরের তরুণ। পরের দিনই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তার মা বলে চললেন, "আমার ছেলে বিয়ের জন্য চুল কাটিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এত তাড়াহুড়া করছে কেন। সে জবাব দিল, 'আম্মা! আমি বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি!' তার জামা ধরে আমি যখন তার মুখ আমার দিকে ঘোরালাম, দেখলাম হুর আল-আইনের সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তুত সুন্দর এক বরের চেহারা।" তার মা আব্দুর রহমানের বর্ণনায় আরও বলেন, "সে সম্পূর্ণ কুরআনের হাফিয। রামাদানের সব সিয়াম ও শাওয়ালের ছয় সিয়ামের ইফতার করার পর সে হয় নাহদাহ নয়তো রাবেয়া স্কয়ারে যেত। আমার কাছে করা শেষ ফোনকলে সে বলেছিল, 'আব্বাকে বলবেন যে, আমি বাসার দিকে রওনা দিয়েছি। বাসায় পৌঁছে গেছি বলে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন না।'" ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার কথা জানান এভাবে, "আমার এক বান্ধবীর ছেলে আব্দুর রহমানেরও বন্ধু ছিল। সেও সেখানে নিহত হয়। ফেইসবুকে আমি তার ছেলের নিহত হওয়ার খবরটি পোস্ট করার পর দেখি মানুষ আমাকে আমার ছেলের মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছে ..."

প্রবন্ধ মোড় নেয় পরের কাহিনীতে, "সাদাসিধে কালো গ্রাম্য পোশাক পরিহিতা নারীটি হন্যে হয়ে খুঁজছেন মসজিদের মেঝেতে পড়ে থাকা লাশের সারিতে। আর গ্রাম্য স্বরে বলে চলেছেন, 'আমার ইমাদ কই? কই গেল, মানিক আমার? আমারে একা রাইখা তুমি কই গেলা?' তিনি ১৫ বছরের বালক ইমাদ হামদির মা। বাড়ি ফারাইয়্যুম প্রদেশ (কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিমে)। কয়েক ডজন লাশ এত জঘন্যভাবে পুড়ে গেছে যে,

তাদের চেনাই যাচ্ছিল না।" প্রবন্ধটিতে বলা হয়, "চিৎকার করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলেন, "হ্যায় গত এক মাস ধইরা রাবেয়াতে আছিল। অর বাপের লগে ছাড়াছাড়ি হওনের পর হ্যায়ই আমাগো পরিবারের দেহাশুনা করত। শ্যাষবার যহন ফুনে কতা কইলাম, হ্যায় কইল, 'আমার জমানি ১০০টা ট্যাকা (১০০ পাউন্ড বা ১৬ ডলার)

আছে। ওইডা আমগো ফরিবারের লাইগ্যা খরচ কইরো।'" ইমাদের মা অবশেষে বহু কষ্টে ছেলের লাশ সনাক্ত করতে সমর্থ হন। কারণ শরীরের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে গিয়েছিল। তার মা জানান যে, তার আচার-আচরণ ছিল খুবই নম্র। সে ছিল পরিবার ও অন্য সব ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন একটা ছেলে।

ফুঁপিয়ে কাদঁতে কাঁদতে ভাই মাহমুদ মুহাম্মাদ আব্বাসের তরুণী স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বোন সাউদ বলেন, "ল স্কুল থেকে ২০১১ সালে মাহমুদ গ্র্যাজুয়েশান সম্পন্ন করে। একটি রিয়েল এস্টেট ফার্মে কাজ করত সে। তার বিয়ে ছিল ঈদের দিন। কিন্তু আজ আমি তার জন্য খুশি। সে আজ হুর আল-আইনদের সাথে মিলিত হবে।" এরপর তিনি ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার ঘটনা জানান, "অন্য দিনের মতই আমি তার ফোনে কল দিলাম। ফোন ধরে একটা কণ্ঠ জবাব দিল, 'এই ফোনের মালিক শহীদ হয়ে গেছে।' মাত্র দুই ঘণ্টা আগে সে এসএমএস পাঠিয়ে জানিয়েছিল সে নিরাপদ আছে, শুধু মাথায় একটি বুলেট গেঁথে আছে।" তিনি বলে চলেন, "আমার বাবা দু মাস আগে মারা যান। কিন্তু নিজেকে ইয়াতীম মনে হচ্ছে এখন।" তিনি আরও জানান যে, রিপাবলিকান গার্ডের ঘটনাগুলোর পরই (অভ্যুত্থানের পরপর) তাঁর ভাই শহীদ হতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তাঁর কিছু বন্ধু আগের মাসে আল-মিনাসসাহতে শহীদ হওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায়। সেখানে রাবেয়া চত্বরের অনেক বিক্ষোভকারীই নিহত হয়েছিলেন।

সবশেষে প্রবন্ধটিতে আহমাদ জুমাহর কথা বলা হয়, "৩৪ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দুই কন্যার পিতা। এক মাস বয়সী হাফসা ও দুই বছর বয়সী আইশা। আগের দিক সকালে তিনি রাবেয়া চত্বরে যান। তাঁর বাবা জানান যে, ইন্টারনেটে তিনি ছেলের একটি ছবি দেখতে পান যেখানে তিনি একটি বাচ্চা মেয়েকে কোলে করে গোলাগুলি থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরেকটি ছবি গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হওয়ার পরের। কোনো ছবিতেই তাঁর লাশ বিকৃত বা দগ্ধ দেখা যায়নি। কিন্তু যখন তিনি আল-ঈমান মসজিদে ছেলের লাশ আনতে যান, তখন তার দেহ আংশিক পোড়া দেখা যায়।" প্রবন্ধটি শেষ হয় ছেলের ব্যাপারে পিতার বর্ণনা দিয়ে, "আহমাদ কখনও কারো রাগের কারণ হয়নি। আমাদের শহরে সে লাশ গোসল করানোর দায়িত্ব পালন করত।"

হাজার বছর ধরে মিশর এমন মানুষদের পরিচর্যা করে চলেছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত করে যাবে। এটি কোনো ধারণা-অনুমান নয়। *সহিহ মুসলিম*-এ কিয়ামাতের লক্ষণের বর্ণনা সম্বলিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন শেষ জামানায় ঈসা ইবনু মারইয়াম (عليه السلام) ফিরে এলে আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজ পাঠাবেন। ঈসাকে আল্লাহ বলে দেবেন ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করতে হবে, "আমি আমার এমন বান্দাদের বের করে এনেছি, যাদের বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করতে পারবে না। অতএব, আমার ইবাদাতকারীদের জড়ো করে সিনাই পর্বতে নিয়ে যাও।"

আসল রাজা

আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগে আলী বিন আল-মুওয়াফফাক তাঁর ষাটতম হজ্জ্ব সম্পন্ন করার পর বললেন, "আমি এরপর বসে বসে নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবলাম। বারবার এই জায়গাটা আমি যিয়ারত করেছি, তবু আমি জানি না, আমার হজ্জ্ব কবুল হয়েছে কি হয়নি। সে রাতে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখলাম কেউ আমাকে বললেন, 'যাদের তুমি ভালোবাসো, তাদের ছাড়া আর অন্যদের কি তুমি নিজের বাসায় দাওয়াত করো?' এরপর আমি যখন জেগে উঠলাম, আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।"

তাই বলে সব হজ্জ্বই কিন্তু কবুল হয় না!

এমন আরো একজন সালাফ হজ্জ্বের সময় স্বপ্নে দেখলেন আসমান থেকে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। তাদের একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বছর কতজন হজ্জ্ব করছে?" অপরজন জবাব দিলেন, "ছয় লক্ষ।" প্রথমজন আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এর মধ্যে কয়জনের হজ্জ্ব কবুল হয়েছে?" অপরজন জবাব দিলেন, "ছয় জনের।"

আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কিছু সময়কে (যেমন- আশুরা, রামাদান, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন) ও নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে (যেমন- মক্কা, মদীনা, বায়তুল মাকদিস) অন্যান্য সময় ও স্থানের চেয়ে পবিত্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হজ্জ্বের সময় পবিত্র সময় ও পবিত্র স্থান দুটিরই সমন্বয় ঘটে। হজ্জ্বের আলোচনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তিনি যেসব বিষয়কে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, সেগুলোকে যেন মানুষ সম্মান করে।

"আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র বিষয়সমূহকে সম্মান করলে তার রবের নিকট তা-ই তার জন্য উত্তম..." (সূরাহ আল-হজ্জ্ব ২২:৩০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আস-সা'দি (ﷺ) লিখেছেন, "আল্লাহ্ এটা ভালোবাসেন যে, আপনি তাঁর নির্ধারিত পবিত্র বিষয়গুলোকে সম্মান করবেন। এর ফলে আল্লাহ্‌র সাথে আপনার নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। যে কেউ এই বিষয়গুলোকে সম্মান করবে, তাকে আল্লাহ্ অসামান্য পুরস্কার দেবেন। আপনার দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তা বড়ই উত্তম। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত এই পবিত্র বিষয়গুলো, যেগুলোকে তিনি সম্মান করতে

বলেছেন, সেগুলো হতে পারে ইবাদাত বা অন্য যেকোনো কিছু ... এগুলোর সম্মান করার অর্থ হলো সেগুলো যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করা।"

নিজেদের অজান্তেই কত বড় সাওয়াব লাভের সুযোগ আমরা হেলায় হারাচ্ছি। এক ব্যক্তি প্রতিবছর পায়ে হেঁটে হজ্জ করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি এক রাতে বাসায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁর মা তাঁকে ডেকে একটু পানি দিতে বললেন। বিছানা থেকে উঠে এই অনুরোধ পূরণ করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি ভাবলেন, কতো সহজেই না তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ করেন (অথচ বিছানা থেকে উঠে মাকে পানি দিতে তার কতো কষ্ট হচ্ছে)। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, লোকেরা তাঁকে হজ্জ করতে দেখে এবং তাকে প্রশংসা করে বলেই হজ্জ করা তাঁর কাছে এত সহজ লাগে। তিনি বুঝতে পারলেন, হজ্জ তিনি করছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিয়ত আসলে বিশুদ্ধ নেই।

তাই সকল হাজীই আসল হাজী নন। ইবনু উমার (ﷺ) হজ্জ করার সময় তাঁর বন্ধু অবাক হয়ে বললেন, "বাহ! কতো বিপুল সংখ্যক হাজী!" ইবনু উমার জবাব দিলেন, "নাহ, বরং অল্প লোকই হাজী।" ক্বাদি শুরাইহ হজ্জ করার সময় একবার বললেন, "ভ্রমণ করছে অনেকই, কিন্তু সত্যিকারের হাজী অল্পই।"

এই শুরাইহ উমার এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা) উভয়ের শাসনামলেই কুফা অঞ্চলের বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় উম্মাহর অবস্থা আজকের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। কিন্তু শুরাইহ তার সময়ের হাজীদেরকে সেভাবেই চিহ্নিত করেছেন যেভাবে নবীজি (ﷺ) আজকে আমাদেরকে চিহ্নিত করেছেন– মূল্যহীন হিসেবে। একটি সহিহ হাদিসে এসেছে নবীজি (ﷺ) বলেছেন, "বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে তোমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে বড় গামলা ঘিরে মানুষ খাবার জন্য জড়ো হয়...সেসময় তোমরা সংখ্যায় হবে অনেক। কিন্তু তোমরা হবে প্রবল স্রোতে ভাসমান গুসা'র মতো। তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে মাহাবাহ দূর করে দেওয়া হবে আর তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা স্থাপন করা হবে..."

আল্লাহর রাসূল যে 'গুসা'র সাথে আমাদের তুলনা দিয়েছেন সে গুসা'র অর্থ হলো "তুচ্ছ আবর্জনা", "গাছের ডালের টুকরা, বর্জ্য ও ময়লা" এবং "মরা পাতা ও জলস্রোতে তৈরি হওয়া আবর্জনার মিশ্রণ।" যে মাহাবাহ আমরা শত্রুদের অন্তরে আর তৈরি করতে পারি না, সেই মাহাবাহ এর অর্থ হলো "ভয়, আতঙ্ক, শিহরণ, সমীহ, সম্মান, ভীতি"। উম্মাহ যখন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকত, তখনই নবীজি (ﷺ) মাহাবাহ সঞ্চারিত করতে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়ে যেতেন, অথচ আমরা উল্টোটা করি। কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

❒ উহুদের ময়দানে মুসলিমরা পরাজিত হওয়ার পর তিনি সাহাবিদের নিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করেন যারা একটু আগে মুসলিমদের পরাজিত করেছে।

এ অভিযানে গুরুতর আহত সাহাবিরাও অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের একজন বর্ণনা করেন, "আমার ভাই এবং আমি উহুদে অংশ নিয়েছিলাম। আমরা উভয়েই আহত অবস্থায় ফিরে এলাম। যখন আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে শত্রুকে ধাওয়া করার ঘোষণা আসলো, আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে একটি অভিযানের সুযোগ হেলায় হারাব নাকি?' আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের তো বাহনও নেই, তার উপর আহত হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আমার ক্ষত তুলনামূলক কম ছিল, তাই আমি আমার ভাইকে কিছু রাস্তা বহন করলাম। মুসলিমরা যেখানে শিবির স্থাপন করল, সেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা হাঁটলাম।" হামরা আল-আসাদ নামের এই জায়গাটি মদীনা থেকে প্রায় আট মাইল বাইরে। তাঁরা মুশরিকদের ভয় দেখাতে সেখানে পাঁচশটি আগুন জ্বালিয়ে তিন দিন অবস্থান করলেন। পরিকল্পনা আসলেই কাজে দিল। আবু সুফিয়ান মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে মক্কা ফিরে গেলেন। ইবনু ইসহাক লিখেছেন, "তাঁর (ﷺ) বের হওয়ার একমাত্র কারণ হলো শত্রুদের ভয় দেখানো, তাদের জানান দেওয়া যে মুসলিমরা দুর্বল হয়নি..."

❒ তিন বছর পর হাজারো সাহাবিকে নেতৃত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমরাহ করতে মক্কা গেলেন। কিন্তু কুফফাররা তাঁদের হুদায়বিয়াহ অঞ্চলে আটকে দিল, মক্কায় ঢুকতে দিল না। তারা তাঁদেরকে পরের বছর সর্বোচ্চ তিন দিনের জন্য আসতে দিতে রাজি হলো। যখন সেই দিন এলো, তখন কুফফাররা ঠাট্টা করে বলতে লাগল যে, মুসলিমদের গায়ে তওয়াফ করার মতো শক্তিটুকুও নেই। নবীজি (ﷺ) তাদের একটা কথাও বললেন না। এর বদলে তিনি সাহাবিগণকে নিয়ে প্রথম তিন চক্কর জোরে জোরে হাঁটলেন। কাছেই একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে কাবার দিকে লক্ষ রাখা কুফফাররা ভীত চোখে তা দেখে একে অপরকে বলল, "তোমরা বলছ এই লোকেরা জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়েছে? এরা তো অমুক-তমুকের চেয়েও শক্তিশালী।" ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) ব্যাখ্যা করেন, "মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি দেখানোর জন্যই আল্লাহ্‌র রাসূল জোরে জোরে হেঁটেছেন।" এই জোরে জোরে হাঁটা, যা 'রামাল' হিসেবে পরিচিত, তা আজও তাওয়াফের একটি অংশ।

সামষ্টিকভাবে মাহাবাহ তৈরি করার উদাহরণ এমন অনেকই আছে। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে মাহাবাহ গড়ে তোলার এই চর্চা লালন করেছিলেন। মাহাবাহ নষ্ট হয় – এমন যেকোনো কাজ তারা পরিহার করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। ইবনুল জাওযি (رحمه الله) লিখেছেন, "আলিমের উচিৎ না সাধারণ মানুষের সামনে ঢিলেঢালা ভাব দেখানো... গাধায় চড়ে দুই পাশে পা ঝুলিয়ে রেখে উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) যখন শামে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন তখন আবু উবাইদাহ (رضي الله عنه) এ বিষয়টিই (মাহাবাহ) ভাবছিলেন। তিনি উমারকে বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আপনার সাথে দেখা করবে!"

কত চমৎকার একটা বিষয় তিনি চিন্তা করলেন! কিন্তু উমার তাঁকে আসল কথা মনে করিয়ে দিলেন, "আল্লাহ্ আমাদের ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আপনি অন্য কোথাও সম্মান অন্বেষণ করলে তিনি আপনাকে অসম্মানিত করবেন।" অর্থাৎ, উমার (ﷺ) বোঝাতে চেয়েছেন যে, দ্বীনের মাধ্যমেই মর্যাদা অন্বেষণ করতে হয়। বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদের ভিত্তিতে নয়, যদিও আমরা সেটা অবশ্যই বিবেচনায় রাখব।"

আপনাকে দেখে মানুষ কী ভাবছে, এর ওপর সালাফরা গুরুত্ব দিতেন, যেমন:

❐ উমার (ﷺ) নিজেই বলেছেন, "পৌরুষের অংশ হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা।" ইবনু কাসির লিখেছেন যে, ইবনু আব্বাস ছিলেন "সুদর্শন, সুন্দর পোশাক পরতেন আর প্রচুর আতর ব্যবহার করতেন।" কাযি ইয়াদ লিখেছেন যে, ইমাম মালিক "আদান থেকে ভালো কাপড় এনে পরতেন, খোরাসানি কাপড় পরতেন, মিশর থেকে আনা মিহি সাদা পোশাক পরতেন এবং ভালো সুগন্ধী মাখতেন।"

❐ উমার (ﷺ) আরো বলেছেন, "যে বেশি বেশি হাসে, তাকে বোকা ভাবা হয় এবং সে তার সমীহ হারিয়ে ফেলে।" একজন সালাফ বলেছেন, "আমরা হাসাহাসি ও কৌতুক করতাম। কিন্তু মানুষ যখন আমাকে অনুকরণীয় হিসেবে দেখতে শুরু করল, তখন থেকে আমি এ ধরনের আচরণ শোভনীয় মনে করলাম না।"

❐ ইবনু আকিল (ﷺ) লিখেছেন, "শর'ঈ উপলক্ষ ছাড়া অন্য কোনো খাওয়ার দাওয়াতে ছুটে যাওয়াটা পৌরুষসম্পন্ন ও নীতিবান লোকদের জন্য শোভা পায় না। কারণ এটি খারাপ দেখা যায় এবং মানুষের অন্তর থেকে সমীহ দূর করে দেয়।" তাঁর পর ইবনুল জাওযি লিখেছেন, "দাওয়াত কবুল করলে কেবল খাওয়ার জন্যই কবুল করবেন না। বরং সুন্নাহ অনুসরণ করা ও মুমিন ভাইকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে করবেন..."

❐ আলী ইবনু আবি তালিব (ﷺ) বলেছেন, "কারো খাবার দেখে 'খাবো-খাবো' করাটা পুরুষের জন্য দৃষ্টিকটু।" তাই কখনও কোথাও খাবারের দাওয়াত পেলে তিনি যাবার আগে হালকা করে খেয়ে ক্ষুধা কিছুটা নষ্ট করে নিতেন। ইবনু তাইমিয়্যাও এমনটা করতেন বলে জানা যায়। আর ইমাম মালিক তো কারো সামনে পানাহার করাটাই পরিহার করতেন।

❐ ইবনুল জাওযি (ﷺ) লিখেছেন, "অতিথি হিসেবে ভদ্রতা হলো নির্দিষ্ট কোনো খাবারের কথা না বলা। যদি আপনার দুই পদের খাবারের মধ্য থেকে একটি বেছে

নেওয়ার সুযোগ থাকে, তাহলে মেজবানের জন্য যেটা সহজ সেটা বেছে নেবেন। তবে যদি জানা থাকে যে, অন্যটা নিলে মেজবান বেশি খুশি হবেন এবং তিনি সেটা পরিবেশন করতে সক্ষম, তাহলে ভিন্ন কথা।" আর তিনি অতিথিদের উপদেশ দিয়েছেন যেখান থেকে খাবার পরিবেশন করা হয়, সেদিকে বারবার না তাকাতে। কারণ তা পেটুকবৃত্তির লক্ষণ।

❒ ইমাম মালিক (ﷺ) বলেছেন, "আমি কখনও কোনো নির্বোধ লোকের সাথে বসিনি।" এর একটি কারণ হলো, মানুষ আপনাকে যার সাথে দেখে, আপনাকেও তার মতোই ধরে নেয়। আল-আসমা'ই একবার বলেছেন, "আদি বিন সাবিতের কবিতার চেয়ে অন্য কোনো কবিতাকে আমি সুন্নাহর এত নিকটবর্তী পাইনি:

'ব্যক্তির বদলে তার বন্ধুর জেনে নাও পরিচয়,
কারণ শেষমেশ সবাই তার বন্ধুর মতোই হয়।"

❒ ইবনুল জাওযি (ﷺ)-এর জীবনের ব্যাপারে লিখতে গিয়ে ইবনু কাসির লিখেন, "বালক বয়সে তিনি ছিলেন ধার্মিক, স্বল্পভাষী, সামাজিকতা এড়িয়ে চলতেন। হালাল হওয়া নিয়ে সন্দেহ আছে, এমন খাবার তিনি খেতেন না। তিনি কেবল জুমার সালাতের জন্য ঘর থেকে বেরোতেন এবং অন্য ছেলেপেলেদের সাথে খেলাধুলা পরিহার করতেন।" বড় হয়ে ইবনুল জাওযি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, "বেশি বেশি যার দেখা পাওয়া যায়, লোকে তার ব্যাপারে উঁচু ধারণা রাখতে অভ্যস্ত নয়। আর তারা তার কথার দামও দেয় না।"

❒ আবু মূসা আল-মাদিনি (ﷺ) এতই মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন যে, তিনি কখনোই অন্য কারো থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। কেউ কেউ তাঁর জন্য টাকা রেখে যেত, কিন্তু তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিতেন। তিনি নিজের জন্য সামান্য যা উপার্জন করতেন সেটা থেকে নিজের জন্য ব্যয় করতেন। ইবনুল জাওযি (ﷺ) লিখেছেন, "দ্বীনদার ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একজন আলিমের উচিৎ মিতব্যয়ী হওয়া, স্বল্প আয় করা ও অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া। এতে তাঁর দ্বীন ও সম্মান রক্ষা পাবে এবং নীচু মানুষদের কাছ থেকে দান-খয়রাত গ্রহণ করা থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী থাকবেন।" মানসুর বিন আল-মুতামির বলেছেন, "কেউ যখন আমাকে পানি পান করতে দেয়, আমার মনে হয় যেন আমার পাঁজরের একটি হাড় সে ভেঙে দিল।" জাহিলী যুগেও এমন কিছু মানুষ ছিল, যারা দারিদ্র্যে নিপতিত হলে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার বদলে পাহাড়ে পালিয়ে যেত এবং সেখানেই মারা যেত।"

এই মানুষগুলোকে অন্যেরা মাহাবাহ (সমীহ) করত, তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পবিত্র বিষয়গুলোকে মাহাবাহ (সমীহ) করতেন।

উমার (রা.)-এর হত্যার কয়েক দশক পর মসজিদে নববীতে ঠিক তাঁর সেই জায়গায় অধিষ্ঠিত হন ইমাম মালিক। তিনি বলেন, "হারুনুর রশীদ আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন তাঁকে পড়ানোর জন্য তাঁর কাছে যেতে। আমি জবাব দিলাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনাকে জ্ঞানের কাছে আসতে হবে। জ্ঞান আপনার কাছে যাবে না।' তাই তিনি সফর করে আমার বাড়িতে এলেন এবং একটি দেয়ালের মুখোমুখি হয়ে আমার পাশে বসলেন। আমি বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন, জ্ঞানকে সম্মান করা আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।' তখন তিনি উঠে এসে আমার সামনে বসলেন।"

এই হলো সেই হারুনুর রশীদ, আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে যার হাতের মুঠিতে এনে দিয়েছিলেন। যার খিলাফত ছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। যিনি কন্সটান্টিনোপলে রোমানদের পদানত করেছিলেন। যার ব্যাপারে আত-তাবারি লিখেছেন যে, তাঁর বিভিন্ন প্রাসাদে বসবাসকারী দাসী, স্ত্রী এবং দাসের সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে প্রায় চার হাজার। যার ব্যাপারে ইবনুল জাওযি লিখেছেন, "তিনি অন্য যেকোনো খলিফার চেয়ে বেশি সম্পদ রেখে গেছেন। প্রাসাদ ও ভূমির কথা তো বাদ। শুধু তাঁর দামী রত্ন, আসবাব ও বাসন-কোসনের মূল্যমান ছিলো ১০০,০৩৫,০০০ দিনার।" অথচ এত কিছু থাকার পরেও এই মানুষটিই ইমাম মালিকের প্রতি মাহাবাহ বোধ করতেন। অথচ ইমাম মালিকের অস্ত্র ছিল কেবল তাঁর শর'ঈ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের প্রতি তাঁর নিজের মাহাবাহ।

রাক্কা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হারুনের পিতা খলিফা আল-মাহদি। হারুন নিজে যখন খলিফা হলেন তখন তিনি এই শহরের উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করলেন। হারুন একবার রাক্কা শহরে থাকাকালীন আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) সেখানে আসেন। আল্লাহ্‌র দ্বীনের খেদমতে ইবনু মুবারকের অবদানের সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর থেকে ছয় শতাব্দী পরে আসা আয-যাহাবি। তিনি লিখেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালোবাসি। আমি তাঁর প্রতি এই ভালোবাসার কারণে কল্যাণ আশা করি। কারণ আল্লাহ্‌ তাঁকে তাকওয়া, ইবাদাতের প্রতি অনুরাগ, ইখলাস, জিহাদ, অবারিত জ্ঞান, রিযিক, পৌরুষ ও প্রশংসনীয় গুণাবলি দিয়েছেন।" এছাড়াও তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁর এক কবিতার কিছু চরণ এরকম:

"খলিফার অবদান না থাকলে পথগুলো হতো অনিরাপদ
দুর্বলদের শিকার করে হত্যা করতো শক্তিশালী শ্বাপদ।"

এগুলো কেবল কথার কথা নয়। ইবনু মুবারককে কখনও কখনও পায়ে হেঁটে বা পশুর পিঠে চড়ে ২,৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হতো রোমানদের মোকাবেলা করার জন্য। তাঁর একজন শিক্ষক সুফিয়ান আস-সাওরির তাঁর প্রতি এমন মাহাবাহ ছিল যে, তিনি বলেছেন, "আমার পুরো জীবনে মাত্র একটি বছরের জন্য আমি

ইবনু মুবারকের মতো হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি তিন দিনের জন্যও তাঁর মতো থাকতে পারিনি।"

তাই ইবনু মুবারক যখন রাক্কায় আসলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আগমনের খবর পেয়ে সব ছেড়েছুঁড়ে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য সবাই দৌড়ে গেল। মানুষের ছোটাছুটিতে ধূলা উড়ে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল। খলিফা হারুনুর রশীদের এক প্রাসাদের মিনার থেকে তাঁরই এক দাসী নিচে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখল। সে বলল, "মানুষের হয়েছেটা কী? কে এই লোক?" তাকে বলা হলো কে এই লোক। সে বললো, "আল্লাহ্‌র কসম! আসল রাজা তো ইনিই ..."

কুরআন এবং আপনি
(পর্ব ১-২৫)

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০১)

সূরাহ বাক্কারার শুরুতে মুত্তাকীদের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন "আল গায়েব" অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের উপর তাদের বিশ্বাসকে। এই বিশ্বাসের সাধারণ ধারণাটির বাইরেও একজন মুসলিমের জীবনে এর আরও কিছু কার্যকরী তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথমত, হে মুওয়াহিদ—আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা এই জন্যে বিশ্বাস করেন না যে, তা জনপ্রিয়, সহজলভ্য, আকর্ষণীয় কিংবা আরামদায়ক। আপনি আশেপাশের মানুষগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল, গ্রহণীয়-বর্জনীয় এসবের মানদণ্ড নির্ধারণ করেন না। বস্তুতঃ এইসব পারিপার্শ্বিক ব্যাপারগুলো আপনার কাছে অর্থহীন। যদি এই পৃথিবীর ছয়শ কোটি মানুষ কোনো কিছুতে বিশ্বাস করে, সেটা আপনার বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। বরং মাস না যেতেই পাল্টে যাওয়ার প্রবণতায় নিমজ্জিত নিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি হলো এক অপরিবর্তনীয় জগৎ। সেই জগতের ঠিক আর ভুলের মানদণ্ড কখনো বদলায় না। সেই জগৎ অপার্থিব সুখ আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। জান্নাত আর জাহান্নামের। ফেরেশতা আর শয়তানের অদেখা সেই জগতে ভালো-খারাপ আর সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে এবং শেষ সময় পর্যন্ত এমনই থাকবে। এই শাশ্বত মানদণ্ডের নথিপত্র, আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই-না-দেখা জগৎ থেকে। এই নথিপত্র তার মানদন্ড নির্ধারণে মানুষ কী মনে করে, তাদের কাছে নন্দিত বা নিন্দিত হওয়া কিংবা দুনিয়ার পরিবর্তনশীল ধারার গতিপ্রকৃতির মতো অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলোকে মোটেই আমলে নেয় না।

আমার ভাই ও বোনেরা, এই জন্যই কুরআনে বর্ণিত তাওহীদের মানদণ্ডকে আঁকড়ে ধরতে পেরে আপনি নিজেকে সবচেয়ে সফল মনে করেন। এই যুগেও সেই আদর্শের আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর বাহক হতে পারাটাকে আপনি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য করেন। আর এই আদর্শই আপনাকে তাগুতের সাথে আপস করা অথবা তাগুতের সামনে মাথা নত করাকে এই পৃথিবীর হীনতম অপমান হিসেবে চিনতে শেখায়। আপনার হৃদয় জনপ্রিয়তা আর বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের পরোয়া না করেই এই আদর্শের উপর অটুট থাকে। কেন? কারণ আপনি যে আদর্শের উপর চলেন তা এমন এক জগৎ থেকে আগত যেখানে মূল্যবোধ কখনো পরিবর্তিত হয় না। তাই গায়েব তথা অদৃশ্য জগতের উপর বিশ্বাস আপনাকে সেই অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডের মতোই

দৃঢ়পদ রাখবে। রাতারাতি ধর্মত্যাগ করা যে সমাজে আধুনিকতায় পরিণত হয়েছে, আজকের সেই সমাজে সূরাহ বাক্বারার এই আয়াতগুলো যেন আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

গায়েবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলিমকে সাহসী করে তোলে। সত্যকে সমুন্নত রাখতে সে যেকোনো ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সেই দু'আ-

"হে আল্লাহ্! এই ক্ষুদ্র দল যদি আজ পরাজিত হয় তবে এই দুনিয়ায় আপনার ইবাদাত করার আর কেউ থাকবে না।"

ভেবে দেখুন সেই দিন মুসলিমদের বিপক্ষে প্রতিকূলতা এত তীব্র ছিল, ব্যর্থতা আর বিলুপ্তির শঙ্কা এত বেশি ছিল যে—ইসলাম চিরতরে মুছে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এসব কিছু শুধু তাঁদের সংকল্পকেই আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। অতঃপর তাঁরা নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হয়েছিল। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, কী তাঁদেরকে এতটা ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? কী তাঁদের মনে সাহস সঞ্চার করেছিল? কীভাবে তাঁদের অন্তর এতটা দৃঢ়তা লাভ করেছিল? আপনি অনুধাবন করবেন যে, এই পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সম্পর্কে তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁরা জানতেন যে গায়েবের জগৎ থেকে এমন শক্তি উন্মোচিত হতে পারে এবং হবে যা মানুষের পক্ষে কখনো কল্পনা করাও সম্ভব না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেই শক্তির মাধ্যমে সাহায্য কখন আসবে তা তারা নির্দিষ্টভাবে না জানলেও তারা এটা জানতেন যে, তা আসবেই। আর তা এসেছিলও। হেবা দাবাগ (Heba Dabbagh) তার 'Just Five Minutes' গ্রন্থে (পৃ: ৪৮-৪৯) তার মায়ের কারাবন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কারাগারে ওনাকে ওনার ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। হেবার মা এর উত্তরে বলেছিলেন: "আমি কেবল এতটুকু জানি যে, আমি তাকে ঘর থেকে মসজিদ আর মসজিদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার অভ্যাস করিয়ে বড় করেছি।" পরবর্তীতে কারাকর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "একে নির্যাতন করার ব্যবস্থা কর।" হেবার মা জবাবে বলেন যে, "কী আশ্চর্য! আমি তোমার মা'র বয়েসী আর তুমি আমাকে মারতে চাও!" এরপর ওনাকে একাকী বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। তখন তিনি অকারণে তাকে আটকে রাখার ব্যাপারে কারাগারের ওয়ার্ডেনের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "আমাকে কাগজ–কলম দিন। আমি এই পুরো ডিভিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।" অফিসার উত্তরে বলে, "এটার অনুমতি নেই। আপনার অভিযোগ কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছবে না। আর এটা আইনের পরিপন্থী।" পরে হেবার মা বলেন, "তবে আমি একমাত্র আল্লাহ্'র কাছে আমার অভিযোগ তুলে ধরব। তিনিই সর্বোত্তম বিচারক। আল্লাহ্ চান তো একদিন তুমি আমার অবস্থানে থাকবে কিন্তু আমার মতো ধৈর্য তোমার থাকবে না।"

বোন হেবা পরে উল্লেখ করেন যে, "একমাস বা দুইমাস পর আমরা সেই অফিসারের মৃত্যু সংবাদ পাই। সে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। গাড়ির স্টিয়ারিং তার পেটে ঢুকে গিয়েছিল।"

সুতরাং, অনুধাবন করুন যে, অদৃশ্য জগৎ আমাদের এই দৃশ্যমান পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর বিপরীত কখনও হয় না। এই বিশ্বাস আপনাকে আরও দৃঢ়পদ করে তুলবে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ আপনি এর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী সত্তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এই বাস্তবতায় আমাদেরকে শতভাগ বিশ্বাসী হতে হবে।

গায়েবে বিশ্বাসী হিসাবে আপনি আপাতদৃষ্ট যেকোনো ক্ষতিকে গ্রহণ করতে সক্ষম। বরং ক্ষতিটাকে আপনি প্রাপ্তি বলে মনে করেন। আপনার লাভ ক্ষতির হিসাব আপনার আশেপাশের মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা লাভ ক্ষতির হিসাব করে টাকা আর সুস্থতার মুদ্রায়। আর আপনি লাভ ক্ষতি পরিমাপ করেন দৃঢ়তা আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আপনি যতক্ষণ আপনার নীতির প্রতি সৎ থাকছেন আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সবগুলো শর্ত যথাযথভাবে পালন করছেন, ততক্ষণ আসলে আপনার ক্ষতি বলতে কিছুই নেই। নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা আর শরীয়াহ্ লঙ্ঘনই আপনার নিকট সবচেয়ে বড় ক্ষতি। বাহ্যিকভাবে উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য পরাজয় মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা যে একটি বিজয় ছিল সে বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) তার 'যাদুল-মাআদ' গ্রন্থে প্রায় আট পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ আলোচনা করেছেন। মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে চান, তাদের উচিত এই লেখাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা। আমরা যদি গায়েবের আদর্শের মানদণ্ড আমাদের লাভ–ক্ষতি নির্ধারণ করি তবে এই দুনিয়ার কোনো ক্ষতিই আর আমাদের কাছে ক্ষতি বলে মনে হবে না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন। আমাদের ধর্মকে আক্রমণ করা হবে, আমরা জেলে বন্দী হব, আমাদের ভূমি আক্রান্ত হবে, লুট করা হবে। কিন্তু এসব আমাদের পরাজিত করতে পারে না কারণ এসবই এই দুনিয়ার লেনদেন। কিন্তু সেই অদৃশ্য জগতে আমাদের পুরস্কারের খতিয়ান প্রস্তুতি, জান্নাতে আমাদের জন্য নির্মাণাধীন প্রাসাদসহ অন্যান্য কর্মচাঞ্চল্য জয়-পরাজয়ের এক ভিন্ন চিত্র অংকন করে।

এই চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন আমাদের বোন আফিয়া সিদ্দিকীর মা। বোন আফিয়া সিদ্দিকী বছরের পর বছর এমন মানুষদের কাছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যারা নারী অধিকার নিয়ে আমাদের দিনরাত বক্তৃতা দেয়। তাকে প্রথমে অপহরণ করা হয়। পরে আমেরিকার গোপন কারাগারে আটকে রাখা হয়। সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়। তার প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রমাণগুলোকে তার সাথেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আশায় তাকে তলপেটে দুইবার

গুলি করা হয়। আরও অনেক অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছেন আমাদের এই বোন। আর সবশেষে তার বিরুদ্ধে এমন এক অবাস্তব অভিযোগ আনা হয় যা তার শারীরিক অবস্থার আলোকে চরম হাস্যকর। এই নারীর প্রতি চালানো নির্যাতন আমাদের হৃদয়ের অনুভূতিগুলোকে নির্বাক করে দেয়। এতদসত্ত্বেও তার সাহসী মায়ের চিন্তাধারা গায়েবের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের এক নিখুঁত উদাহরণ। আর এই বিশ্বাসই তাকে আপাতদৃষ্টির এই দুরবস্থাকে বিজয় হিসাবে গ্রহণ করার শক্তি যুগিয়েছে। তিনি তার কন্যার প্রতি আনীত অভিযোগ শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এইভাবে:

"এতদিন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। বিছানা থেকে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার মেয়ের বিচারের রায় শুনে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। যদি বিচারকরা মনে করে থাকে যে আফিয়ার পরিবারের জন্য আজকের দিনটি একটি অন্ধকার দিন, তার মা রায় শুনে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তবে তারা জেনে রাখুক আজকের চেয়ে খুশির দিন আমার জীবনে আর আসেনি। আল্লাহ্ এক আফিয়ার পরিবর্তে আজ আমাকে হাজারটা পুত্র সন্তান দিয়েছেন যারা প্রতিদিন আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার দরজায় অপেক্ষা করে।"

সবশেষে তিনি বলেন: "একজন মুমিনের লক্ষণ এটাই যে সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করে না। যেইদিন আমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কোনো সৃষ্ট জীব অথবা বস্তুর করুণা ভিক্ষা করব, সেইদিন আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"

এটাই লাভ-ক্ষতির প্রকৃত অর্থ। আর এটা গায়েবের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি এই নশ্বর স্পৃশ্য জগতের উপর নির্ভর করে না। তাই গায়েবের উপর বিশ্বাস মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনে অত্যন্ত গভীর আর শক্তিশালী তাৎপর্য বহন করে।

শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০২)

সূরাহ্ বাক্বারার ২১-২২ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

"হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী (ধর্মভীরু) হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করেছেন।"

আপনি এই আয়াতগুলো থেকে যে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন তা হলো, আপনার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে দ্রুত তা শক্তিশালী করার উপায় হলো দুটো জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করা—আপনি এবং আপনার চারপাশ। বেশি নয়, প্রতিদিন কেবল ১৫ মিনিট মনোযোগ দিয়ে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবুন। আপনি দেখবেন আপনার দিনের বাকিটা আল্লাহ্‌র কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে করতে কেটে যাবে।

অতিক্ষুদ্র একটি শুক্রাণু আর একটি ডিম্বাণুর সম্মিলনে আমার আপনার এত বড় দেহ গঠিত হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র বস্তু থেকে আমাদের হাড়, শিরা-উপশিরা, রক্ত-কণিকা, মাংস, ত্বক ইত্যাদি অস্তিত্ব লাভ করেছে। দেহের ভিতরের অথবা বাইরের প্রত্যেকটি অঙ্গের স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রত্যেকের আলাদা আকৃতি, মাপ আর অবস্থান রয়েছে।

যেমন আপনার দেহের কংকালের কথাই ভাবুন। এটি শক্ত হাড় দিয়ে গঠিত যার উৎপত্তিস্থল ছিল সেই জমাট বাধা শুক্রাণু। আর দেখুন কীভাবে এটি এখন আপনার দেহের ভারবহন করে আছে। এর প্রত্যেকটি হাড়ের গঠন ও কাজ আলাদা। এদের কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট। কোনোটি লম্বা, কোনোটি আবার খাটো। কিছু হাড় গোল, কিছু আছে ফাঁপা। কিছু চওড়া, আবার কতগুলি সরু। কোনোটি ভারী আবার কিছু আছে হালকা। চিন্তা করুন যদি আপনার কংকাল কেবল একটি একক হাড় দ্বারা গঠিত হতো তবে আপনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। তার বদলে কয়েকশ হাড়ের সুসংগঠিত সমষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ আপনার এই কংকাল বানিয়েছেন। এর প্রত্যেকটি হাড় একটি সূক্ষ্ম সংযোগের মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে লেগে আছে। আর আপনার চলাফেরায় প্রতিটি হাড় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করছে।

আপনি আপনার দেহের শত শত পেশীগুলোর কথাই একবার ভাবুন। এর প্রত্যেকটিতে আছে মাংস, শিরা-উপশিরা আর পেশীবন্ধ। এদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। এদের রয়েছে নির্দিষ্ট কাজ। দুই ডজনেরও বেশি পেশী কেবল চোখের পাতা খোলা আর বন্ধের কাজে নিয়োজিত আছে। যদি এর থেকে একটিও পেশী কম থাকত তবে আমরা আর কখনও আমাদের চোখের পাতা খুলতে পারতাম না। তেমনি দেহের প্রত্যেকটি পেশী কোনো না কোনোও অঙ্গের ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোনো একটি পেশীর অনুপস্থিতি হয়তো সেই অঙ্গটাকেই অকেজো করে ফেলত। চোখের পাতা তো একটি বিস্ময়, কী নিঁখুতভাবে এটিকে বসানো হয়েছে আর তা আমাদের চোখকে ময়লা আর অতিরিক্ত আলো থেকে রক্ষা করছে।

চোখের কথাই ভেবে দেখুন—রেটিনা, ফোভিয়া-সেন্ট্রালিস, অপটিক নার্ভ, স্ক্লেরা, ভিট্রিয়াস হিউমার, লেন্স, আইরিস এবং কর্নিয়া নিয়ে আমদের একটি চোখ গঠিত। এসব কিছু একসাথে কাজ করছে বিধায় আপনি এই লেখাগুলো পড়তে পারছেন, আকাশ দেখছেন, তারা উপভোগ করছেন, মেঘ, রঙ, গাছপালা, প্রাণীজগৎ আরও কত কী সুন্দরভাবে দেখতে পারছেন। আর এই সবকিছুই হচ্ছে আমাদের চিন্তা আর চেষ্টা ছাড়াই।

আপনার কানের কথাও ভেবে দেখুন। কীভাবে এটিকে সুচারুরূপে নকশা করা হয়েছে। যে কোনো আওয়াজ এসে আপনার কানের ছিদ্রে প্রবেশ করলে আপনার কানের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর আপনি তা স্পষ্ট শুনতে পান।

জিহ্বার প্রতি খেয়াল করুন, একটি পেশী যা আপনার চিন্তা ও অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে সাহায্য করে। দেখুন কী সুশৃঙ্খলভাবে আপনার দাঁতগুলো একটি আরেকটির পাশে বসে আপনার মুখের সৌন্দর্যবর্ধন করছে। এই দাঁতগুলোর কোনোটি কামড় দেয়, কোনোটি চিবোয়, কোনোটি আবার গুড়ো করে। প্রত্যেকটি দাঁতেরও ভিন্ন ভিন্ন কাজ এবং উদ্দেশ্য ভাগ করে দেওয়া আছে। আপনার ঠোঁট আপনার মুখকে আটকে রাখে, একে রঙ দান করে আর আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণে সহায়তা করে। আল্লাহ্ আপনার স্বরযন্ত্রকে এমন ভাবে বানিয়েছেন যে আপনার কণ্ঠ নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দ সেই ধ্বনি বহন করে যা দুনিয়াতে অনন্য। আর কারও সাথেই তা মিলে না। শ্রোতা শুনামাত্রই বুঝতে পারে সে কার কথা শুনছে। এসবের মাঝে আছে এক জটিল ও দীর্ঘ পদ্ধতি আর বিস্ময় যা এখানে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না।

আপনার হাতের দিকে মনোনিবেশ করুন আর ভাবুন কীভাবে এটি কাজ করে। আপনার হাতের তালু, পাঁচটি আঙ্গুল যাদের চারটি একদিকে আর একটি অন্য দিকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্য দিকে হওয়াতে এটি সব আঙ্গুলে স্পর্শ করতে পারে। অন্য আর কোনো উপায়ে বানালে হাত আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারতাম না।

কল্পনা করুন যদি পাঁচটি আঙ্গুল একই পাশে থাকত! তবে আপনার পক্ষে একটি বাক্যও লেখা সম্ভবপর হতো না।

তারপর আপনার নখের মতো তুচ্ছ একটি জিনিসের দিকে নজর দিন। এটি আপনার আঙ্গুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আপনাকে অনেক কিছু ধরতে সহায়তা করে যা আপনি অন্যভাবে ধরতে পারতেন না। এত সামান্য একটি জিনিস নখ যা হয়ত আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে না। অথচ এটি না থাকলে হয়তো আপনি অসহায় হয়ে পড়তেন।

এসব অত্যাশ্চর্য বস্তুর সমন্বয়ে আপনার দেহ গঠিত হয়েছে। অথচ এর মূলে ছিল কেবল একবিন্দু আণুবীক্ষণিক জমাট বাধা তরলকণা। এসব মিলেই আপনি। আর আপনি এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মাঝে একজন মাত্র। আর মানুষ এই পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতির জীবের মাঝে একটি মাত্র। আর এই পৃথিবী সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণরত গ্রহের মাঝে একটি মাত্র! আর সূর্য শত কোটি ছায়াপথের মাঝে একটিতে অবস্থিত নগণ্য এক নক্ষত্র মাত্র! আর বিস্ময়কর এই বিশ্বজগতের তারকাদের অনন্যতার সারাংশ তুলে ধরাও বিশাল এক কঠিন কাজ। এসব কিছু উদ্দেশ্যহীন, দৈবক্রমে সংঘটিত কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা হতে পারে না।

এসব কিছুই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্'র প্রয়াসহীন সৃষ্টি। সূরাহ বাক্বারার এই দুইটি আয়াতে আল্লাহ্ আমাদেরকে দুইটি ব্যাপারে চিন্তা করতে বলেছেন:

১) নিজেদের নিয়ে এবং

২) নিজেদের চারপাশ নিয়ে।

এতে করে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে আমাদের মন নিবিষ্ট হবে।

"হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (ধর্মভীরু) হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন।"

সুতরাং যখন নিজের মধ্যে ঈমান-আমলে দুর্বলতা অনুভূত হবে, ইবাদাতে শক্তি ও মিষ্টতা পাবেন না, তখন নিজের দেহের কথা ভাবুন অথবা কোনো এ্যানাটমি বই খুলে দেখুন, মহাকশের ছবি দেখে ভাবুন অথবা চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করুন।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৩)

সূরাহ বাক্বারা আয়াত ৬১, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

"(স্মরণ করো) যখন তোমরা বললে, হে মূসা! (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর) ধৈর্যধারণ করতে পারি না, তুমি আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেন যা জমিন থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, গম, ভুট্টা, ডাল। তিনি বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্র পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ (ধরনের) জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা অন্য কোনো শহরে নেমে যাও, সেখানে তোমরা যা কামনা করছ তা পাবে, (আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অমান্য করার ফলে) শেষ পর্যন্ত অপমান ও দারিদ্র্য তাদের ওপর ছেয়ে গেল; ..."

কোন গোষ্ঠী বা জাতি দীর্ঘদিন যাবৎ অন্যায়-অবিচার এর শিকার হতে হতে একসময় সেই অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর এই পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হয় তবে এই হীনম্মন্যতার গ্লানি তাদের অন্তরকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ফিরআউনের অত্যাচার এবং অনাচার বনী ইসরাইলের মন-মননকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং তাদের চরিত্রে দাসত্বের বীজ বপন করেছিল। আল্লাহ্ মূসা (ﷺ)-কে বনী ইসরাইলদের রক্ষা করে মিশর থেকে বের করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে দাসত্বের লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া এবং সম্মানিত ও গৌরবময় এক জাতিতে পরিণত করা। কিন্তু মিশর ত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পরই তারা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা মূসা (ﷺ)-কে দোষারোপ করতে লাগল। এক্সোডাস ১৬:৩ এ আছে যে, তারা মূসা (ﷺ) এবং হারুন (ﷺ) কে বলেছিল,

"হায়! যদি আমরা কেবল মিশরে আমাদের প্রভুর হাতে নিহত হতে সম্মত হতাম, সেখানে আমরা মাংসের পাত্রের পাশে বসে থাকতাম আর ইচ্ছামতো রুটি খেতে পারতাম; কিন্তু তোমরা আমাদেরকে এই বিরান এলাকায় এনে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছ"।

একটা বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পরও এরকম একটি অবস্থায় তারা আরও নানা রকম খাদ্য উপকরণ চেয়ে আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করছিল!

সেই কথাই সূরাহ বাক্বারার এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে। মিশরে কঠিন দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও কেবল এইসব দুনিয়াবী ভোগের সামগ্রীর জন্য তারা সেই অতীত জীবনের কথা ভেবে আক্ষেপ করছিল! এছাড়াও যখন মূসা (ﷺ) আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলতে কয়েকদিনের জন্য তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, তখন তারা তাদের কাছে সঞ্চিত ফিরআউনের অলংকারগুলো দিয়ে স্বর্ণের বাছুর নির্মাণ করে তার ইবাদাত করা আরম্ভ করে দেয়! তাদের মনে তাদের মিথ্যে প্রভুদের ভক্তি এতটাই তীব্র ছিল যে, তারা আক্ষরিক অর্থেই সেই প্রভুদের দাসে পরিণত হয়েছিল।

অর্থাৎ বাহ্যত মুক্ত হলেও বনী ইসরাইল জাতি হীনম্মন্যতা ও মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। আর এই দাসত্ব এমন মারাত্মক পর্যায়ের ছিল যে, যখন তাদেরকে প্রতিশ্রুত জেরুযালেমে প্রবেশ করতে বলা হলো তখন তারা উত্তরে মূসা (ﷺ) কে বলে বসে, "তুমি আর তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।" তাদের আত্মসম্মানবোধ বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

যে ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা জাতি দীর্ঘদিন ধরে অবিচার, অন্যায় আর পরাজয়ের শিকার হয়ে আসছে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রথম পদক্ষেপ হলো তাদের মধ্যে মুক্ত, স্বাধীন এবং মর্যাদাভিত্তিক গুণাবলি আর মানসিকতার উন্মেষ ঘটানো, যেটাকে আমরা বলে থাকি "হার-না-মানা-মানসিকতা"। দ্বিতীয় ধাপে আসবে জ্ঞান অর্জন, এ ধাপে সাহসী ব্যক্তিত্বের মাঝে শরীয়াহর জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে হবে এবং তারপরের ধাপে আসবে সে জ্ঞানের প্রয়োগ। অজ্ঞতা এবং বিপথগামীতাই কেবল আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। আজ আমরা অনেক দাঈ আর ইমামদের দেখি যারা অনেক শিক্ষিত এবং সুন্নাহর উপর অনেক জ্ঞান রাখেন, অথচ তাদের মাঝে কি যেন একটা নেই।

একজন মানুষ যে আদর্শ বা বিশ্বাসই গ্রহণ করুক বা সে অনুসারে জীবনযাপন করুক না কেন, তার পক্ষে বিস্ময়কর কিছু করে দেখানো সম্ভব হয় তখনই, যখন সে শারীরিক ও মানসিক উভয় বলয়ে মুক্ত আর স্বাধীন থাকে। আমাদের এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতেই সফলতা আসে। সুতরাং বনী ইসরাইলের জন্য এবং অনুরূপভাবে আমাদের জন্যও প্রথম লক্ষ্য—জ্ঞানার্জন অথবা ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়া নয়। বরং আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। নিজের মর্যাদা অনুধাবন করা। নিজেদেরকে মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। ইসলামের মাঝে জীবন খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্মণ মূলত এগুলোই—দুর্বলতা আর হীনম্মন্যতা হটিয়ে শৌর্যের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মসম্মানবোধকে জাগ্রত করা। অন্যথায় আমরা শুধুই চলমান লাশ।

অতএব আমাদের প্রথম সমস্যা এবং তার প্রথম সমাধান হওয়া উচিত এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে। (প্রাতিষ্ঠানিক) অজ্ঞতা, গৌণ বিষয়ে বিচ্যুতি, ঐক্যের অভাব ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহর বড় বড় সমস্যা ঠিকই কিন্তু মৌলিক সমস্যা নয়।

আমাদেরকে অবশ্যই একেবারে প্রাথমিক, সার্বজনীন ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো থেকে আরম্ভ করতে হবে। নতুবা সত্যিকারের দাওয়াহ কার্যক্রম এবং মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশিদূর যেতে পারব না। বনী ইসরাইলের মানুষেরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত, ইবাদাত করত। কিন্তু মানসিকভাবে তারা তাদের পুরাতন প্রভুদের গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই স্বাধীন জীবনের সম্মানজনক ক্ষুৎপিপাসার চেয়ে অপমানজনক দাসত্বের সাথে আসা উচ্ছিষ্ট ভালো খাবারকেই তারা শ্রেয় মনে করা শুরু করে।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৪)

সূরাহ বাক্বারার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

"অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে এবং বলে এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ–যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।"

পৃথিবীর অনেক ধর্মের ঐশী বাণীই মানুষ কাঁটাছেড়া করে বিকৃত করেছে। এটি একটি চিরাচরিত ঘটনা এবং ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই ঘটে আসছে। আর এর ফলে ধর্মের ভাবমূর্তিতে ব্যাপক ধ্বস নেমেছে, রটেছে দুর্নাম। পশ্চিমে ধর্মীয় চিন্তাধারা আর বিজ্ঞানের মাঝে যে প্রকট দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃতিপূজারি রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে চতুর্থ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত একত্ববাদের শিক্ষা দ্বারা পৌত্তলিক রোমানদের প্রভাবিত করার পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্ম নিজেই পৌত্তলিকদের রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন রোমান সম্রাট হিসেবে কন্সটানটাইন, খ্রিষ্টান আর রোমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মিশ্রিত করে এক শংকর ভাবধারার প্রচলন করে। ফলাফল, আজকের বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম। এই বিকৃত খ্রিষ্টধর্মই পুরো ইউরোপ জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। পুরো মধ্যযুগ ধরে "খ্রিষ্টধর্মের" এই রূপের আড়ালে ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। এর ফলে বাইবেলের ব্যাখ্যায় পোপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয় এবং সে হিসেবে পোপ হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খ্রিষ্টধর্মের কিতাবের বাণী নয়, বরং পোপের ব্যাখ্যাই ছিল সমস্ত ধর্মীয়, বৈষয়িক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস।

ফলে, ১৫শ' শতকের দিকে, ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। এই "প্রোটেস্ট" বা প্রতিবাদের মূল আপত্তি ছিল ত্রিতত্ত্ববাদ(trinity), পাপ স্বীকার(confession) ইত্যাদি ধারণা। এগুলো প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মের অংশ নয়। মার্টিন লুথার, কেলভিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যে সংস্কার নীতিমালা প্রস্তাব করেন তাতে তৎকালীন প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের অনেক রীতিনীতির বিরোধিতা করা হয়। ঐশ্বরিক বাণীর ব্যাখ্যায় পোপের একচেটিয়া আধিপত্যের উপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। আরও কিছু বিষয় যেমন ত্রিতত্ত্ববাদ বা ট্রিনিটি (trinity)কেও বাতিল ঘোষণা করা হয়।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৪)

সূরাহ্ বাক্বারার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

"অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে এবং বলে এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ–যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।"

পৃথিবীর অনেক ধর্মের ঐশী বাণীই মানুষ কাঁটাছেড়া করে বিকৃত করেছে। এটি একটি চিরাচরিত ঘটনা এবং ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই ঘটে আসছে। আর এর ফলে ধর্মের ভাবমূর্তিতে ব্যাপক ধ্বস নেমেছে, রটেছে দুর্নাম। পশ্চিমে ধর্মীয় চিন্তাধারা আর বিজ্ঞানের মাঝে যে প্রকট দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃতিপূজারি রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে চতুর্থ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত একত্ববাদের শিক্ষা দ্বারা পৌত্তলিক রোমানদের প্রভাবিত করার পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্ম নিজেই পৌত্তলিকদের রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন রোমান সম্রাট হিসেবে কন্সটানটাইন, খ্রিষ্টান আর রোমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মিশ্রিত করে এক শংকর ভাবধারার প্রচলন করে। ফলাফল, আজকের বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম। এই বিকৃত খ্রিষ্টধর্মই পুরো ইউরোপ জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। পুরো মধ্যযুগ ধরে "খ্রিষ্টধর্মের" এই রূপের আড়ালে ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। এর ফলে বাইবেলের ব্যাখ্যায় পোপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয় এবং সে হিসেবে পোপ হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খ্রিষ্টধর্মের কিতাবের বাণী নয়, বরং পোপের ব্যাখ্যাই ছিল সমস্ত ধর্মীয়, বৈষয়িক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস।

ফলে, ১৫শ' শতকের দিকে, ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। এই "প্রোটেস্ট" বা প্রতিবাদের মূল আপত্তি ছিল ত্রিতত্ত্ববাদ(trinity), পাপ স্বীকার(confession) ইত্যাদি ধারণা। এগুলো প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মের অংশ নয়। মার্টিন লুথার, কেলভিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যে সংস্কার নীতিমালা প্রস্তাব করেন তাতে তৎকালীন প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের অনেক রীতিনীতির বিরোধিতা করা হয়। ঐশ্বরিক বাণীর ব্যাখ্যায় পোপের একচেটিয়া আধিপত্যের উপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। আরও কিছু বিষয় যেমন ত্রিতত্ত্ববাদ বা ট্রিনিটি (trinity)কেও বাতিল ঘোষণা করা হয়।

এই ত্রিতত্ত্ববাদ রাসূল ঈসা (ﷺ) এর আনীত শিক্ষার পরিপন্থী। এই পর্যায়েই রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে ভিন্ন মতাদর্শী নতুন আরেক ভাবধারার খ্রিষ্টান চার্চের আবির্ভাব হয়। যার নাম "প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ" (ইংরেজি 'protest' শব্দ থেকে উদ্ভূত)। এটি ছিল যিশুর (ঈসা (ﷺ)) প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত করার প্রাথমিক পরিণাম।

এ ঘটনার দু'শ বছর পর আমরা দেখতে পাই যে, চার্চের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া, বানোয়াট, ভ্রান্ত আর ভ্রমাত্মক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে। ক্যাথলিক চার্চ তার শিক্ষার সাথে বিরোধপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে সহিংসভাবে দমন করতে চেষ্টা করে। এইসব কিছুই করা হতো ধর্মের দোহাই দিয়ে। বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়াদিতে চার্চের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলায় সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের চার্চের তোপের মুখে পড়তে হয়। বাড়তে থাকে চার্চ এবং বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক সংঘাত। এই নভেম্বরে (২০১০) লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৩৫০ বছর পূর্ণ হলো। প্রায় বারোজনের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীরা এক হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়নের কৃতিত্ব এদেরকে দেওয়া হয়। পশ্চিমা বিশ্বে এরাই বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা বের করা, পরস্পরের গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা(peer review) আর পরিকল্পিত বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। আজ পশ্চিমা বিশ্ব এটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে কৃতিত্ব দিয়ে থাকে। খেয়াল করার ব্যাপার হলো, এই উদ্যোগকে চার্চের প্রচলিত শিক্ষার প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এটাকে ব্যাপক পরিসরে "ধর্মের" বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা গেল চার্চের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে চলেছে। এর মূল কারণ ছিল, বস্তুজগৎ সম্পর্কে চার্চের ভিত্তিহীন বিচার বিশ্লেষণ এবং সে বিচার-বিশ্লেষণ চাপানোর লক্ষ্যে তাদের অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ। ঈসা (ﷺ) আনীত বিশুদ্ধ তাওহীদবাদী শিক্ষাকে নষ্ট করে ফেলার কারণেই ঘটনা এতদূর গড়িয়েছিল। এতে করে ইউরোপের দার্শনিক সমাজে ধর্ম একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মানুষ ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করল। অথচ পূর্বে যুক্তি ছিল ধর্মের অধীন আর চার্চের কর্তৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। এ অবস্থায় জ্ঞানের উৎস আর পথনির্দেশিকা হিসেবে যুক্তি আর বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা সর্বাধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে। রাষ্ট্রনীতি, আইন, শিষ্টাচার এমনকি ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবেও মানুষ ধর্মের বদলে যুক্তিকে বেছে নেয়। এইসব "জ্ঞান" মূলত ছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রতিফলন। এই যুগ ইতিহাসে আলোকপ্রাপ্তির যুগ, মানবতার যুগ, দেবত্বের যুগ নামে পরিচিত। হ্যাঁ, দেবত্বের যুগ এইজন্য যে দার্শনিকরা "বুদ্ধি" আর "যুক্তি" কে ঈশ্বরের সমকক্ষ বা তার চেয়েও বড় মনে করত। তাদের কাছে ঈশ্বর ছিলেন এক বহিরাগত সত্তা। এই দুনিয়ার কার্যকলাপের ব্যাপারে তার কোনো অধিকার বা যোগসূত্রও নেই। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যে, সকল আধিপত্য

"মেধা"র এবং একমাত্র মেধাশক্তির। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মকে কর্তৃত্বের আসন থেকে হটানো। চার্চের দূষিত শিক্ষার ফলে ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জীবনের যে বেহাল দশা হয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই তারা এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ভাবধারার নতুন বিবর্তন ঘটে। এই পর্যায়ে এসে এক শ্রেণির মানুষ মনে করল যে ধর্মকে জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করার চেষ্টায় "আলোকপ্রাপ্তির যুগ (Age of enlightenment)" যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। খেয়াল করুন, এর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা কখনো ধর্মকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল যুক্তি এবং বাস্তবসম্মত জ্ঞানের আলোকে ধর্মসহ অন্য সকল জ্ঞান বিচার করা হবে। কিন্তু নব উদ্ভাবিত এই চিন্তাধারা অনুভব করা যায় না এমন সকল কিছুকে অস্বীকার করল। যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব মেনে নিতে তারা রাজী নয়। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ধর্মকে কেবল নির্বাসিতই করা হলো না বরং একে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা শুরু হলো। মানুষের স্বভাবগত বুদ্ধিবৃত্তি, সহজাত যুক্তি এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকল। সেখানে জায়গা করে নিল প্রকৃতিগত আর জৈবিক প্রবৃত্তি। নব উদ্ভাবিত এই বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী, যা বাহ্যত দেখা যায় না তার সবই ধোঁকা। কার্যত, এই সময়কালেই বিজ্ঞানকে প্রকাশ্যভাবে ধর্মের (মূলত, ক্যাথলিক চার্চ) বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবারো মনে করিয়ে দেই, চার্চ কর্তৃক ধর্মের বিকৃতি সাধন, নতুন তত্ত্ব সংযোজন এবং এগুলোকে ইউরোপের মানুষের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ফলেই এমনটি হয়েছিল। ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকার কারণে ডারউইন আল্লাহ্কে মানুষ সৃষ্টির কৃতিত্ব দিতে অস্বীকার করেছিল। আমার মনে পড়ে, কলেজে আমাদের "সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব" বিষয়টি পড়ানো হয়। সেই ক্লাসে আমি জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম যে, বানর থেকে মানুষে রূপান্তর কখন কীভাবে হয়েছিল সে ব্যাপারে ডারউইন কোনোরকম তত্ত্ব দাঁড় করায়নি। বরং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল চার্চের বিরোধিতা করা।

১৬৩৬ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে, খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছিল। আর আজকে যদি কেউ গুরুত্বসহকারে ধর্মশিক্ষার ক্লাস করতে চায় তবে তাকে অনেক দূর হেঁটে নির্জন আর আলাদা একটা ধর্মীয় স্কুলে যেতে হয়। অথচ দু'শ বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত এর মূলমন্ত্র ছিল 'Christ et Ecclesiae' (যিশু এবং গীর্জার উদ্দেশ্যে)। ১৮৪৩ সালে এই মূলমন্ত্র পরিবর্তন করে রাখা হয় 'Veritas' (সত্য)।

এভাবেই ধর্মের (বিশেষভাবে পশ্চিমা ধ্যানধারণায়) সাথে বিজ্ঞানের ব্যবধান আর সংঘাত বাড়তে থাকে। এসবই ছিল চার্চ কর্তৃক কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্ম বিকৃতির প্রত্যক্ষ ফল।

অতএব, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি শেষ অবতীর্ণ আসমানী কিতাব কুরআনকে অপরিবর্তনীয় রেখেছেন। উপরন্তু, বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত বিষয়াবলী আর ইসলামের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৫)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে সূরাহ বাকারায় বলেন,

"অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" (২:৮৫)

এই আয়াতে বনী ইসরাইলের একটি ঐতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কখনোই তাদের গোত্রের বা সমাজের মানুষকে ভুলে যায় না।

ইউশা ইবনু নুন (ﷺ) এর মৃত্যুর পরে বনী ইসরাইলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রকে আক্রমণ করতে থাকে এবং নিজ ভূমি থেকে তাড়িয়ে বহিঃশত্রুর হাতে নিজেদের ভাইদের তুলে দিতে থাকে। এরপরও তাদের মধ্যে একটি গুণ তখনও বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো তাদের গোত্রের কেউ বন্দী হলে তারা তাকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত হয়ে যেত। যদিওবা তারা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে এসব শুরুর পেছনে দায়ী! আজকেও আপনারা তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন। যখনই কোনো ইসরাইলি সৈন্যকে বন্দী করা হয় তখনই তারা তাকে উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে গোটা ইসরাইলি বাহিনীর লেবানন আক্রমণের পেছনে অজুহাত ছিল গুটিকয়েক ইসরাইলি সৈন্যকে মুক্ত করা। এমনকি ইসরাইলিরা যখন হামাসের সাথে প্রায়ই বন্দী বিনিময় করে তখন বন্দী বিনিময়ের অনুপাতটি বেশ চমকপ্রদ। যেমন- দশ হাজার প্যালেস্টাইনীর বিনিময়ে মাত্র তিন জন ইসরাইলি সৈন্য! এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যটি বনী ইসরাইল আজও ধরে রেখেছে। শত্রুর হাতে পতন আসন্ন হয়ে পড়লেও তারা যেকোনো মূল্যে তাদের বন্দী ভাইকে মুক্ত করার চেষ্টা করে।

প্রথম যুগের মুসলিমরা তাঁদের বন্দী মুসলিম ভাইদের উদ্ধারের ব্যাপারে ঠিক এমনই যত্নশীল ছিলেন। উমার ইবনু আবদুল আযীয (ﷺ) মুক্তিপণের অঙ্কের ব্যাপারে পরোয়া না করেই মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল ইমাম আল আওযা'ই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে আবু জাফর আল মানসুরকে নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিতেন যেন রোমানদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের যেভাবেই হোক উদ্ধার করা হয়। মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (ﷺ) ছিলেন নিবেদিত এক অক্লান্ত প্রাণ। চিঠি লিখে, সমঝোতা করে, যুদ্ধ করে হলেও তিনি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। আল হাজ্জাজ ও আল মুতাসিমের মতো অত্যাচারী মুসলিম শাসকরাও কুফফারদের কারাগারে বন্দী এক-দুইজন মুসলিমকে উদ্ধার করতে সমগ্র শহরে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আল মানসুর বিন আবু আমির ঘোড়ার পিঠে চড়ে কর্ডোভা থেকে উত্তর আন্দালুসিয়ায় গিয়েছিলেন! শুধুমাত্র এক মুসলিম বন্দীর মায়ের অনুরোধে খ্রিষ্টানদের হাতে আটক তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য।

এটাই আমাদের ইতিহাস। এটাই আমাদের ঐতিহ্য—যা বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা আর নিঃস্বার্থতার কাহিনিতে পূর্ণ। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন মানুষ নিজের আরাম আয়েশের উপরে অন্যের স্বস্তি আর নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিত। তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিন। বনী ইসরাইলের উদাহরণের উপরও দৃষ্টিপাত করুন। হৃদয় থেকে কাপুরুষতা ঝেড়ে ফেলুন। স্বার্থপর ধ্যানধারণা ভুলে গিয়ে উম্মাহর প্রতি আরো অনুগত, বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হোন। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এটাই সময়। কিভাবে একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম সমাজের 'সক্রিয় কর্মী' বলে দাবি করতে পারে যখন তাদের ভাইরা (শুধু ভাই নয়, এখন আমাদের বোনেরাও) কানাডা, আমেরিকা, গুয়ান্তানামো বে, ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি দেশের কারাগারে বন্দী রয়েছে? অথচ সে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই পালন করছে না! আর কতজন বন্দী হলে আপনি এগিয়ে আসবেন? পশ্চিমা আলিমরা পরিষ্কারভাবেই এই ব্যাপারে নিজেদের অনাগ্রহ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের আশা ছেড়ে দিন। রাসূল (ﷺ) ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক প্রধান, স্বামী, পিতা, শিক্ষক এবং আল্লাহর রাসূল। এই শত ব্যস্ততাও তাঁকে অত্যাচারিত মুসলিমদের নাম মনে রাখতে ও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (ﷺ) তাঁর দু'আতে মুমিনদের নামগুলো ধরে ধরে উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। তিনি বলতেন, "ও আল্লাহ্! আল ওয়ালিদ বিন আল ওয়ালিদ, সালামাহ বিন হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবু রাবিয়াহ সহ সকল অত্যাচারিত মুমিনদের তুমি উদ্ধার করো।" প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে তিনি মজলুমদের জন্য দু'আ করতেন।

নিজের সমাজের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা ফিতরাতের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। এটাকেই বনী ইসরাইলিরা নিজেদের মাঝে ধরে রেখেছিল। কিন্তু এটা মুসলিমদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, এই ক্ষেত্রটিতে আমরা তাদের অনেক পেছনে পড়ে আছি। এটি লজ্জার বিষয় যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষায় লজ্জাজনকভাবে ইহুদিদের কাছে পরাস্ত হচ্ছি।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৬)

সূরাহ বাকারার ৯৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদের ব্যাপারে বলেছেন,

"আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে বাছুরপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।"

মূসা (ﷺ) যখন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য সিনাই পর্বতে গেলেন, বনী ইসরাইল তখন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়ল। তারা আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাতের জন্য অন্য দেবতা খোঁজা শুরু করল। এরই মধ্যে তারা সোনার তৈরি একটি কৃত্রিম বাছুরের ইবাদাত শুরু করে দিল। এই বাছুরটিকে পূজা করার প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগকে ব্যাখ্যা করতে আল্লাহ 'উশরিবু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পান করা, শুষে নেওয়া। অর্থাৎ তাদের এই ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতাকে আল্লাহ্ তরল কিছু পান করা বা শুষে নেওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

কুরআন এবং সুন্নাহর অন্যান্য জায়গাতে ইলম এবং হিদায়াহ গ্রহণ করার বিষয়টিকেও এই পান করা বা শুষে নেওয়ার উপমাটি দেওয়া হয়েছে। আল-বুখারি এবং মুসলিমে একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যে হিদায়াহ ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো জমিনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়... আল্লাহ্ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। মানুষ তা থেকে পান করে তৃষ্ণা মেটায়" (সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদিস ৭৬)। বুখারি ও মুসলিমের অন্য একটি হাদিসে এসেছে, "আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) আমাকে একটি দুধের পাত্র দেওয়া হলো। আমি তা থেকে পান করতে লাগলাম। অবশেষে তা আমার নখের নিচ থেকে বেরিয়ে আসা শুরু করলে অবশিষ্ট দুধসহ পাত্রটি উমার ইবনুল খাত্তাবকে দিয়ে দিলাম।" সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? তিনি (ﷺ) বললেন, "এই দুধ হচ্ছে ইলম" (সহিহ মুসলিম :: বই ৩১ :: হাদিস ৫৮৮৮ এবং সহিহ বুখারি :: খণ্ড ৫ :: অধ্যায় ৫৭ :: হাদিস ৩০)।

ইসরা এবং মিরাজ এর হাদিসেও এমনটি আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, "এরপর আমার সম্মুখে দুটি পাত্র পেশ করা হয়, এর একটি দুধের ও অপরটি মদের।

আমাকে বলা হলো, এর মধ্যে যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিবরীল (ﷺ) আমাকে বললেন: আপনাকে ফিতরাতেরই হিদায়াত করা হয়েছে। আপনি যদি মদ গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মাহ গোমরাহ হয়ে যেত" (সহিহ্ মুসলিম :: খণ্ড ১ :: হাদিস ৩২২)।

পানীয় দ্বারা যেমন দেহের তৃষ্ণা মেটে, তেমনি হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে সঠিক জ্ঞান ও পথনির্দেশিকার দ্বারা। তৃষ্ণা পেলে মানুষ শুধু স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ জিনিস পান করে। এক গ্লাস পানিতে মাত্র এক ফোঁটা কালি পড়লেও কেউ সেই দূষিত পানি পান করতে চাইবে না। তেমনি হৃদয় ও মনের তৃষ্ণা মেটাতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ ও পবিত্র উৎস থেকে উৎসরিত জ্ঞান এবং পথনির্দেশিকা। রাসূল (ﷺ) এভাবেই সাহাবিদের বিস্ময়কর প্রজন্মকে বিশুদ্ধ উৎস এবং ঐশ্বরিক পথনির্দেশিকার ছাঁচে গড়ে তোলেন। যার ফলে তাদের হৃদয় এবং মনন এমনভাবে গড়ে ওঠে, যা বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানে অতুলনীয়। সাহাবিদেরকে শুধু কুরআন এবং সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়া অন্য কোনো উৎসের অভাব থেকে জন্ম নেয়নি, কিংবা তা ওহী ব্যতীত বিকল্প কোনো দিকনির্দেশনা থেকেও আসেনি। বরং এই প্রচেষ্টা সুচিন্তিত এবং ওহী দ্বারা সুপরিকল্পিত। সাইয়্যিদ কুতুব (رحمه الله) বলেছেন,

"মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করতেন। তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে কুরআনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। কথা হলো—কেন তারা কুরআনকে এভাবে গ্রহণ করতেন? অন্য কোনো সভ্যতা, সাহিত্য, শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি না থাকার কারণে বাধ্য হয়েই কি তারা কুরআনকে এমন পরমভাবে গ্রহণ করেছিলেন? কিছুতেই নয়, কস্মিনকালেও এটা সত্য নয়।

প্রকৃত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাব, তৎকালীন রোমান সভ্যতা ও রোমান আইনশাস্ত্রকে আজও ইউরোপে সভ্যতার আদি মডেল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সে যুগের গ্রীক যুক্তিবিদ্যা, গ্রিক দর্শন, শিল্পসহ সাহিত্যকে আজও পাশ্চাত্য উন্নত চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারস্য সভ্যতা, তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও সে যুগে ছিল অত্যন্ত সুগঠিত ও ঐতিহ্যবাহী হিসেবে সুপরিচিত। আরবের কাছে ও দূরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক সভ্যতা তখন বিদ্যমান ছিল; তাতে চীন ও ভারতের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবের উত্তরে ছিল রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, আর দক্ষিণে ছিল পারস্য সভ্যতা। সুতরাং একজন সুস্থ চিন্তার মানুষ একথা বলতে পারে না যে, সাহিত্য, সভ্যতা ও সুগঠিত কোনো ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সে যুগের মুসলিমরা কুরআনকে তাদের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেন। বরং একটি সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় এই প্রজন্মটি সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহ্ থেকে নিজেদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটান যার ফলে ইতিহাসে তারা এক অনন্য স্থান লাভ

করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই সরোবরের সাথে অন্য উৎসের মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলা হয়..."

সাহাবিদের জন্য কুরআন ছিল এক আলো যা দ্বারা তাঁরা বিশ্বকে চিনতে, জানতে এবং বুঝতে পারতেন। কুরআনকে তাঁরা বুঝতেন কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। অন্য কোনো মতবাদ, ওয়ার্ল্ডভিউ বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজনই হয়নি, বরং এ ধরনের প্রয়াসকে বাতিল বলে বিবেচনা করা হয়। রাসূল (ﷺ) বেশ কঠোরভাবে নিশ্চিত করেছিলেন যেন সাহাবিরা কুরআনকে কুরআনের মতো করেই বোঝেন, অন্য কোনো আদর্শ বা মতবাদের সংমিশ্রণ যেন তাঁদের হৃদয়-মনকে কলুষিত করতে না পারে। সাহাবিদের যুগে এই বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ বজায় রাখা হয়েছিল, তাই উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী। সাহাবিদের সময়ের শেষদিকে তাবেয়ীনদের যুগে এসে তাঁদের জ্ঞানের বিশুদ্ধ উৎসগুলো আর অনন্য থাকেনি। যার ফলে ঐ সময় কাদেরিয়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল, বসরায় আবির্ভাব হয়েছিল মুতাযিলাদের, খোরাসানে আবির্ভাব হয়েছিল জাহ্মিয়াহদের এবং এমন আরো অনেক সম্প্রদায়। মুসলিমদের মধ্যে এই ধরনের বিজাতীয় বিশ্বাস ও মনগড়া মতবাদের উদ্ভব ও বিস্তার লাভের কারণ হলো ইসলামকে ভিনদেশী মতবাদ ও দর্শনের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা।

আজ গ্রিক ও পার্সিয়ানদের সভ্যতা, সাহিত্য আর দর্শনের দিকে খেয়াল করলে আমাদের বোধগম্য হবে যে, এদের কিছু বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার সাথে ইসলামের সংমিশ্রণে এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও জামাতের উদ্ভব হওয়া শুরু হয়েছে তাবেয়ীনদের যুগ থেকে। কুরআনকে কুরআনের মতো করে বুঝতে হবে। রাসূল (ﷺ) এর দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী সালাফগণ কুরআনের বিধি বিধান যেভাবে দেখেছেন ও মেনেছেন সেভাবে আমাদেরকেও বুঝতে হবে। অথচ কুরআনকে আজ বিচার করা হচ্ছে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাদের তথাকথিত 'সভ্য' চোখে তারা ঠিক করে দিচ্ছে কুরআনের কতটুকু মানা যাবে আর কতটুকু ছেড়ে দিতে হবে। আজকের আরবরা পশ্চিমা সভ্যতা দেখে বিমুগ্ধ, অথচ সভ্যতার অর্থ এবং প্রকৃত জ্ঞানের মালিক ছিল তারাই, যখন তারা কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণ করত। বিশুদ্ধ ও পবিত্র সেই এক গ্লাস পানিকে এখন দূষিত ও অপবিত্র করা হচ্ছে যা হৃদয় ও মননের জন্য খুবই বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। ইসলামের সাথে বিজাতীয় মতাদর্শ মিশে দূষিত হওয়ার যে ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল ইমাম আহমাদ (رحمه الله) তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ইসলামের বিশুদ্ধতাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আর শুধু একারণেই আল মুতাসিমের হাতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله)-এর মতো বীরদের জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

সে সময়ে ইসলামের বিশুদ্ধ উৎসের ভেতরে বিজাতীয় মতবাদ ঢুকে পড়ার কারণে ইসলামি আকিদার কিছু বিষয় দূষিত হয়েছিল, যেমন আল্লাহর অবস্থান এবং গুণাবলি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

কিন্তু বর্তমানে, এই দূষণ এমন সব বিষয়তেও ছড়িয়ে পড়েছে যা আগে দেখা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, আল মুতাসিম মুতাযিলাহ মতবাদের বিরোধিতার কারণে ইমাম আহমাদকে বেত্রাঘাত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। কেবল একজন অত্যাচারিত মুসলিমকে উদ্ধার করার জন্য তিনি অভিযান প্রেরণ করেন এমন ঘটনাও ঘটে। যদিও তার আকিদা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দূষিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিশ্বের প্রতি তার যে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি (worldview) তা ছিল অবিকল কুরআনের শিক্ষার অনুরূপ। মুসলিমদের সম্মান ও গৌরব ধরে রাখতে তিনি তখনও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তার মধ্যে তখনও নিঃস্বার্থতা এবং মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট ছিল। তিনি ইসলাম এবং কুফরের দ্বন্দ্বকে অনুধাবন করতে তখনও ভুলে যাননি। মুসলিমদেরকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করার ব্যাপারে তার মধ্যে তখনও প্রবল ঈর্ষা কাজ করত। শত্রুর আচঁড় থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। তিনি বিশ্বকে দেখতেন এবং বিচার করতেন প্রথম যুগের মুসলিম এবং সালাফগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল কুরআনের সূরাহ আলে-ইমরান, আন-নিসা, আল-আনফাল এবং আত-তাওবার স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলো সঠিকভাবে আত্মস্থ করার মাধ্যমে। কুরআনের বিষয়বস্তু আল মুতাসিমের মতো মুতাযিলাহ শাসকও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন, আর আজ কুরআনের অর্থ বিকৃত হচ্ছে শুধুমাত্র পশ্চিমা দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কুরআনকে বিবেচনা করার জন্য। বিজাতীয় পশ্চিমা ছাঁকুনি দ্বারা কুরআনের জ্ঞানের বারিধারাকে ছেঁকে ফেলার কারণে আজকে পশ্চিমা মুসলিমদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সেই উপলব্ধিগুলো যা মুতাসিম মুতাযিলাহ হয়েও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা বিষয়টি সাহাবিরা হৃদয়ঙ্গম করে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। আর আজ সাহাবিদের সেই আদর্শ পুঁজিবাদী মানসিকতার আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এই পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা এই সমাজকে এমনভাবে দূষিত করেছে যে, কিছু সংখ্যক "আলিম' যারা কিনা মুতাসিমের চেয়েও দ্বীনের জ্ঞান বেশি রাখেন, তারাও কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুসলিমদের "মুজাহিদ" সম্বোধন না করে পশ্চিমা মিডিয়ার পরিভাষা "জঙ্গি" ব্যবহার করেন। তাই বলা যায় যে, কুরআনের সঠিক জ্ঞান, পথ নির্দেশ, অভিমত আজ দূষিত হচ্ছে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে কুরআনকে বিবেচনা করার জন্য।

এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আত্মার প্রশান্তির জন্য একটি বিশুদ্ধ উৎস খুঁজে বের করা। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যেকোনো উৎস থেকে নিরাপদে জ্ঞান আহরণ করা যায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, জীবন ব্যবস্থা, সাংসারিক ও বৈষয়িক চিন্তাচেতনা—যা আল্লাহ্ আমাদের উপর কুরআনে ধার্য ও উল্লেখ করে দিয়েছেন—তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেই বিশুদ্ধ উৎস থেকেই। আমাদেরকে তা গ্রহণ করতে হবে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পশ্চিমা অভিরুচি মোতাবেক নয়। আমাদের মনকে এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে।

যদি বনী ইসরাইলিরা মূসা (ﷺ) এর প্রকৃত শিক্ষাতেই অটল থাকত, তাহলে তারা অন্য মতের সাথে নিজেদের মতামতের সংমিশ্রণ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হতো না। সৃষ্টিকর্তার স্থলে স্বর্ণের তৈরি বাছুরের ইবাদাতও করত না।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৭)

সূরাহ বাকারার ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"

এই আয়াতটি নিয়ে উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু বিষয় আছে। প্রথমত, আয়াতটি পড়ে এই ভেবে আপনার সম্মানিত বোধ করা উচিত, "দারুণ, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন?" মানুষ সাধারণত তাঁর কাজের জন্যে পরিচিত হতে ভালোবাসে। এটা হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা, গরিবকে খাওয়ানো, মসজিদ পরিষ্কার করা। যে কাজই হোক না কেন, যখন একজন মানুষ আপনাকে আপনার কাজের জন্যে চিনবে এবং প্রশংসা করবে তখন আপনার ভালো লাগবে। এই কারণে অনেকেই তাদের কলেজের ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট, পুরস্কার, স্মৃতিফলক এ ধরনের জিনিসগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। কারণ অন্যের দেওয়া এই স্বীকৃতিটাই আপনার ভালো কাজের সাক্ষ্য বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, আপনি অন্যের মতামতকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব দেন এবং তাদের স্বীকৃতি আপনার অন্তরে গর্ববোধের জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে আপনার কাজটির গুরুত্বও প্রতিফলিত হয়।

এখন ভেবে দেখুন, কোনো মানুষ নয় বরং মানবজাতি ও সমগ্র মহাবিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনি আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন! তিনি আপনার কথা আলাদা করে স্মরণ করছেন! এই ব্যাপারটি তো আপনার অন্তরকে কাঁপিয়ে তোলার কথা! এটি জানামাত্রই আপনার ভাবতে বসে যাওয়ার কথা, আচ্ছা কোন সে কাজ যার জন্য আল্লাহ আমাকে স্মরণ করছেন? আপনি ভাববেন, "এই যে যিকির (আল্লাহকে স্মরণ), এর মধ্যে কী এমন আছে যাতে আত্মনিমগ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ হাজার-লক্ষ-কোটি সৃষ্টির মাঝে আমাকে স্মরণ করবেন? অথচ কাজটা কতই না সহজ! আপনি তো অন্য মানুষের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েই সম্মানিত ও গর্ববোধ করেন, তাহলে এই আয়াতটি পড়ে যখন আপনি অনুভব করবেন সমগ্র বিশ্বের মালিক আপনাকে স্মরণ করছে, তখন কি আপনি এর চাইতেও বহুগুণ বেশি গর্ব আর সম্মান বোধ করবেন না? আর এই স্বীকৃতির তো কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয়ত, আপনার জানা উচিত যে, যিকির দুই ধরনের : একটি অভ্যাসগত আর অপরটি ঘটে থাকে সচেতনচিত্তে। এই দুয়ের মাঝে একটি মাত্র ধরনই কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। ইবনুল জাওযি (ﷺ) বলেন:

"একজন মানুষ হয়তো অভ্যাসের বশে অমনোযোগীভাবেই 'সুবহানআল্লাহ' বলে। অন্যদিকে একজন সচেতন ব্যক্তি সর্বদা সৃষ্টির রহস্য বা সৃষ্টিকর্তার অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করতে থাকে এবং সেই চিন্তা থেকে 'সুবহানআল্লাহ' বলে ওঠে। তাই, এই তাসবীহ হচ্ছে চিন্তাশীল মনের গভীর ভাবনার ফসল। সচেতন মানুষেরা এভাবেই তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অতীতের গুনাহের পঙ্কিলতা চিন্তা করে গভীর অনুশোচনায় ডুবে যায়। গুনাহের পরিণাম চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অনুতাপ করে। এই অনুতাপ থেকে তারা 'আস্তাগফিরুল্লাহ' (অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) বলে। এটাই সত্যিকারের তাসবীহ এবং ইস্তিগফার। অথচ একজন গাফেল ব্যক্তিও হয়তো তাসবীহ এবং ইস্তিগফার করে। কিন্তু অভ্যাসের বশে, উপলব্ধি থেকে নয়। চিন্তা করে দেখুন এই দুই ধরনের যিকিরের মাঝে কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান!..."

পরিশেষে, এই আয়াতে আমরা আল্লাহর উদারতার নিদর্শনও পাই। ভেবে দেখুন, তিনি আপনাকে স্মরণ করেন, স্বীকৃতি দেন এবং পুরস্কৃত করেন, কারণ আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু আপনি কেন তাঁকে স্মরণ করছেন? কারণ তিনি আপনার উপর রহম করেছেন বলেই তা উপলব্ধির পর আপনি তাঁর স্মরণের দিকে ধাবিত হয়েছেন, তার আগে নয়! আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন যখন আপনি তাঁরই দেওয়া খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যে খাবার তাঁরই দেওয়া নিয়ামত। আপনি তাঁর দেওয়া ঘরে প্রবেশ করছেন, যে ঘর তাঁর দেওয়া নিয়ামত। আপনি তাঁরই দেওয়া নিয়ামত, বিছানায় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁরই দেওয়া নিয়ামত ঘুম থেকে উঠছেন আর তাঁর দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করছেন। তাঁরই সৃষ্টি করা প্রকৃতির বিস্ময় দেখছেন। আপনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আপনার ঘরে তাঁরই দেওয়া নিয়ামত শিশু সন্তানের জন্ম উপভোগ করছেন—আপনার পুরো জীবনটিই তাঁর দেওয়া উপহার আর রহমতে ভরা—সমস্ত কিছুই তাঁর দেওয়া। তাই, এই আয়াত আপনাকে বলছে যে, আল্লাহ আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন শুধু তাঁকে স্মরণ করার জন্যই। অথচ সেই আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কারণেই কিন্তু আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন!

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৮)

সূরাহ বাক্বারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

হে মুমিনগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর...

জেলখানার এই ছোট্ট কামরায় এই আয়াতটির অর্থ আমার কাছে খুব পরিষ্কারভাবে ধরা দেয়। এ আয়াতে বর্ণিত সবর ও সালাতের একীভূত করার ব্যাপারটি আমি কারাগারে বসেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই দুটো ইবাদাতকে একসাথে উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

নীচের পাঁচটি পদ্ধতিতে সালাত আপনাকে ধৈর্য ধরার অর্থাৎ সবরের শিক্ষা দেয়:

সালাতের সময় আপনি মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়ান, রুকুতে মাথা নীচু করেন এবং সিজদায় অবনত হন। সালাতের পুরো সময়টা ধরে আপনি শারীরিকভাবে নিজেকে এটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি একজন "নিয়ন্ত্রিত সত্তা" আর আপনি বিশ্বজগতের একমাত্র পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রকের ইবাদাত করছেন। এভাবে চিন্তা করলে আপনার উপর বিপদাপদ যা কিছুই আপতিত হোক না কেন সবকিছুর মাঝে হাসিমুখে, সন্তুষ্টচিত্তে বেঁচে থাকা আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। কেননা এটা আপনাকে নিজের সঠিক অবস্থান উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আপনি কেবলই আপনার মালিকের একজন অনুগত দাস। যে মালিকের জন্য আপনি নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল মাটিতে স্পর্শ করেছেন, সেই মালিকই আপনাকে আজকের পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছেন। তিনিই আপনাকে রোগ-শোক দিয়েছেন, অথবা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছেন, কিংবা কোনো সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছেন। আপনি যখন সিজদায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আনুগত্যের সাথে বলতে থাকেন: "সুবহানা রাব্বি আল-আ'লা", তখন আপনি সেই রবের সাথে আপনার সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করেন। আপনি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, যেভাবে আমি আল্লাহর সামনে নিজের মুখমণ্ডল মাটিতে অর্পণ করছি, ঠিক একইভাবে আমার সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়তির কাছে নতমস্তকে সমর্পণ করলাম। সালাত আপনাকে একটি পরম বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শেখায়। আর তা হলো, মহান আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের একমাত্র নিয়ন্ত্রক এবং আপনি তাঁর আজ্ঞাবহ দাস।

সালাত আপনার মধ্যে একধরনের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলবে। এই শৃঙ্খলাবোধ আপনাকে চরম অস্থিরতার মুহূর্তেও সুস্থির রাখবে। যেমন- যথাযথভাবে সালাত আদায় করার অর্থ হলো আপনাকে অবশ্যই সময়-সচেতন হতে হবে এবং নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মাঝে সালাত আদায় করে নিতে হবে। প্রত্যেক সালাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত আদায় করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো সালাত বাদ দিতে পারবেন না। এমন আরো অনেক কিছু সালাতের ক্ষেত্রে আপনি মেনে চলতে বাধ্য। এভাবে সালাত আদায় করার মাধ্যমে আপনি নিজেকে নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তুলতে পারবেন। আপনি জেলখানায় বন্দী বা আপনার চাকরি নেই- এই অজুহাতে আপনি সালাত ত্যাগ করতে পারবেন না। সালাত আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আপনার চরিত্র গঠন করে। যাচ্ছেতাই জীবনযাপনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আপনার জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। জীবনে এমন কিছু কঠিন সময় আসে যখন মানুষ ভেঙে পড়ে। সালাত আপনাকে এমন সময়েও ধীরস্থির থাকতে সাহায্য করবে।

সময়ের সঠিক ব্যবহারে সালাত আপনাকে সহায়তা করে। সত্যি বলতে কি, আমি এই জেলে বসে আমার দিনগুলোকে সালাতের ওয়াক্তের ভিত্তিতেই ভাগ করি। যেমন- ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা থাকে। আবার যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়টা আমি অন্য কিছু কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখি। এমনি করে যখন জেলখানার বাকিরা দীর্ঘ, বিরক্তিকর, উদ্দেশ্যহীন সময় কাটিয়ে দিনাতিপাত করে তখন প্রতিদিনই আমার অনেকগুলো কাজ করা হয়ে যায়। অথচ জেলের বাকিদের দিনগুলো ক্যালেন্ডারের পাতার মতো। একটার সাথে আরেকটার পার্থক্য শুধু তারিখে। ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য ফলপ্রসূ সময় কাটানোটা খুবই জরুরি।

সালাতকে আত্মার জন্য এক ধরনের ব্যায়াম বলা চলে। রাগের সময় একজন মানুষ হাত-পা নাড়িয়ে চিৎকার করে যেভাবে তার মনের জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ করতে চায়, তেমনিভাবে সালাত, বিশেষ করে দু'আ, আপনার মনের কথাগুলো সর্বশ্রোতা ও জবাবদাতা আল-মুজিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। আপনার যত ফরিয়াদ, যত ইচ্ছা, দুশ্চিন্তা, যত আশা, ক্ষোভ, আবেগ, মনের যত চাপা কথা আছে—সবকিছু মন খুলে বলার এইতো সময়। মনের আগল খুলে দিন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রার্থনা আর দুঃখগুলোকে চোখের জল হয়ে আপনার গাল ছুঁয়ে নেমে আসতে দিন। নিশুতি রাতের শুনশান নীরবতায় কুনুতের জন্য হাত তুলে বিতর সালাতে আপনার রবের সাথে কথা বলুন। আপনার একান্ত, নিজস্ব রবের কাছে আপনার মনের কথাগুলো বলুন। আপনার রব একান্তে আপনার কথাগুলো শুনবেন এবং তিনি নিজে আপনার দু'আর জবাব দেবেন। আপনার মনের অনুভূতিগুলো তাঁকে বলে ফেলুন। জমিয়ে রাখা নালিশগুলো তাঁর কাছেই করুন। যেমনটি ইয়াকুব (ﷺ) করেছিলেন- "...আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই

নিবেদন করছি..."(সূরাহ ইউসুফ)। সুতরাং, শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যেভাবে শরীরের উদ্বৃত্ত শক্তি নির্গমন হয়, সালাত তেমনি একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন যার মাধ্যমে আপনি মনের গহীনে জমে থাকা অনুভূতিগুলোকে সুন্দরতম উপায়ে নিঃসরণ করতে পারেন।

সবশেষে, সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রতিনিয়ত আখিরাতের বড় চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাহান্নামের চিরস্থায়ী বন্দীদশার বর্ণনা আপনার পার্থিব দুঃখকষ্টগুলোকে তুচ্ছ করে দেয়। জান্নাতের অবর্ণনীয় সুখের বর্ণনা আপনার চারপাশের রূঢ় বাস্তবতা থেকে আপনাকে ক্ষণিকের অবকাশ দেয়। নবী-রাসূলদের সংঘাতময় জীবন সংগ্রাম আপনার মনে সংহতির চেতনা সৃষ্টি করে। একইসাথে আপনাকে এও জানিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর সেরা মানুষগুলোর পার্থিব জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সালাতের মাঝে কুরআন পাঠ আপনাকে আপনার চারপাশকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং সামনের বন্ধুর পথকে মসৃণ ও পরিচিত করে তোলে।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৯)

সূরাহ বাক্বারার ১৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

"নিঃসন্দেহে 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা উমরাহ আদায় করার (এরাদা করে), তাঁর জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই... "

প্রথমবার দেখেই এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু এ আয়াত নাযিলের পরিস্থিতি বর্ণনা করে যে, বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

আস-সাফা ও আল-মারওয়া হচ্ছে মক্কার দুটি পাহাড়। নবী ইবরাহীম (ﷺ) ফিলিস্তিন যাওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ঈসমাইল (ﷺ) কে এই পাহাড় দুটির কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিবি হাজেরা তাঁর পিপাসার্ত পুত্রের জন্যে একটু পানি খুঁজতে গিয়ে এই দুই পাহাড়চূড়ার মাঝে সাতবার ওঠানামা করেন (এই ওঠানামার ঘটনাটি আস-সা'ঈ নামে পরিচিত)। পরবর্তীতে যখন ইবরাহীম (ﷺ) মানুষকে মক্কায় হজ্জ করার জন্যে আহবান করলেন তখন বিবি হাজেরার এই ঘটনা থেকেই হজ্জের সময় সা'ঈ করার প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে বহু-ঈশ্বরবাদ বা শির্ক আরবে শিকড় গেড়ে বসে। তখন এই দুই পাহাড়চূড়ায় মূর্তি বসানো হয় আর মানুষ সা'ঈ করার সময় মূর্তিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা শুরু করে। কালক্রমে মুসলিমরা জয়ী হলো এবং ইসলাম পৌত্তলিকতাকে পবিত্র মক্কাভূমি থেকে উৎখাত করল। বিশুদ্ধ তাওহীদের যুগে যে পদ্ধতিতে হজ্জ পালিত হতো সেই হজ্জ আবার ফিরে এল। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে পৌত্তলিকতার আদলে সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা বহাল থাকবে কি না তা নিয়ে মানুষের মনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলো। কারণ সাহাবিগণ জাহিলিয়াতের দাগে কলঙ্কিত প্রথাতে শামিল হতে আগ্রহী ছিলেন না। বুখারি এবং মুসলিম থেকে বর্ণিত, আনাস বিন মালিক (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি কি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতে ঘৃণা করতেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ; কারণ এটা জাহিলিয়াহর সময়কার প্রথা। কিন্তু এই ঘৃণা কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্তই ছিল: "অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের

মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা উমরাহ আদায় করার (এরাদা করে), তাঁর জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই..."। এই প্রথাটির

অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কারণ এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (ﷺ) এর হজ্জের সুন্নাহ। পরবর্তীতে মক্কার মুশরিকরা একে বিকৃত করেছিল।

এই আয়াতটি দ্বীনের প্রতি সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামের স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা যেকোনো আচার-প্রথা অথবা কাজকে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। দ্বীন ইসলাম সাহাবিদের হৃদয়, মন, আচরণ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তাদের জীবনে ইসলাম ছিল একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো—যা তাদের পুরো সত্তার ভিতরে প্রবাহিত হয়ে পুনর্বিন্যাস আর পরিমার্জনের মাধ্যমে নতুন এক সত্তার জন্ম দিত। বৈদ্যুতিক প্রবাহ যখন কিছু পরমাণুর গ্রুপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তা তাদের ইলেক্ট্রন বিন্যাসকেই সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিন্যস্ত করে ফেলে। ইসলাম সাহাবিদের মাঝে ঠিক এই কাজটাই করেছিল। মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে সাহাবিগণ জীবনের প্রতিটা আঙ্গিক ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করতেন আর দেখতেন কুরআনের আলোতে তা কেমন দেখায়। যা কিছু ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তাঁরা ধরে রাখতেন। আর যা কিছু ইসলামের একটুখানি হলেও বিপরীত, তার ধারে কাছেও সাহাবিগণ যেতেন না। কারণ সেগুলোকে তাঁরা জাহিলিয়াতের ধ্বংসাবশেষ হিসাবে বিবেচনা করতেন। সাইয়্যিদ কুতুব (রহ.) বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময় যখন একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত, সে তৎক্ষণাৎ জাহিলিয়াতের সাথে নিজের সম্পর্ক ছেদ করে ফেলত। ইসলামের বৃত্তে প্রবেশ করা মাত্রই সে তার অতীত জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন এক জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করত। সে তার অজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের কর্মকাণ্ডকে খুব সতর্কতার সাথে বিচার করত এবং তার মনে হতো ইসলামে ঐ অপবিত্র কাজগুলোর কোনো ঠাঁই নেই। এই অনুভূতিকে সাথে করে সে নতুন এক পথে চলার আশায় ইসলামের ছায়ায় এসেছিল ... এবং কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করেছিল যেন এই কুরআনের ছাঁচে তার মন-মনন-আত্মা গড়ে ওঠে।

শিরকের স্থলে তাদের মনে বিশুদ্ধ তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তারা জাহিলিয়াতের আবহ ও চেতনা, আচার ও প্রথা এবং ধারণা ও বিশ্বাসগুলো পরিত্যাগ করে। এই সামগ্রিক বর্জন ছিল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের ফলাফল। এ ছিল দুটি ভিন্ন পথের বিভাজন এবং নতুন পথে যাত্রার সূচনা। এ যাত্রায় জাহিলিয়াতের মূল্যবোধ, চেতনা বা রীতিনীতির কোনো বালাই নেই।"

কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যেমন করে তার ইলেক্ট্রনগুলো সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলামও তাদের জাহিল জীবনযাত্রা এবং মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। জাহিলিয়াতের মাঝে বসবাস না করলেও তারা

তাদের ব্যক্তিত্বের ছোট-বড় সবগুলো দিক ইসলামের আলোকে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করে দেখতেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের ঢেলে সাজাতেন, তা যতো কঠিনই হোক না কেন। তাঁদের কাছে ইসলাম ছিল এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমাদের সামনে তাদের মতো করে ইসলাম পালনের সুযোগ এসেছে, কেননা আমরা আজকে জাহিলিয়াহ প্রত্যক্ষ করছি ও তার মাঝে বসবাস করছি।

উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) বলেছিলেন, "জাহিলিয়াহ কি তা না জেনেই যখন মানুষ মুসলিম হিসাবে বেড়ে উঠবে তখন ইসলামের বন্ধন আস্তে আস্তে এক এক করে ছুটে যেতে থাকবে।"

এই উক্তিটির উপর বক্তব্য দিতে গিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) বলেন :

"জাহিলিয়াতের গতিপ্রকৃতির ব্যাপারে জ্ঞান ও ধারণা থাকার কারণে সাহাবিগণ ইসলাম ও এর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়াদি, এর কর্মপদ্ধতি(methodology) এবং এর আওতাধীন বিষয়গুলো সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। ইসলামের ব্যাপারে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন। তারাই ইসলামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাঁরাই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছেন এবং ইসলামবিরোধী মতাদর্শের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। আর এই সব কিছুই সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ইসলামের বিপরীতধর্মী জিনিসগুলোর ব্যাপারে তাঁদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকার কারণে। ইসলাম যখন তাঁদের কাছে এসেছিল তখন ইসলামের সবকিছুই তাঁদের জীবনযাত্রার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তাই, ইসলামের বিপরীতধর্মী জিনিসগুলোর নিকৃষ্টতার সাথে তাঁদের পূর্বপরিচিতির কারণে তাঁদের আবেগ আর লড়াই ছিল অন্য সবার চেয়ে তীব্র। আর এ জন্যই ইসলামের প্রতি তাদের জ্ঞান, ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। কেননা তারা ইসলামের বিপরীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন।

এটা অনেকটা এরকম যে, একজন দুঃখে জর্জরিত অসুস্থ, দরিদ্র, ভীত আর একাকী লোক হঠাৎ করেই এসব কিছু থেকে মুক্তি পেয়ে আরামদায়ক, নিরাপদ, ঐশ্বর্যময় এবং উন্নত জীবন লাভ করল। এরকম লোক তাঁদের পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকার কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি সুখী হবে। কারণ যেই ব্যক্তির অতীতে কষ্টের অভিজ্ঞতা নেই, সে এই আরামের জীবন আর কষ্টের জীবনের মাঝে যে পার্থক্য সেটা উপলব্ধি করতে পারবে না।"

আমি সবসময় আশা করতাম যে পশ্চিমের কোনো দ্বীন শিক্ষার্থী 'মাসায়িল আল-জাহিলিয়াহ' – নামক অতুলনীয় গ্রন্থটির একটা আধুনিক সংস্করণ তৈরি করার দায়িত্ব নেবে যেটিতে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের একটি পরিষ্কার এবং উপলব্ধিযোগ্য বর্ণনা থাকবে। এটি থাকলে আধুনিক জাহিলিয়াহ এবং ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিত এবং ইসলামকে আমরা আরো

গভীরভাবে বুঝতাম। এই সুন্নাহটি মেনে চললে আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত। এরকম একটা সম্পাদনায় কিছু জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন- আমাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (worldview), রাজনীতির একাল-সেকাল, সমাজের রীতিনীতি (যেমন: বাহ্যিক আচার-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ইসলাম বনাম জাহিলিয়াহ), বিনোদন, পারিবারিক জীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, সমাজে ধর্মের প্রতি মনোভাব, বাজে ভাষার ব্যবহার, সম্পদের ভূমিকা, স্বাস্থ্যসেবা ও লিঙ্গ বিষয়ক বৈষম্য, বর্ণবাদ, সমাজে যৌনতা এবং আরো অনেক কিছু। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একুশ শতকের জাহিলিয়াতের সকল বিষয় এমনভাবে সংকলন করতে হবে যেন সেটি পড়ে "কী করা যাবে আর কী করা যাবে না"—এমন একটা তালিকা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে কোন কাজগুলো করা যাবে তা জানা হয়ে যাবে। ফলে ইসলামকে যুগোপযোগীভাবে দেখা সহজ হবে এবং সাহাবিদের মতো করে ইসলাম বোঝা ও মানার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) তাঁর "মাদারিজ আস-সালিকিন" গ্রন্থে বলেছেন, "একজন মানুষের হৃদয় থেকে জাহিলিয়াতের শেষ অংশটুকুও বিদায় নেওয়ার আগ পর্যন্ত সে কখনোই ঈমানের মিষ্টতা এবং সত্যতা ও ইয়াকীনের স্বাদ নিতে পারে না।" সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার ব্যাপারে সন্দিহান থাকার সময় এটাই ছিল সাহাবিদের মনের অবস্থা।

আল্লাহ সাহাবিদের উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকে তাঁদের পথে চলার তাওফিক দিন।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১০)

সূরাহ্ বাক্বারার ১৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্ত সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা একান্তভাবে শুধু তাঁরই ইবাদাত কর।"

এই আয়াতে খাবার সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এর প্রত্যেকটিই আমাদের তাওহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রথমটা হলো, আল্লাহ আমাদের নির্দিষ্ট একটি খাবার খেতে বলেননি। তিনি বিশেষভাবে যে সকল খাবার 'তাইয়্যিব' সেগুলো খেতে বলেছেন। অর্থাৎ শুধু স্বাদসর্বস্ব খাবার নয়—যা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো, পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর এবং উপকারী সেগুলো খেতে বলেছেন। এর কারণ হলো আমাদের দেহটা আসলে 'আমাদের' নয়। এটি আমাদের উপর অর্পিত একটি আমানত। একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পাথেয় হিসাবে আমাদের এই আমানতটি দেওয়া হয়েছে। আর সেই অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এই কারণে, আল্লাহ কুরআনের কিছু অংশ জুড়ে শুধু খাবার হিসেবে আমাদের জন্য কী উত্তম সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে কথা বলেছেন। আর আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক তাইয়্যিবাত গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দেওয়া এই আমানতকে সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে পারব। মাটির তলা থেকে বের হয়ে আমাদের পেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে খাবারগুলোর চেহারা একই থাকে সেগুলোই হচ্ছে সর্বোত্তম খাবার। কারণ এগুলোতে কোনো আকর্ষণীয় মোড়ক আর বাহারী রঙ থাকে না। শাকসবজি ও ফলমূলে আছে ফাইটোক্যামিক্যালস আর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যা আমাদের শরীরকে ক্রমাগত সচল ও কার্যকরী রাখার প্রক্রিয়াকে জিইয়ে রাখে। ওজন বেড়ে গেলে শরীরের এই প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর পরিণামে রক্তে চিনি ও চর্বির পরিমাণ এবং উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে ধমনীর ক্ষতি হয়। দিনে পাঁচ বেলা সবজি খেলেও হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা ততটা থাকে না, যতটা দুই বেলা অন্য খাওয়া খেলে থাকে। আর টমেটো, ফুলকপি ও অন্যান্য সবুজ শাক-সবজি বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হলো, এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহই হলেন এইসব খাবারের যোগানদাতা। প্রতিবারই যখন আমরা আঙুল বা চামচে করে

একটুখানি খাবার মুখে তুলে নিই, ততবারই তা যেন দেখিয়ে দেয় এই পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী। আপনি যতই ধনী বা গরিব হোন, হোন বিখ্যাত বা অখ্যাত কেউ, অথবা সবল কিংবা দুর্বল—দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই তার নিজের চাইতেও বড় বা শক্তিশালী কিছুর মুখাপেক্ষী। আমরা কে আর আমরা কে নই, খাবারই আমাদের সেটা জানিয়ে দেয়। কেউ অন্যের উপর যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, এই ক্ষমতা যে মিছে ভ্রম ছাড়া কিছুই নয় তা খাবারের ব্যাপার আসলেই বোঝা যায়। তখন সে আর আট-দশটি সৃষ্টিরই অনুরূপ, স্রষ্টার অনুগ্রহে বেঁচে থাকা এক সৃষ্টি। এই লেখাটি যারা পড়ছেন, তাদের বেশিরভাগেরই হয়তো কোনো বেলা অভুক্ত হয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু খেয়াল করুন, খেতে বসে খাবারের স্বাদ-গন্ধ-বৈচিত্র্য, রন্ধন-কৌশলসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা মুখ্য আলোচনা থেকেই দূরে সরে যাই। পরিবার-পরিজন আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার ব্যাপারে অসচেতন হয়ে পড়ছি। আর তা হলো—মানুষ হিসেবে আল্লাহর উপর আমাদের নির্ভরতা। আল্লাহর দিকে আমাদের চেয়ে থাকা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, আমরা আল্লাহর তুলনায় কতই না দুর্বল। আর আমাদের তুলনায় আল্লাহ কতই না শক্তিশালী! এই মহাসত্য আমরা উপলব্ধি করতে ভুলে যাই। খাবারের যোগান দেওয়াটা আল্লাহর একটি অনন্য গুণ যা আল্লাহ সূরাহ আয-যারিয়াত এর ৫৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "....এবং (তাদের কাছে আমি) এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে", সৃষ্টি আর স্রষ্টার মাঝে খাবারের যোগান দেওয়ার বিষয়টিকে একটি পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ চিহ্নিত করেছেন।

আর সত্যিই, এই জেলখানায় খাবার দিতে নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র ৩০ মিনিট দেরি হলেই কয়েদিরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি আর দরজায় আঘাত করা শুরু করে দেয়। এটি যেন মানুষের সীমাবদ্ধতা আর পরমুখাপেক্ষীতার বাস্তব প্রদর্শনী। কাজেই, আজকের পর থেকে যখন আপনি কোনো খাবার অথবা নাস্তা উপভোগ করতে বসবেন, অবশ্যই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও বাস্তবতা অনুধাবন করে তা উপভোগ করবেন।

সবশেষে, উপরে বর্ণিত বাস্তবতার উপলব্ধি আপনাকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার দিকে ধাবিত করবে। সহিহ মুসলিম-এ রাসূল (ﷺ) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাঁর বান্দার ওপর, যখন সে কিছু খাবার খায় আর আল্লাহর প্রশংসা করে।" এটা একই সাথে তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ এবং এই রূঢ় বাস্তবতার স্বীকৃতি যে, এই ছোট্ট খাবারের টুকরোটা লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই—যাদের আপনি হয়তো আপনার জীবনে কোনোদিন দেখেনওনি—তাদের চোখে এই টুকরোটি একটা কল্পনা মাত্র। যার কেবল স্বপ্নই দেখা চলে। সোমালিয়া বা হাইতির ভয়াবহ লাগামহীন দুর্ভিক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন। খাবার কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেই এই নিশ্চয়তা থাকার পরও আমার চারপাশের কয়েদিরা একটু দেরিতেই অস্থির হয়ে দরজায় আঘাত করা শুরু করে দেয়।

অথচ এক মুহূর্ত ভাবুন তো, আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও কোনো খাবার নেই। আপনার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আপনি সারাদিন বা সারা সপ্তাহ কিছু মুখে দিতে পারবেন কি না। কী করবেন আপনি? এহেন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি যে দুঃস্বপ্নের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করেন তা পশ্চিমা ধনী দেশের দরিদ্রতম লোকটিও কল্পনা করতে পারবে না। এমন দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করা ছাড়া আর কীইবা করার আছে? ভাবুন তো, আপনার নিজের ক্ষুধা-পিপাসার সাথে যদি স্ত্রী আর সন্তানদের অনাহারক্লিষ্ট মুখ যোগ হয় তাহলে আপনার কেমন লাগবে? খুশির কথা হচ্ছে, এই কল্পনা শুধুই ক্ষণিকের জন্যে আপনার মাথার একটা ছোট্ট অংশ জুড়ে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু এ দুনিয়ায় আপনার চোখের আড়ালের লাখো মানুষের জন্যে এটাই বাস্তবতা। এটাই জীবন, ভাবতে না চাইলেও ভাবতে হবেই। এই জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি মন-প্রাণ ভরে খাবার খায়, অথচ এ খাবারের সন্ধানদাতা (আল্লাহ) ও প্রকৃত অর্থে অমূল্য এই খাবারের সঠিক মূল্যায়ন করতে জানে না, সে আসলে এই খাবার খাওয়ারই যোগ্য নয়।

আল-ইমাম আল আওযা'ই (ﷺ) একবার দামাস্কাস থেকে শাম উপকূলে যাত্রা করছিলেন। পথিমধ্যে তার এক বন্ধুর শহরে তাকে থামতে হলো। বন্ধুটি তাদের দুইজনের জন্যেই রাতের খাবার তৈরি করল। যখন তারা খেতে বসলেন, বন্ধুটি বললেন, "হে আবু আমার! খাও। আর আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি এমন একসময় এলে যখন আমি কিছুটা টানাপোড়েনে আছি।" ইমাম আওযা'ই তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন এবং খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। বন্ধুটি বারবার তাঁকে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু তিনি প্রতিবারই অস্বীকৃতি জানালেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধুটি খাবার গুছিয়ে ফেললেন। তারপর দুজনেই শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে উঠে বন্ধুটি ইমাম আওযা'ইকে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাতে তুমি খেলে না কেন?" আল আওযা'ই জবাবে বললেন, "আমি সেই খাবার ছুঁয়ে দেখতে চাইনি যে খাবারের জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়নি বা যে খাবার সামনে নিয়ে আল্লাহর নিয়ামত সেই খাবারকেই ছোট করে দেখা হয়েছে।

তাই খাওয়া-দাওয়ার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে- তাওহীদ।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১১)

কুরআনে সূরাহ বাক্বারার ২১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

“সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরি করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ ...”

হিজরি ২য় বর্ষে এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ (ﷺ) এর নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবিকে কুরাইশদের একটি খাদ্যবাহী কাফেলাকে অবরোধ করতে নাখলাহ (মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি) নামক স্থানে পাঠান। মুসলিমদের উপর বাড়াবাড়ি রকমের জুলুম-নির্যাতনকারী কিছু মুশরিক সেই কাফেলাতে ছিল। অত্যাচারের ক্ষেত্রে তারা সবরকমের সীমা অতিক্রম করেছিল। তারা মুসলিমদের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, মুসলিমদের ঘরছাড়া করেছিল, সাহাবিদের অত্যাচার করেছিল, এমনকি রাসূল (ﷺ) কে ও তারা একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছিল। সেই কাফেলার কাছাকাছি গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ এই ঘৃণ্য লোকগুলোকে দেখতে পান। সাহাবিদের মনে তখন এ কাফেলাটি আক্রমণ করে তাদের নিজেদের অর্থসম্পদের কিয়দংশ ফেরত পাওয়ার চিন্তা উদিত হয়। কিন্তু সে সময়টা ছিল রজব মাস। চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম রজব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া ছিল হারাম। তবে অনেকক্ষণ ভেবে দেখার পর, মুসলিমদের সেই ছোট্ট দলটি তাই করার সিদ্ধান্ত নেয় যা ইতিহাস এবং পরিস্থিতির বিচারে সমর্থনযোগ্য। তারা সে কাফেলাটি আক্রমণ করেন এবং তাদের হারানো কিছু সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন।

এই ঘটনা রাসূল (ﷺ)-কে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে পুঁজি করে এবার মুশরিকরা সমাজে হৈ চৈ বাঁধিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে জনসমর্থন আদায়ের সুযোগ পায়। তারা বলে বেড়াতে থাকে মুসলিমরা যুদ্ধের পবিত্র রীতি লঙ্ঘন করেছে। তারা উগ্র, তারা জঙ্গী, তারা রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ—তারা শান্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এবং এ ধরনের আরো নানান কথা তারা বলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে গিয়ে

ইবনু জাহাশ ও তার বাহিনীর কুরাইশদের কাফেলা আক্রমণের ঘটনায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত তা নিয়ে মুসলিমরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

অবশেষে, আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং নিশ্চিত করেন যে, হ্যাঁ, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে এতদিন ধরে যা কিছু অন্যায় করে আসছে সেগুলো নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও নিকৃষ্ট। এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুরাইশরা যে মানবতার মেকি আর্তনাদ তোলে তা নিস্ফল হয়ে যায়।

বর্তমানকালেও এই ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা হলো, ইসলামের শত্রুরা কিছু ঘটনাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করে। এই ঘটনাগুলো আমাদেরকে অনেক সময় রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দেয়। কিন্তু আমাদের রক্ষণাত্মক হয়ে পড়া মোটেই উচিত নয়। বরং কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা না করে ইসলামের এইসব শত্রুদেরকে তাদের অপরাধের জন্য কাঠগড়ায় তোলা উচিত। ইবনু জাহাশের আপাতদৃষ্টিতে অনুচিত কাজটিকে তারা শঠতাপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবার সামনে তুলে ধরেছিল যে, তাদের নিজেদের সব অপকর্ম এর নীচে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। অথচ তাদের অন্যায় ও অপকর্মই এই ঘটনার মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার জবাবে আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে রক্ষণাত্মক হতে বলেননি। মুশরিকদের সামনে কৈফিয়ত পেশ করতেও বলেননি। বরং আল্লাহ মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন এই মুশরিকদের সকল অপকর্ম সবার সামনে তুলে ধরতে। এখানে মুসলিমদের আচরণটা হবে এমন, "আরে? তুমি কাকে সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী বলছ? তুমি নিজে কী করেছো আমাদের সাথে, সে ইতিহাসের দিকে আগে লক্ষ কর!"

এই যুগে এসেও মুসলিমদেরকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যখনই আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং এই ধরনের আরো অতি পরিচিত কিছু অভিযোগ তাক করা হয়, তখন অধিকাংশ মুসলিম হয়তো ভালো নিয়ত নিয়েই রক্ষণাত্মক অবস্থানে গিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। "দেখুন অল্প কিছু মানুষের কাজের জন্য আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না", "আমরা শান্তিকামী মুসলিম", "ইসলাম নিরীহ মানুষ হত্যা কোনোক্রমেই সমর্থন করে না" ইত্যাদি কিছু গৎবাঁধা বুলি আওড়ে তারা যেন ইসলামকে কলঙ্কমুক্ত করার চেষ্টা করে। হতে পারে তারা এসবের সাথে মোটেও জড়িত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই বুলিগুলো সত্যও বটে। তবুও আগ-বাড়িয়ে এসব কথা বলে নিজেদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করাটা পরাজিত মানসিকতার একটি লক্ষণ। এই লক্ষণটি পশ্চিমা মুসলিমদের একটি সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমারা এভাবেই আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে। তারা চায় আমরা নমনীয় হই। কৈফিয়ত ও আত্মরক্ষাসুলভ

প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করি যাতে করে তারা নিজেদের হিংস্র ও রক্তাক্ত ইতিহাস আড়াল করতে পারে। এ কারণেই, এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয়, কাফিরদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নমঃনমঃ হয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার এই বেদনাদায়ক মানসিকতা যেন আমরা পরিত্যাগ করি। বরং হাঁটে হাড়ি ভেঙে তাদেরকে যেন তাদের অপকীর্তিগুলো দেখিয়ে দেই। আর তাদের অপকীর্তির উদাহরণ তো ভুরি ভুরি।

এই আয়াতে মুসলিমদেরকে কুরাইশদের অপকর্ম ও অন্যায়ের স্বরূপস্বরূপ উন্মোচন করে দিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের তর্জন-গর্জনকে স্তিমিত করে দেওয়া। ঠিক একইভাবে আমাদের উচিত, আজকে যারা ইসলামের শত্রু, তাদের সীমালঙ্ঘন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা। যখনই তারা আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থার অভিযোগ তুলে আঙুল তাক করার ধৃষ্টতা দেখাবে এবং নিজেদের পরম হিতৈষী শান্তিকামী হিসেবে দাবি করবে, তখন আমরা তাদের কুকীর্তির ইতিহাস উন্মোচন করব।

আমাদের নেটিভ আমেরিকানদের গণহত্যার ইতিহাস সম্বন্ধে জানা উচিত। কলম্বাস আসার আগে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। কিন্তু ইউরোপিয়ান হানাদাররা বর্তমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই আদি অধিবাসীদের কচুকাটা করে তাদের সংখ্যা নামিয়ে নিয়ে আসে ১০ লক্ষেরও নীচে।

আফ্রিকার দাসদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। দাস-বণিক ও উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাতে সেখানে ৫০ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে। এটি সুদূর ইতিহাসের ঘটনা নয়। এটি ঘটেছিল সেই যুগে, যে যুগকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাকাল হিসাবে ধরা হয়। এই নিষ্ঠুরতার পেছনে কোন দেশ ছিল? পশ্চিমা ইউরোপ এবং আমেরিকা, যাদের কিনা সবচেয়ে "সভ্য" জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমাদের মেক্সিকান-আমেরিকান যুদ্ধের ইতিহাস জানা উচিত, এবং "manifest destiny" এর অর্থ জানা উচিত। (manifest destiny হলো এই নিয়তিতে বিশ্বাস করা যে, আমেরিকান সৈন্যরা বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে)। ১৯ শতকের শেষদিকে আমেরিকান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিপিনোদের বিদ্রোহের কাহিনি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

আমাদের জ্ঞানের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মুহূর্তের মাঝে ছাই হয়ে যায় এই বোমার কবলে পড়ে। এদের সবাই ছিল যে যার মতো কাজ করা বেসামরিক লোক। ইতিহাসে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের এটিই একমাত্র ঘটনা। অথচ নির্মম বাস্তবতা এই যে, যারা সেইদিন নিজেরা পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছিল, তারাই আজকে হর্তা-কর্তা সেজে বিশ্বব্যাপী লেকচার দিয়ে বেড়ায় যেন যার-তার হাতে এই পারমাণবিক বোমা চলে না যায়! (জন

হেরেসির(John Hersey) "হিরোশিমা" নামক বইটি পড়ুন) ল্যাটিন আমেরিকা, বিশেষ করে এল সালভাদর, চিলি, পানামা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গ্রেনেডা এবং গুয়াতেমালায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা উচিত। হাওয়ার্ড যিন(Howard Zinn) এর বইগুলো সেক্ষেত্রে ভালো কাজ দিতে পারে।

আমাদের ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী আমেরিকা-নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ কর্তৃক ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ইতিহাস জানতে হবে। এই অবরোধের মাধ্যমে ইরাকে খাদ্য-পানি-ঔষধপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশুদেরকে অনাহারে এবং ঔষধসেবা থেকে বিরত রাখা ছিল যুদ্ধের 'আধুনিক' একটি কৌশল। ১৯৯৬ সালে, "৬০ Minutes" নামের একটি অনুষ্ঠানে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট (আমেরিকার প্রথম মহিলা সেক্রেটারি অফ স্টেট), আমেরিকার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেন যে তারা মনে করেন, ইরাকে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু তাদের যথার্থ প্রাপ্য ছিল।

১৯৯৩ সালে আমেরিকা কর্তৃক সোমালিয়া আক্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে। সেখানে তারা প্রায় ২০০০ সোমালিকে হত্যা করেছিল। আমেরিকা কর্তৃক ইসরাইলকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের খুঁটিনাটি জানতে হবে। ইসরাইলের প্রতিটি বুলেট, মিসাইল, বুলডোজার এবং যুদ্ধবিমানে আমেরিকানদের কালো হাত প্রকাশ পায়। এগুলো দিয়ে ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত আমাদের ভাই-বোনদের হত্যা করা হয়। (পড়ুন নরম্যান ফিনকেলস্টাইনের (Norman Finkelstein) বইগুলো)

আমাদের জানতে চাওয়া উচিত, কীভাবে তারা আমাদেরকে সন্ত্রাসী ডাকার স্পর্ধা দেখায়? অথচ তারাই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে আমাদের দু-দুটো দেশে আগ্রাসন চালিয়ে জবরদখল করেছে এবং প্রতিনিয়ত বোমাবর্ষণ করছে।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে 'সাইকোলজিক্যাল প্রজেকশান (*Psychological projection)*' বলে একটি ধারণা আছে। এই ধারণামতে, কোনো অপকর্মের দায়ে দোষী ব্যক্তি নিজের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে নিজের উপর থেকে সকলের মনোযোগ সরিয়ে নিতে চায় এবং অন্য কারো কাঁধে নিজের দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চায়। আজকের দিনে আমাদের শত্রুদের সম্ভবত এই রোগেই ধরেছে। যা কিছুই হোক, আল্লাহ আমাদেরকে এই আয়াতে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে আমরা তাদের অপপ্রচারের জবাব দেব (এবং কীভাবে দেব না)।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১২)

সূরাহ আলে ইমরানের ১১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

"দেখ! তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিরিবিলি হয়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে..."

অন্যদের সাথে কোনো বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে নিজেদের সহজাত অন্তর্জ্ঞান অর্থাৎ Intuition কে কাজে লাগানোর বিষয়ে এই আয়াতটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। নেকড়েদের এই সমাজে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে দুই ধরনের প্রান্তিক আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একদিকে যেমন অন্যদেরকে সাক্ষ্যপ্রমাণের স্বল্পতার কারণে সন্দেহ সত্ত্বেও ছাড় দিতে হবে ঠিক তেমনি এর বিপরীতে আবার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মুখের কথায় মুগ্ধ হয়ে সবকিছুকেই সরলমনে বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়া যাবে না। এ দুটোর মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। কেউ যেন আমাদের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে হীন স্বার্থোদ্ধার করার সুযোগ না পায়।

সহানুভূতিশীলতা এবং সতর্কতা-এ দুয়ের মাঝে হতে হবে আমাদের অবস্থান। সবকিছুকে অতি সরল মনে গ্রহণ করা বা মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলা যেমন এক ধরনের চরমপন্থা, তেমনি সারাক্ষণ চরম নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিত থাকা, সবকিছুর মাঝে মন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া আরেক ধরনের চরমপন্থা। উল্লেখিত দ্বিতীয় ধরনের চরমপন্থা একজন মানুষকে অন্যের প্রতি সদয় হতে নিরুৎসাহিত করে তোলে। তাই মুসলিমরা এ দুয়ের মাঝে এমন এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করে যা বাস্তবধর্মী।

রাসূল (ﷺ) এর সীরাহর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলেই আমরা দেখতে পাব যে, একজন নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সফল হওয়ার কারণ হলো তিনি মানুষের মনে কী চলছে তা ধারণা করতে পারতেন। তাঁর মানুষের সাথে বোঝাপড়া করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এতে ছিল সহানুভূতি এবং বাস্তবধর্মী অন্তর্জ্ঞানের চমৎকার এক সমন্বয়। তিনি জানতেন কার সাথে চুক্তি করতে হবে এবং কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তিনি জানতেন কাদের হাতে অঢেল সম্পদ ঢেলে দিতে হবে আর কাদেরকে কিছু কম দিলেও চলবে। তিনি যে কারো মুখের কথাকেই বিশ্বাস করে

নিতেন না। কারণ তিনি মানবচরিত্রের দুর্বলতাগুলো জানতেন। কারো কথায় মোহগ্রস্ত না হয়ে তিনি এই ব্যাপারগুলো খুব বাস্তবসম্মত পন্থায় সামলাতে পারতেন। তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী। যেমন- আবু আযযা আল-জুমাহী নামে এক মুশরিক ছিল যে বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে। সে ছিল হতদরিদ্র আর তাকে তার বড় সংসারের দেখাশোনা করতে হতো, তাই রাসূল (ﷺ) সেবারের মতো এই শর্তে তাকে মুক্তি দিলেন যে, সে ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শত্রুতায় জড়াবে না। কিন্তু, ঠিক এক বছর পরেই সে উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে মুসলিমদের হাতে আবার বন্দী হয়। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শহীদ হন। আবু আযযা আবার কাকুতি-মিনতি করে আবদার করল যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে বদরের মতো এবারও অঙ্গীকার করল যে, ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কখনও সে যুদ্ধে অংশ নেবে না। কিন্তু এবার, রাসূল (ﷺ) ছিলেন কঠোর। তিনি বললেন, "মুমিনরা এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না"। এ কথা বলার পর আয-যুবাইর (رضي الله عنه) আবু আযযাকে হত্যা করেন। কারণ, যতই অনুনয়-বিনয় সে এবার করুক না কেন, নিশ্চিতভাবেই তার অঙ্গীকার সে আবারো ভঙ্গ করত এবং সে আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করত। কিন্তু খেয়াল করুন যে, রাসূল (ﷺ) তাকে বদরের পর একটি সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে সদিচ্ছার উপস্থিতি বোধ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাজেই, এই আয়াতটি আমাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়। অনেকেরই মুখের কথা আর অন্তরের কথা এক নয়। তাদের সাথে বোঝাপড়ায় এই জ্ঞান কাজে দেয়। এ আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, এমন কারো মুখের কথা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় যা পরবর্তীতে আফসোসের কারণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধুনা বিশ্বের যে ঘটনাটি খুব করে আমাকে নাড়া দেয় তা হলো ওবামার সস্তা স্লোগান "change we can believe in"। এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমেরিকান মুসলিমদের তার সমর্থনে মেতে ওঠা বরাবরের মতোই আমেরিকান মুসলিমদের সবকিছু অতি সহজে হজম করার অভ্যাসের পরিচায়ক। এটা ছাড়াও কায়রোতে দেওয়া তার ভাষণ, তাতে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা এবং আরো অনেক কিছুই আমেরিকান মুসলিমদের মন অতি সহজে জয় করে ফেলেছে। এই ধরণের কূটচাল সম্পর্কে অবশ্য আল্লাহ্ আমাদেরকে অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "...তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি..."

পরবর্তীতে এলো মুসলিমদের হা করে শুধু দেখবার পালা। যে ওবামা মুসলিম বিশ্বের সাথে যুদ্ধে না জড়াবার অঙ্গীকার করেছিল, সেই ওবামাই মুসলিমদের সাথে যেন বুশ থেকেও আরো মারাত্মক ও তীব্রতর যুদ্ধে নামল। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরের ১৭ মাসে তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মুসলিম ভূমিতে প্রায়

১০০টি ড্রোন হামলা করা হয়েছে। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে এসব ড্রোন হামলায় হাজারেরও বেশি নিরীহ মুসলিম নিহত হয়েছে। বুশ তার সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদ জুড়ে যত ড্রোন হামলার অনুমোদন দিয়েছে, ওবামা ১৭ মাসেই মুসলিম বিশ্বে তার দ্বিগুণ ড্রোন হামলা চালিয়েছে! অনেকের কাছে এটি অবাক করা বিষয় হতে পারে। তবে যারা এই আয়াতের মর্মার্থ বোঝে এবং মুসলিম ও কুফফারদের ইতিহাস সম্পর্কে জানে তারা এটা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল।

সুবহানআল্লাহ! কি চমৎকার ভাবেই না ১৪০০ বছর আগে নাযিলকৃত একটি আয়াত আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছে!

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৩)

সূরাহ আলে ইমরানের ১২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন,

"তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে সেটা তাদের দুঃখ দেয়, আর তোমাদের কোনো অকল্যাণ হলে তারা আনন্দিত হয়, আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না ..."

এ আয়াতটি পড়ে আমি ইবনুল জাওযি (ﷺ)-এর সাইদুল খাতির বই (পৃষ্ঠা ১১৮) থেকে কিছু কথা যোগ না করে পারছি না। তিনি বলেন,

"জেনে রেখো, সবগুলো দিন সমান নয়। কখনও তুমি নিঃস্ব, কখনও বা তুমি ধনী, কখনও তুমি অপমানিত, আর কখনও বা তুমি মানী। কখনও তুমি দেখছ তোমার বন্ধুদের সুখে উল্লাসরত, কখনও বা তুমি দেখবে তোমার শত্রুরা আনন্দে উদ্বেলিত।

কিন্তু সত্যিকারের সুখী ব্যক্তি হলো সে, যে তার জীবনভর সকল পরিস্থিতিতে একটি আদর্শকে আকঁড়ে ধরে আছে। আর তা হলো আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অবলম্বন করা।

সে যদি ধনী হয়, তাকওয়া তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। সে যদি গরিব হয়, তাহলে তাকওয়া তার জন্য সবর করার দ্বার খুলে দেবে।

যদি সে স্বস্তি আর আয়েশের মাঝে জীবনযাপন করে, তবে এই তাকওয়া তার উপর বর্ষিত নিয়ামত পূর্ণ করবে। আর যদি সে কষ্ট আর দুর্ভোগের মধ্যে দিনাতিপাত করে, তবে এই তাকওয়া তাকে অলংকৃত করবে। তাকওয়া তার সঙ্গী হলে তার দিনগুলো ভালো চলুক বা মন্দ—তাতে তার কিছুই আসে যায় না। তার পরনের জামাটা ছেঁড়া হোক বা নতুন, সে অভুক্ত থাকুক বা তুষ্ট থাকুক—তাতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না। কেননা, এসব কিছুই যেকোনো সময়ে হারিয়ে যেতে পারে বা বদলে যেতে পারে।

কাজেই, তাকওয়া হলো নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী। সে নিদ্রা যায় না। বিপদের সময় তাকওয়া তোমার হাত ধরে রাখবে। সদাসর্বদা জেগে তোমাকে নিরাপদ রাখবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকওয়া অবলম্বন করবে। তাহলে শত টানাপোড়েনের মাঝেও তুমি স্বচ্ছন্দ থাকবে। কষ্টের মাঝেও তুমি স্বস্তি খুঁজে পাবে।"

তারা সকাল থেকে শুরু করে সমগ্র দিন কাজে লাগাতে চান, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে শরীরে যে আলস্য আর জড়তা জেঁকে বসে, তা কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। আমার মতো আরো অনেকেই মোটেও "ভোরের-পাখি" নন। তাহলে কীভাবে আমরা নিজেকে বদলাব? কীভাবে আমাদের প্রতিটি দিনকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারব?

প্রথমত, আমাদের নিজেদেরকে শৃঙ্খলার মাঝে নিয়ে আসতে হবে। ইশার সালাতের পর কাজকর্ম সীমিত করে ফেলতে হবে। ইশার পর বেশি দেরি না করে শুয়ে পড়তে হবে। সহিহ হাদিস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে - ইশার সালাতের পরে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এবং ইশার পূর্বে ঘুমানো- এ দু'টি কাজের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কেননা এই দু'টো অভ্যাস ত্যাগ করলে আমরা দ্রুত ঘুমাতে পারব। আর গাঢ় একটি ঘুমের পরে ঝরঝরে দেহ ও মন নিয়ে পরদিন সকালে জেগে উঠব। দ্বিতীয়ত, ভোরের কিছু আগে উঠে ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের মন ও মেজাজের উপর সরাসরি ছাপ ফেলে। বুখারি ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"ঘুমানোর সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি গিঁট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের স্থানে সে মোহর এঁটে দিয়ে বলে: তোমার রাত এখনো অনেক বাকি, অতএব ঘুমাও। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিকির করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে ওযু করে তো আরেকটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে সালাত আদায় করে, তো তার সবকটি গিঁটই খুলে যায়, ফলে সে ভোরবেলায় প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল থাকে। অন্যথায় সে অবসাদ ও আলস্য অনুভব করে।" (বুখারি: ১১৪২, মুসলিম: ৭৭৬)

এসব কিছু চিন্তা করার পর যখন উপরের আয়াতটির দিকে আবার তাকাই তখন বুঝি আল্লাহ তাআলা কেন বিশেষভাবে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই একটি আয়াত-ই আমাদের দিনগুলোকে আরো বেশি কর্মতৎপর করে তুলতে পারে, ইনশাআল্লাহ।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৫)

সূরাহ আলে ইমরানের ১৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"...আর যারা কোনো পাপ কাজ করার পর বা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে তাদের ক্ষমাকারী?"

সাধারণভাবে, তাওবা (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও ইস্তিগফারের (অনুশোচনা) সাথে বিষণ্ণতা ও অনুতাপের অনুভূতিগুলো জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর কাছে বান্দার তাওবাহ গৃহীত হওয়ার প্রথম শর্তই হলো উক্ত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও অনুশোচনা করা। আপনি ইবনুল জাওযির বইগুলো পড়লে কিছু কথা ঘুরেফিরে বারবার দেখতে পাবেন। তা হলো 'অনুতাপের অশ্রু' এবং 'অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা নিজের পাপমোচন'। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিজেকে বা অন্য কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতায় পতিত হতে দেখলে আমাদের তাতে দুঃখ পাওয়া উচিত।

কিন্তু আমি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে নির্দেশ করতে চাই। তা হলো, আপনি কোনো পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার পর যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্যত হন সেই মুহূর্তে আপনার দুঃখবোধ আনন্দের অনুভূতি দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া উচিত। হ্যাঁ, মুমিনের হৃদয় আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে অবশ্যই দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে। কেননা পাপে লিপ্ত হওয়া হচ্ছে একটি খাঁচায় বন্দী হওয়ার মতো। আর সেই পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করা এবং আল্লাহর কাছে সেজন্য ক্ষমা চাওয়া হলো সেই খাঁচার দরজা খুলে মুক্ত হওয়ার চাবি। ভেবে দেখুন আপনি যখন কোনো খাঁচা থেকে মুক্তি লাভ করবেন তখন আপনার স্বাভাবিক অনুভূতিটি হবে আনন্দ এবং সুখমিশ্রিত। কোনো কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার সময় কেউ দুঃখ বোধ করে না। কাজেই, তাওবাহ এবং ইস্তিগফারের পর আপনার স্বাভাবিক অনুভূতি হওয়া উচিত মুক্তির আনন্দমিশ্রিত। পাপকর্মের দুঃখে অনুতপ্ত হবেন কিন্তু পাপ কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুশোচনা যেন আপনার মাঝে মুক্তির বোধ তৈরি করে।

প্রকৃতপক্ষে, পাপকাজের জন্য আপনার অনুশোচনা অন্য কারো জন্য নয় বরং স্বয়ং আল্লাহর জন্য আনন্দের এক উপলক্ষ। আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মনে কর, তুমি মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, এমতাবস্থায় তোমার খাদ্য-পানীয়সহ তোমার উটটি হারিয়ে গেল, তুমি সেটিকে ফিরে পাবার সমস্ত আশা ছেড়ে

দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছ। হঠাৎ তোমার উটটিকে তুমি তোমার সামনে দেখলে পেলে! এই অবস্থায় তুমি যতটা না খুশি হবে, তুমি কোনো পাপ করে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হলে তিনি তার থেকেও বেশী খুশি হন।"

সুতরাং, মহান ক্ষমাশীল আল্লাহ যেখানে আপনার অনুশোচনায় খুশি হন, সেখানে যাকে ক্ষমা করা হচ্ছে সেই আপনার তো তাওবাহ করার পর আনন্দিতই হওয়া উচিত।

তাই তাওবাহ এবং ইস্তিগফার আমাদের জীবনে আকাঙ্খিত বিষয় হওয়া উচিত। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাওবাহ ও ইস্তিগফার করুন মুক্তির আনন্দে।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৬)

সূরাহ আলে ইমরানের ১৩৯ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

উক্ত আয়াতটিই আমাদের সময়ের স্লোগান হওয়া উচিত।

কিছু পশ্চিমা দাঈ তাদের লেকচারে হুদায়বিয়ার সন্ধি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মাক্কী জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয় মুসলিম উম্মাহর চলমান অধঃপতিত ও দুর্বল অবস্থাকেই যেন তারা নিজেদের নিয়তি হিসাবে মেনে নিয়েছেন। এমন একটা ভাব যেন এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের কিছুই করার নেই। এই চিন্তাধারাটি আমাকে ক্ষুব্ধ করে। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ICNA এর এক কনভেনশনে একজন দাঈ ইসলামের কিছু স্পর্শকাতর বিষয় উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, "এককালে আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারতাম!" সাথে সাথে তিনি ও উপস্থিত অন্যান্যরা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। আমি দর্শকসারিতে বসে আনমনে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভাবছিলাম, "আশ্চর্য! আপনি আপনার লেকচারে ইসলামের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন না এতে হাসির কী আছে! এর থেকে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, ইসলামের একজন দাঈ হয়েও আপনি আজকে একজন অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছেন?" তখন এই আয়াতটি আমার কানে বাজছিল।

কিন্তু এই আয়াতটিই কেন? কারণ উহুদের যুদ্ধের এক ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মুহূর্তে এই আয়াতটি নাযিল হয়। সাহাবিদের অনেকেই তখন মনোবল হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। তাদের মনে লুকিয়ে থাকা ভয় এবং দুর্বলতা—এই দুটি সহজাত অনুভূতির দিকে নির্দেশ করে এই আয়াতটি বলছে, ভীত হয়ো না, ভেঙে পোড়ো না। এই আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকাটাই প্রকৃত বিজয়। যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয় তো বাহ্যিক পরাজয়, এটি সাময়িক ব্যাপার। কাজেই মুমিনদের হতাশ বা দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বা নিজেদের দুর্বল ভাবার কোনো অবকাশ নেই।

আজকের দিনেও এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং শক্তিহীনতা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদেরকে

দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা সত্যিকারের যুদ্ধ হলো মনস্তাত্ত্বিক। মন এবং মগজই হচ্ছে যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র। যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত ঈমানধারী মুসলিম আছে ততদিন আমরা দুর্বল নই। বাহ্যিকভাবে আমাদের পরিস্থিতি যতই নড়বড়ে হোক না কেন।

যদি কোনো ব্যক্তি, সমাজ, জাতি অথবা উম্মাহ বৈষয়িক দিক থেকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী হয় অথচ তার নিজস্ব চেতনা বা ঈমান-আকিদার সাথে আপস করে ফেলে, তবে সে বাহ্যিক সফলতা নিরর্থক। আবার, বাহ্যিক সাফল্যের পরোয়া না করে যদি ঈমানের ব্যাপারে আপসহীন থাকা যায়, তখনও বাহ্যিক সাফল্য গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, যখনই কোনো সাম্রাজ্য তার নিজস্ব চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে প্রতারণা করে তখনই তার পতন ঘটে। আর তাই উহুদে সামরিকভাবে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদেরকে আল্লাহ জয়ী বলেছেন, কেননা তারা নিজেদের চেতনা ও বিশ্বাসের উপর ছিলেন বলীয়ান। তাই, আজকে মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তা হলো মতাদর্শের যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক জগতের হৃদয় ও মননের যুদ্ধ (battle for hearts and minds)।

আজকে মুসলিম উম্মাহকে পরাজিত করার লক্ষ্যে কুফফাররা আমাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছে। তারা দিনে রাতে কাজ করে চলেছে ইসলামের জীবনীশক্তি, আমাদের শক্তির আসল উৎস, "ঈমান" কে আমাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে। কারণ এই ঈমান পশ্চিমাদের দাসত্বের কলুষতা থেকে মুক্ত। তারা চায় আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতাকে নিয়তি ভেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই। এভাবে তারা আমাদের কেবল বাহ্যিকভাবে নয়, বরং অন্তরকেও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে চায়। আমাদের উচিত আমাদের এই দুর্বল জায়গাগুলো সারিয়ে তোলা। আমাদের মনে রাখতে হবে, গোলামির কলুষতা থেকে মুক্ত ঈমান বুকে ধারণ করার কারণেই আল্লাহ সাহাবিদের সম্মানিত করেছেন, যদিও দুনিয়াবী শক্তির বিবেচনায় তারা ছিলেন দুর্বল। আজকেও আমরা একইভাবে সম্মানিত হব, যদি আমরা পশ্চিমাদের দাসত্বের মনস্তাত্ত্বিক বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের মনে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে চান যে, বস্তুগতভাবে আমরা যতই দুর্বল হই না কেন, আমাদের হৃদয়ে জেঁকে বসা ঔপনিবেশিক দাসসুলভ মানসিকতার (mental colonialism) কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারলে এবং আমাদের হৃদয় ও মনকে এই হীনম্মন্যতা থেকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে আমরাও সম্মানিত হব। এই আদর্শিক যুদ্ধজয় তখন অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। জেলখানাতে আমার কয়েক সেল পাশে 'জো' নামে এক মাদকব্যবসায়ী ছিল। কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতারের আগে সে কেমন করে তার মাদক ব্যবসা চালাত, সেটা নিয়ে জো আমাকে অনেক গল্প বলেছিল।

গল্পের শেষে জো দুঃখের সাথে বলেছিল, "এখন সরকার আমাদের সাথে ইচ্ছামতো যা খুশি করতে পারে।"

আমি তাকে বলেছিলাম, "জো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসো?"

সে উত্তর দিল, "অবশ্যই, আমি তাকে ভালোবাসি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মনে কর কর্তৃপক্ষ তোমার উপর অনেক শারীরিক নির্যাতন চালাল। তারা কি তোমার মুখ থেকে এ কথা বের করতে পারবে যে, 'আমি আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করি'?"

সে বলল, 'পারতেও পারে।"

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে তারপরও কি তারা পারবে তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে স্ত্রীর প্রতি তোমার ভালোবাসাকে মুছে ফেলতে?"

জো উত্তর দিল, "কখনোই না।"

তখন আমি এই বলে কথোপকথন শেষ করলাম যে, "এজন্যই আসলে তারা যা খুশি তা করতে পারে না। কারণ তোমার হৃদয় তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

আল্লাহ বলেন,

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

সুতরাং, বাহ্যিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সর্বদা অগ্রগামিতা ধরে রাখা সম্ভব। কাজেই দাঈদের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে বারবার 'মাক্কী জীবন' আর 'হুদাইবিয়াহ'র তুলনা দিয়ে দুর্বলতা আর হতাশাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নেওয়ার বোধ তৈরি করে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং তাদের উচিত ভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা। কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদেরকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, বাহ্যিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তারা হীনমনা না হয়ে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখে। তাই, উক্ত আয়াতটি আমাদের আজকের দিনের স্লোগান হওয়া উচিত। আমাদের মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে আল্লাহর তাআলা এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।

এ বিষয়ে আরও পড়তে চাইলে:

• সাইয়্যিদ কুতুবের লেখা Milestones বইয়ের 'The Faith Triumphant' অধ্যায়।

• RAND কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম' (Amazon.com: Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies...)

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৭)

সূরাহ আলে ইমরানে, ১৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

"আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? ..."

কুরআনে হাতেগোণা অল্প কিছু আয়াত আছে, যে আয়াতের শব্দগুলো কোনো সাহাবির মুখে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ কুরআনে ওহী হিসেবে সেগুলোকে নাযিল করেন। এই আয়াতটি তেমনই একটি আয়াত।

উহুদের ময়দান। মুশরিকরা চারিদিক থেকে মুসআব ইবনু উমায়েরকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি সামনে তাকিয়ে দেখলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও বিপদের সম্মুখীন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেও ঘিরে ফেলেছে। তখন মুসআব (رضي الله عنه) নিজেই নিজেকে বলে উঠেন,

"আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন"

এর পরপরই মুসআবকে মুশরিকরা হত্যা করে। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ে মুসআব নয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মুশরিকরা হত্যা করেছে। এই বানোয়াট তথ্যটি যখন সাহাবিদের কাছে পৌঁছল তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে একটি দল এতটাই বিষাদগ্রস্ত এবং মনোবলহীন হয়ে পড়ল যে, তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেন। কেউ কেউ পালিয়ে মুনাফিকদের সাথে যোগ দিল। আর কেউ ছিল তাদের অবস্থানে অনড়। তারা বলল, "যদি আল্লাহর নবী মারা গিয়ে থাকেন, তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করে গেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে আমরাও লড়াই করে যাব"। মৃত্যু সংবাদের গুজব শোনার আগে এবং পরে তারা একইরকম অবিচল ছিলেন। মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় মুসআবের মুখ নিঃসৃত এ কথাগুলোকেই সম্পূর্ণ করে আল্লাহ কুরআনের আয়াত হিসাবে নাযিল করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসআবের এ কথাটির প্রতি সমর্থন জানান। ইসলামের সঠিক দাওয়াহর অনুসারীদের জন্য এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কোনো কিছু বিশ্বাস করা বা অনুসরণ করার পেছনে একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমন:

কিছু মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে থাকতে পছন্দ করে। তারা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে এবং আর দশজনের মতো করে চলতে চায়। তারা এমন একটা মানহাজ বা পদ্ধতির অনুসরণ করে যা তার বন্ধু এবং পরিচিতজনেরা মেনে চলছে।

কেউ কেউ নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস এবং মানহাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে। একটি ব্যর্থ হলে আরেকটি যাচাই করে। যেন তারা 'এ-সপ্তাহের-সেরা-আকর্ষণ' খুঁজতে ব্যস্ত!

কেউ কেউ আবার আবেগচালিত। হয়তো একটা অগ্নিঝরা বক্তৃতা বা উপস্থাপনা তাদেরকে আবেগাপ্লুত করে একটি বিশ্বাস বা মানহাজের দিকে ধাবিত করে। অনেকক্ষেত্রেই আবেগের সেই জোয়ারে ভাঁটা পড়লে তারা পুরোনো পথে ফিরে যান।

অনেকে একটি নির্দিষ্ট মানহাজ বা পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের ভালো-লাগা থেকে।

এই কারণগুলোই ব্যাখ্যা করে কেন রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর নিছক গুজব শুনেই একদল সাহাবি আশাহত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই আয়াতটি আমাদের এই মানবীয় দুর্বলতাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যদি আমরা ইসলামের যে মূল নির্যাস বা আদর্শ রয়েছে তার প্রতি অনুরক্ত বা আকৃষ্ট না হয়ে উপরোক্ত কোনো একটি কারণে ইসলামের অনুসারী হই, তবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ চাপের মুখেই আমরা ভেঙে পড়ব এবং পশ্চাদপসরণ করে বসব। আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে একজন নবী হিসেবে অবশ্যই ভালোবাসি, কেননা তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের মূল আনুগত্য এবং ভালোবাসা হতে হবে ইসলামের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি।

ইসলামের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া চলবে না। আর সে কারণেই, উহুদের দিনে বেশ কিছু সাহাবি ছিলেন যারা রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর গুজব শুনে পিছপা হননি বরং বলে উঠেছিলেন, "যদি তিনি মারা যান, তবে তিনি যে উদ্দেশ্যে লড়েছেন, আমরাও সে উদ্দেশ্যে লড়ে যাব।" অর্থাৎ সহজ ভাষায় তাদের মনোভাব ছিল, "তিনি মারা গেছেন তো কী হয়েছে? তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন আমরা সেটা অনুসরণ করছি। ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে আমরা অনুসরণ করিনি, বরং অনুসরণ করছি একজন নবী হিসেবে। তিনি একজন নবী, এর বেশি কিছু তিনি নন।" আর এ কারণেই, সাত বছর পরে যখন রাসূল (ﷺ) সত্যিই মারা যান, সেদিন আবু বকর (رضي الله عنه) উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করত, (জেনে রাখ) মুহাম্মদ (ﷺ) মারা গেছেন। আর তোমরা যারা আল্লাহর ইবাদাত কর, (জেনে রাখ), আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।" এরপর তিনি এই আয়াতটি আবৃত্তি করেন। তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে যে, আমরা ইসলামের সত্য আদর্শের কারণে মুসলিম। কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরাগ বা মোহ থেকে নয়।

পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিপূজা অত্যন্ত প্রবল। হোক তা গায়ক, নায়ক বা অন্য কোনো ধরনের খ্যাতিমান লোক। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই অভ্যাসটি ইসলামি দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে 'সুপারস্টার শাইখ বা স্কলার' এর একটি সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এটি জাহেলী সমাজের 'তারকাব্যক্তি পূজা'র (Celebrity Culture) বিকল্পরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্যক্তিপূজার ধারাটিকে ইসলামি ছদ্মবেশে বজায় রেখেছে। এই ধারাটির বিপদ দ্বিমাত্রিক।

❐ এক, এ ধরনের শাইখ বা আলিমের উচ্চারিত যেকোনো কথাকে চূড়ান্ত এবং বিতর্কের উর্ধ্বে ধরা হয় যাকে কোনোভাবেই চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। যদিও ইসলামের সত্য উদঘাটন ও প্রচারের অধিকার কোনো বিশেষ দলভুক্ত আলিম বা কোর্স ইন্সট্রাক্টরদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়!

❐ দুই, কোনো শাইখ বা নেতার প্রতি তাদের অনুসারীদের গভীর ভক্তি এবং অযাচিত আসক্তি থাকলে আরো যে সমস্যাটি হতে পারে তা হলো, যদি সেই নেতা বা শাইখ তার অবস্থান থেকে সরে আসে, কিংবা গ্রেপ্তার হয় কিংবা তার মৃত্যু ঘটে, তখন তাদের অনুসারীরা পথের দিশা হারিয়ে ফেলে এবং পিছু হটতে আরম্ভ করে। কিছু সাহাবিদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছিল। তারা কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মৃত্যুর খবর শুনে উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সমস্যার সমাধান হলো একটি মুক্ত, সমালোচক, বিশ্লেষণধর্মী এবং অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী হওয়া। এর ফলে আপনার আর সত্যের মাঝে কোনো বাধা থাকবে না। এবার সে সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন। এ ধরনের ইতিবাচক মানসিকতা আপনাকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে কেবল তা সত্য হওয়ার গুণেই। কে সেই সত্য বলছে তা আপনার কাছে আর মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে না। যেমন করে ইমাম আহমাদ (رحمه الله) বলেছিলেন, "একজন মানুষের জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তখনই, যখন সে অন্য কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে।" এবং সম্ভবত এ কারণেই, ইমাম আহমাদ তাঁর ক্লাসগুলোকে মুসনাদ থেকে হাদিস শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং তাঁর নিজস্ব মতগুলোকে লিখে রাখার ব্যাপারে খুব জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি চাইতেন তার ছাত্ররা যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মতামতের অনুসারী না হয়ে শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসারী হয়।

এটা খুবই দুঃখজনক যে, অনেক মুসলিম প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ উৎসাহী এবং উদ্যমী হওয়া সত্ত্বেও এই আয়াতের মূলভাব হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে নানান মানহাজের মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকে। আজকে তারা সালাফি, কালকে সূফী বা আশআরি, আরেকটা দিন হয়তো আসবে যেদিন তারা পুরো দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে ফেলবে। এই সবকিছুর পেছনে ফিরে তাকালে যে সমস্যাটি আমরা আবিষ্কার করব তা আমি উপরে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করেছি। মূলত, ইসলামের পথে তাদের প্রবেশের মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং ক্ষণিকের প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ। তাই প্রবল দ্রুততার সাথে তারা বারবার নিজেদের রঙ বদলায়। এর পেছনে মূল কারণ হলো, তারা নানান কারণে একসময় সত্যের অনুসারী হলেও সঠিক কারণটি অনুধাবন করে অনুসারী হয়নি। আর সত্যকে অনুসরণ করার সঠিক কারণটি হচ্ছে সত্যের বাণীকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

কাজেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অতিভক্তি এবং অপরিমিত শ্রদ্ধাবোধ থেকে সতর্ক হোন। মানুষ বদলায়, মৃত্যুবরণ করে। তাই, ইসলামি দাওয়াহর মূল বার্তাকে অধ্যয়ন করুন এবং ভালোবাসুন। ইসলামের মূল বার্তা দ্বারা আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হোন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন নয় বরং এই দাওয়াহর মূল উৎসের প্রতি আন্তরিক হোন। কেননা, মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই আদর্শ মৃত্যুঞ্জয়ী। এই আদর্শ অপরিবর্তনীয়।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৮)

সূরাহ আলে ইমরানের ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

"...তাই আল্লাহ তোমাদের উপর দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে, তার (কোনোটার) জন্য তোমরা অনুশোচনা না কর..."

এই আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে নাযিল হলেও এর নিহিতার্থ আমাদের বর্তমান জীবনে খুবই পরিষ্কারভাবে প্রয়োগযোগ্য। মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে যত পায় ততই চায়। আর তার চাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার দুশ্চিন্তা। কারণ আরও বেশি না পাওয়ার ব্যর্থতা তাকে বিমর্ষ করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন,

"মানুষকে এক পাহাড় স্বর্ণ দেওয়া হলে সে অনুরুপ আরেকটি পাহাড় চাইবে। আর তাই কবরের মাটি ছাড়া কোনো কিছুই তাকে তুষ্ট করতে পারবে না।" (বুখারি, আস-সাহিহ, রিকাক অধ্যায়, হাদিস নং-৬০৭৪)

তাই আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে খাদ্য, অর্থ, স্বাধীনতা, পরিবার কিংবা সুস্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন নিয়ামত থেকে কিছু সময়ের জন্য বঞ্চিত করেন। এই পৃথিবী এবং তার আরাম-আয়েশের প্রতি আমাদের চির-অতৃপ্ত বাসনাকে নষ্ট করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। আমরা কোনো কিছুকে যখন যেভাবে চাই সেভাবে পাওয়ার পরিবর্তে যখন কোনো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হই, তখন সেই অভিজ্ঞতাটি আমাদের ভবিষ্যতে যেকোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করে তোলে। এই আয়াতটিতে ঠিক একথাটিই বলা হয়েছে। আগেও এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা যা চাই সেটা না পাওয়ায় কিংবা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাই না তার সম্মুখীন হতে বাধ্য হলে আমরা আর মুষড়ে পড়ব না। কারণ আরাম-আয়েশ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমাদের নির্ভরতার শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াতটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিষণ্ণতাকে নিরুৎসাহিত করা। অপ্রাপ্ত সাফল্য কিংবা আপতিত অকল্যাণ নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। এতে কোনো উপকার হওয়া তো দূরের কথা, বাস্তবতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হয় না। বরং ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর ভাষায়, বিষণ্ণতা মানুষের সংকল্পকে দুর্বল করে দেয় ও

হৃদয়কে ভঙ্গুর করে তোলে। যা তার উপকারে আসবে এমন কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং বাস্তবতাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই যখন আপনি বিষণ্ণ অনুভব করবেন তৎক্ষণাৎ সেই অনুভূতিকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহর প্রশংসা, ধৈর্য এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি, তাঁর প্রতি দৃঢ়তর ঈমান এবং 'ক্বদ্দরাল্লাহ ওয়া মাশা-আ ফা'আল' (আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই সিদ্ধান্ত দেন) এই বাক্যাংশটি উচ্চারণের দ্বারা সেই অনুভূতিকে প্রতিস্থাপন করুন। এটাই হচ্ছে তাওহীদের চশমা দিয়ে যেকোনো বিপর্যয়কে দেখার ফলাফল।

তৃতীয়ত, এই পৃথিবী তো বিপদ-আপদমুক্ত হওয়ার কথা ছিল না। শুধু জান্নাতই হবে সবরকম সঙ্কটমুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল (ﷺ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কী। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আইশা (ؓ)। অথচ পার্থিব জগতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সত্তাটির প্রতি তাঁর ভালোবাসাও কিন্তু ত্রুটিহীন ছিল না। কারণ আইশা (ؓ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ঘটনাটি কিছুটা হলেও আইশা (ؓ)-এর প্রতি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালোবাসাকে দ্বিধান্বিত করেছিল। এই ঘটনার মাঝেও একটি নিগুঢ় বার্তা রয়েছে। আর তা হলো এই সকল সঙ্কটের উদ্দেশ্যই দুনিয়া থেকে আমাদের অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং অন্তরকে আখিরাতের দিকে যাত্রার অভিমুখী করে তোলা।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৯)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে সূরাহ আলে ইমরানের ১৫৬ নং আয়াতে বলছেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের সম্বন্ধে বলে, 'তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না'"

এবং ১৬৮ নং আয়াতে বলছেন,

"...যারা (ঘরে) বসে থেকে নিজেদের ভাইয়ের সম্বন্ধে বলতে লাগল, আমাদের কথা মতো চললে তারা নিহত হতো না..."

উপরের আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এই মুনাফিকরা উহুদের ময়দানে মুসলিম বাহিনী থেকে বের হয়ে গিয়ে দর্শকের ভূমিকায় মুসলিমদের যুদ্ধ করতে দেখতে থাকে। তারা যুদ্ধরত মুমিনদের দেখে মনে মনে ভাবতে থাকল যে, দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকাটাই বিচক্ষণতা। আর মুমিনদের যারা দ্বীনকে রক্ষা করা ও বিজয়ী করে তোলার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছে, তারা যেন বোকার মতো নিজেদের জীবনটা নষ্ট করছে! এই আয়াত দুটিতে মুনাফিকদের মানসিকতার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।

সত্যের দিকে মানুষকে ডাকতে গেলে কষ্ট ও বিপর্যয় নেমে আসবেই। এই কষ্ট সহ্য করতে পারাটাই একজন প্রকৃত সত্যান্বেষীর পরিচয়। ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) দ্বীনের প্রচারে একজন দাঈর প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ স্তরের দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন: "(দাঈর পক্ষে সর্বোচ্চ ত্যাগ হলো) আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিতে গিয়ে যাবতীয় বিপর্যয় ও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বাধা-বিপত্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য সহ্য করে যাওয়া।" এছাড়াও আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরাহ আল-আসরে আমাদেরকে দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের পথে সব বাধা-বিপত্তিতে ধৈর্যশীল হতে জোর দিয়ে বলেছেন:

"সময়ের শপথ! সমস্ত মানুষ মহা ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে; কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, সত্যের প্রচারক, আর ধৈর্যধারণে উৎসাহ দান করে।" (সূরাহ আল-আসর)

অতএব একজন মুসলিম যেচে পড়ে কষ্ট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে না সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এমন হয় যে, সত্যপ্রচারের পথে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে আর কোনো উপায় নেই, তবে একজন মু'মিন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে স্বেচ্ছায় সে পথেই এগিয়ে যাবে। কেননা আলোচিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন প্রচারের জন্য সকল কষ্ট মেনে নেওয়ার এই ইচ্ছাই তার ঈমান ও নিফাকের মধ্যে পার্থক্যকারী।

আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়া, নিরাপদ জীবন চাওয়া, এগুলো আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং আইশা (ﷺ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ব্যাপারে বলেছেন, "তাঁর সামনে যখন দুটো রাস্তা খোলা থাকত, তখন তিনি দুটোর মাঝে সহজটাই বেছে নিতেন, যদি না সেই সহজ পথে আল্লাহর অবাধ্যতা থাকে।" কিন্তু যখন এমন হতো, দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে কুফফারদের কাছ থেকে কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতেই হবে এবং নিজের আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিতে হবে, তখন কি তিনি আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতেন? নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন।

তিনি বা অন্য কোনো নবী কি কখনো নিজেদের নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের কথা ভেবে সত্য প্রচারে পিছু হটেছিলেন? আজকাল ইসলামের অনেক দাঈ সত্য গোপন করার পিছনে একটি খোঁড়া যুক্তি দাঁড়া করান যে, "এটা করলে আমাদেরকে অচিরেই শত্রুর হাতে ধ্বংস হতে হবে, বরং এ থেকে বিরত থাকলে সামনের দিনগুলোতে আমরা দ্বীনের উপকারে আসতে পারব"। নবীদের কেউ কি এসব খোঁড়া অজুহাত দিয়েছেন? কক্ষণো না।

বদরের সেই দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা স্মরণ করে দেখুন, যুদ্ধের আগে তিনি আল্লাহর কাছে কী ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! মুমিনদের এই দল যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরাজিত হয়, তোমার ইবাদাত করার জন্য আর কেউই অবশিষ্ট থাকবে না"। অন্য ভাবে বলা যায়, তিনি জানতেন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ মানে মুমিনদের জীবন নয়, খোদ ইসলামের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া। আরাম-আয়েশ পরিত্যাগের বিষয়টি বাদই দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বিপদের আশংকায় সাহাবিদেরকে নিজেদের মালামাল গুটিয়ে মদীনায় ফিরে যাওয়ার কথা একটিবারের জন্যেও মুখে এনেছিলেন? তিনি এমনটি করেননি। বরং নির্ভীকচিত্তে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবেলা করেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছিলেন। এই ঘটনাটি সকল পরিস্থিতিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয় এবং আমাদের নিজেদের চিন্তার ধরন কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়।

সমগ্র পৃথিবী আজ পুঁজিবাদীদের 'যার যার তার তার' (every man for himself) চিন্তাধারা দ্বারা মগজধোলাইকৃত। এই চিন্তাধারা একজন মানুষকে শুধু তার

স্বার্থোদ্ধারের জন্য কোনো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা মুনাফিকদের মুখেও ঠিক একই ধাঁচের কথা শুনতে পাই। তাদের ভাষ্যমতে, সত্যের পক্ষে দাঁড়ালে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে আমাদের সেই সত্যের দরকার নেই। তাই তারা ঘরে বসে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করে যাওয়া মুসলিমদের নিয়ে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠে। তাগুতের রোষানল থেকে নিরাপদে ঘরে বসে থাকার পরিবর্তে 'অকারণে নিজেদের জীবন নষ্ট করা' মুসলিমদের ধর্মান্ধ বলে তাচ্ছিল্য করে। দ্বীনের খাতিরে জান-মাল বিলিয়ে দেওয়া এদের চোখে নেহায়েত অপচয় বলে ঠেকে, আর তাই তারা 'সহজ', 'হিকমাহপূর্ণ' ও 'বাস্তবসম্মত' - এই শব্দগুচ্ছের আড়ালে এমন এক আরামের পথ বেছে নেয়, যে পথে কোনো বিতর্ক বা আদর্শিক দ্বন্দ্বের ঠোকাঠুকি নেই। এটাই অতীত ও বর্তমানের মুনাফিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা সর্বদা আত্মোৎসর্গের তুলনায় আত্মরক্ষা করতেই সদা তৎপর।

ইবনু আব্বাস (ﷺ) একবার বলেছিলেন যে, "আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবচেয়ে উদার ব্যক্তি"। তাঁর উদারতার উদাহরণ দেখাতে গিয়ে আমরা দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দানশীলতার উদাহরণ টেনে আনি। অথচ আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর উদাহরণ দেয়া যায় যেটি নিয়ে আমরা সচরাচর ভাবি না। আর তা হলো সত্যের প্রচারে কোনো বাধা-বিপত্তির পরোয়া না করে তাঁর নিজের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য যেখানে স্বার্থপরতা, আর নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিঃস্বার্থতা। প্রতিটি মুসলিম সংগঠন, নেতা, দা'ঈ, এমনকি সাধারণ মুসলিম- প্রত্যেকের উচিত নিজেদের দিকে একবার ফিরে দেখা, নিজেদেরকে প্রশ্ন করা। পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার প্রভাববলয় থেকে কি তারা নিজেদের দ্বীনের কাজকর্মকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? তারা কি পেরেছেন দ্বীনের মূলনীতিগুলোকে সততার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখতে? নাকি নিজের গা বাঁচানোটাই তাদের কাছে মুখ্য? যদি বলা হয় 'আরাম-আয়েশ অথবা দ্বীনের কল্যাণে ঝুঁকি' - এ দুয়ের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নাও - তবে তারা কোনটিকে বেছে নিতে প্রস্তুত? তাঁরা কি নিজেদের ক্ষণস্থায়ী চাহিদাকে অধিক গুরুত্ব দেবেন, নাকি আল্লাহর দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সঠিকভাবে একে তুলে ধরার প্রয়াসে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দ্বীনের দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হবেন? তাঁরা কি মুনাফিকদের আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন নিজেদের মাঝে ঘটাবেন, নাকি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পথকে বেছে নিবেন? কোনটি বেছে নেবেন তারা? আদর্শ নাকি আত্মরক্ষা?

সূরা আল-বুরুজ এর 'আসহাবুল উখদুদ' (গর্তের অধিবাসী) গল্পটির ব্যাপারে সাইয়্যিদ কুতুব (ﷺ) বলেছিলেন:

"এই ঈমানদার মানুষগুলো নিজেদের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়ে দুনিয়ার জীবন লাভ করতে পারত সত্যি, কিন্তু তাতে তাদের আর পুরো মানবজাতির লাভ থেকে ক্ষতির পাল্লাটাই কি অনেক বেশি ভারী হতো না? তাঁরা বেঁচে থাকলেও তাঁরা একসময়

পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতেনই। অথচ ঈমান বিসর্জন দিলে তার সাথে তারা একটি মহাসত্যকেও গলা টিপে হত্যা করত। কিন্তু তাঁরা তা হতে দেয়নি। ঈমানের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

ঈমান ছাড়া জীবন মূল্যহীন, আর স্বাধীনতা ছাড়া জীবন হয় মর্যাদাহীন। আর জালিমদের যদি শরীর ও আত্মার উপর আধিপত্য করতে দেওয়া হয়, তাহলে সে জীবন হয় লাঞ্ছনার। এই মহাসত্যটিকে তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সমুন্নত রেখে গেছেন।"

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২০)

সূরাহ্ আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন –

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে..."

কিছু কিছু দিক দিয়ে আমরা সবাই একইরকম। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তাঁর রহমত ও নিয়ামত দান করেছেন, বেশি হোক আর কম হোক। আমাদের যতটুকু আছে তার চাইতে আরো বেশী পেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। মুখে আমরা যাই বলি না কেন – যখন আমাদের নিজের কোনো জিনিস ত্যাগ করতে হয়, তখন আমরা সবাই সামান্য হলেও দ্বিধা বোধ করি। আমরা সবাই খুব ভালোমতো বুঝি আল্লাহর জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করার গুরুত্ব কী ও এর মূল্য কত বড়। সেটা হতে পারে দরিদ্রকে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করা, কিংবা হতে পারে আল্লাহর পথে অন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করা। আমরা কৃপণতা করি বা না করি আমাদের এই উপলব্ধিগুলো কিন্তু সার্বজনীন।

এই কৃপণতাকে পাশ কাটিয়ে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলো ঝেড়ে ফেলে আরও উদার হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কী?

সবচাইতে সহজ উপায় হলো, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপে আল্লাহর যেই নিয়ামতগুলো আপনি ভোগ করছেন সেগুলো এক এক করে গুণতে শুরু করুন। সেটা হতে পারে মনে মনে, মুখে মুখে, বা কাগজে লিখে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যেই নিয়ামতগুলো আপনি ভোগ করছেন তার একটা লিস্ট বানানো শুরু করে দিন। সবচেয়ে ছোট এবং আপাত দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর নিয়াতটাও লিস্টে টুকে রাখুন...

আপনার জীবন, আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাস, আপনার দৃষ্টিশক্তি এবং আপনার শরীর সম্পর্কিত সব কিছু, বাড়ি-গাড়ি, পোশাক-আশাক, খাবার এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাজকর্ম, মসজিদ এবং আপনার সমাজ ও সামাজিকতা সবকিছুই তালিকাবদ্ধ করুন। আপনার স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা, জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলো, আপনার প্রতি আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা, ইসলাম, বিশুদ্ধ বাতাস, ঠাণ্ডা পানি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার

অনুভূতি – যেই দয়া, উদারতা ও ভালোবাসা আপনি অন্য মানুষের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন সেসব কিছুকেও হিসাবে আনুন। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে এরকম অসংখ্য নি'আমত আপনি ভোগ করছেন, যেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না।

কিছুদিন আগে আমি ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম, যেটাতে ইন্ডিয়া ও আফ্রিকার কিছু জায়গায় পানি স্বল্পতার জন্য কি কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব জায়গাতে প্রতিদিন সকালে, প্রত্যেক পরিবারের মায়েরা হেঁটে ছয় ঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়ার পর এক কলসি পানি যোগাড় করেন। তারপর তারা সেটা বয়ে আনেন। তারপর সেই এক কলসি পানি দিয়ে পুরো পরিবারের খাওয়া, গোসল ও রান্নার কাজ সারতে হয়, কেননা পানির আর কোনো উৎস তাদের হাতের নাগালে নেই!

অথচ এই কারাগারের সেলেও শুধু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা হেটে গিয়ে বেসিনের একটা বোতাম চাপলেই আমি সেকেন্ডের ব্যবধানে ইচ্ছামতো বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা পানি পেতে পারি। প্রথম দৃষ্টিতে আপনাদের কাছে হয়তো এটাকে একটা অভিশাপ মনে হবে, কারণ আমি কারাগারে। কিন্তু ইন্ডিয়া আর আফ্রিকার সেই মায়েদের সাথে তুলনা করুন একবার! তারা তো এত সহজে বিশুদ্ধ পানি পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তখনই বোঝা যায়, কারাগারে সেলে বসেও আমি প্রতিদিন যেসব নিয়ামত ভোগ করছি তার মধ্যে এই পানি একটি। চিন্তা করে দেখুন, জেলে বসে আমি যদি এরকম নিয়ামত ভোগ করি, তাহলে বাইরের স্বাধীন, মুক্ত জীবনে আপনার নিয়ামতের লিস্টটা কতো লম্বা হবে!

কাজেই এই নিয়ামতগুলোর তালিকা তৈরি করে ফেলুন। লিস্ট যত বড় হবে আপনি তত গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন, আপনার চোখের সামনে থেকেও কত কী আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। আপনার নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও এতদিন এই অসাধারণ আশীর্বাদগুলো নিয়ে আপনি সামান্যতম চিন্তাও করেননি। তারপর আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনি এই সবের কিছুই পাওয়ার যোগ্য নন। এসব কিছুই আপনার প্রতি আল্লাহর তাআলার রহমত। তিনি তাঁর অসীম করুণার বশে আপনাকে এগুলো দান করেছেন। এর কোনোটার উপরই আপনার কোনো অধিকার নেই। আপনি যখন আপনার লিস্টের উপর বারবার চোখ বোলাবেন এবং দেখতে পাবেন কীভাবে আপনার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম ভালোবাসা, উদারতা ও করুণায় আপনাকে একটার পর একটা নিয়ামত দান করেছেন – তখন আপনি আপনার হৃদয় ও মনে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

মানুষের স্বভাব হলো, তার সাথে যেমন ব্যবহার করা হয়, অন্যের সাথে সে তেমনই ব্যবহার করে। সারাজীবন যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয় তাহলে

আপনার স্বাভাবিক প্রবণতা হবে মানুষের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করা। কারণ আপনি তেমনটাই শিখে এসেছেন। একইভাবে সারাজীবন যদি আপনি উদারতা, দয়া ও করুণা পেয়ে আসেন, তাহলে আপনি মানুষের সাথে সেভাবেই আচরণ করবেন; কারণ আপনি সেই শিক্ষাই পেয়েছেন। আমাদের সমস্যা হলো, আল্লাহ্ প্রতিনিয়ত আমাদের দয়া, করুণা ও উদারতা দেখাচ্ছেন। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি সেকেন্ডে তিনি আমাদের পরম মমতায় ঢেকে রেখেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই আমরা এটা মনে রাখি না, কিংবা মনে রাখলেও এই করুণার পরিধি ও মাত্রা নিয়ে চিন্তা করি না।

তাই আমাদের উদার ও দানশীল হওয়ার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বাধাটি হলো, আমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা। যত বেশী আপনি আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে আবিষ্কার করবেন, গুণতে থাকবেন এবং আপনি যতো উপলব্ধি করবেন যে এই অসংখ্য নিয়ামতের কোনোটারই আপনি যোগ্য নন ততোই আপনি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত থেকে অপরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন। উদারতা ও দানশীলতাকে ভালোবাসতে শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় এটাই।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২১)

আল্লাহ্ তাআলা সূরাহ্ আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলেন,

"...আর এই পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়"

আয়াতের এই অংশটি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে চাইলে, দৈনন্দিন যেসব টুকরো সুখের মুহূর্তগুলো আপনি উপভোগ করেন সেগুলো উপভোগ করার আগে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ান। দগ্ধ দিনের শেষে শীতল পানির স্পর্শ, হিমশীতল পানীয় কিংবা সুস্বাদু খাবার, মোটা অঙ্কের চেক কিংবা চোখ ধাঁধানো গাড়ি অথবা আনকোরা নতুন পোশাক প্রভৃতির সুখস্পর্শ উপভোগ করার আগে একবার থামুন এবং ভাবুন। উপলব্ধি করুন যে আপনার সামনে যেই উপভোগ্য বস্তুটি আছে তা বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুটি সৃষ্ট, স্পৃশ্য এবং বাস্তব হলেও এর সাথে আরও সুগভীর এবং গুপ্ত এক বাস্তবতা সংযুক্ত রয়েছে। এই গোপন বাস্তবতাটির ব্যাপারে অসচেতন হলে আপনি ধোঁকায় পড়ে থাকবেন। যে ধোঁকার কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে এই গোপন বাস্তবতাটি ঠিক তার বিপরীত। এই ধোঁকার পাশাপাশি এই বাস্তবতা সম্পর্কেও আমাদের সমান ভাবে সচেতন থাকা উচিত।

পার্থিব এই ধোঁকার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে যে, এটি আমাদের মধ্যে নিজেদেরকে ক্ষমতাধর ভাবার এক মিথ্যে আত্মতুষ্টি তৈরি করে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বেশি ঘটে। ১৯১২ সালের কথা মনে করুন। সেবছর টাইটানিক নির্মাণ করা হয়েছিল। এর নির্মাতারা দাবি করেছিল যে, "স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও এই জাহাজ ডুবাতে পারবেন না।" ক্ষণিকের আরাম-আয়েশ আর স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকলে, নিরাপত্তা আর অপরাজেয়তার এক মিথ্যা ধারণা খুব সহজে মানুষের অন্তরে জেঁকে বসে। তাই টাইটানিকের নির্মাতারা আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত এই জাহাজ তৈরি করতে পেরে এই একই ফাঁদে পা দিয়ে বসে। অবশেষে আর কেউ নয়, যখন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই এক টুকরো বরফ খণ্ড দিয়ে টাইটানিক ডুবিয়ে দেন তখন তারা তাদের ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারে। কি নির্মম পরিহাস! যে পানির উপর টাইটানিকের চলার কথা ছিল সেই পানি দ্বারা গঠিত এক খণ্ড বরফই এটাকে ডুবিয়ে দিল!

আমেরিকান ব্যাংকগুলোর দায়িত্বজ্ঞানহীন অপচয় এবং লোভের ফলে আমেরিকায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার দিকে লক্ষ করুন। জাগতিক ধোঁকায় পড়ে থাকা হৃদয়ে ক্ষমতার

যে মিছে আত্মতৃপ্তি জন্ম নেয় তার প্রকৃষ্ট ফলাফল হচ্ছে আজকের আমেরিকা। আর পার্থিব এই আনন্দের মাত্রা যত বেশী হয় পরবর্তীতে সৃষ্ট দুর্দশার মাত্রাও একই হারে বৃদ্ধি পায়। ধরুন দু'জন উদ্বাস্তু লোক একটি খাবার দোকানের সামনে বসে আছে। দুজনেরই দোকানের ভিতরে ঢুকে কিছু কিনে খেতে ১০ টাকা প্রয়োজন। দোকান থেকে বের হওয়ার পর একজন ক্রেতা তাদের দেখতে পেল। কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু একজনকে তিনি ১০ টাকা দান করলেন। যাকে দান করা হলো সে নিশ্চিতভাবে নিজেকে তার সঙ্গীর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান এবং কর্তৃত্বময় মনে করবে। শুধু ১০ টাকার পার্থক্যেই একজন মানুষের মনে এসব ধারণা তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাহলে ভাবুন আপনি আপনার জীবনে আরও কত-শত বিলাস উপভোগ করছেন, আপনার অন্তরে সেগুলোর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে! এই ধোঁকা দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা। উপলব্ধি করুন যে, আপনি একজন ক্ষমতাহীন জীব এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতার উৎস নেই।

পার্থিব ধোঁকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। তা হচ্ছে আপনি যা উপভোগ করছেন তা সবসময়ই আপনার কাছে থাকবে এমন ভেবে বসে থাকা। কোনো কিছু উপভোগ করার ঠিক আগ মুহূর্তে কি আপনার মনে কখনো এমন ধারণা উঁকি দেয় যে, যে বিলাসদ্রব্যটি আপনি উপভোগ করতে যাচ্ছেন তা চোখের পলকেই উধাও হয়ে যেতে পারে? আপনার হাতের হিমশীতল পানির গ্লাসটি উঁচু করে ধরে সূরাহ মুলকের শেষ আয়াতটির কথা ভাবুন,

"...তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা?"

আপনার স্ত্রী, স্বামী, সন্তান কিংবা বন্ধুদের সঙ্গ উপভোগ করার সময় কি কখনো মনে হয় এরা আগামীকাল জীবিত নাও থাকতে পারে? পরবর্তীতে যখনই তাদের সাথে সময় কাটাবেন তখন নিজেকে সূরাহ আর-রহমানের ২৬ নং আয়াতটি মনে করিয়ে দেবেন- "ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল"। যখন আপনার গাড়িটি গ্যারেজে রেখে আপনার বিশাল বাসার দিকে এগিয়ে যাবেন তখন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আপনার বাড়ির দিকে তাকিয়ে সূরাহ কাহফের ৩৩-৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত দুই বাগানমালিকের কাহিনি স্মরণ করুন। অনুধাবন করুন, আপনার এই সব সম্পত্তি মুহূর্তের ব্যবধানে নেই হয়ে যেতে পারে। ছোট-বড়, জীবিত বা জড় যা কিছুই আপনি উপভোগ করেন না কেন তার সবই উধাও হয়ে যেতে পারে। স্বস্তির যে প্রশান্তি আপনি অনুভব করছেন তা আপনার সামনে রাখা আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়ার ধোঁকা মাত্র।

পার্থিব ধোঁকার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি সত্যিকারের আনন্দ কোনটি তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। আমাদের মন এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, আমরা যদি দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ছোটখাট কিছু বা কোনো বিলাসদ্রব্যের পেছনে ছুটি এবং অবশেষে তা অর্জন করি তখন এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার কথা আমরা আর ভাবতে পারি না। মনে করুন আপনি মরুভূমিতে হারিয়ে গেছেন। আপনি বেশ কয়েকদিন ধরে কিছুই খেতে বা পান করতে পারেননি। হঠাৎ করে আপনি এক টুকরো শুকনো রুটি, বহু দিনের পুরোনো একটু পনির আর এক জগ কুসুম গরম পানি পেয়ে গেলেন। তীব্র ক্ষুধার জন্য এটুকুই তখন আপনার কাছে অমৃত বলে মনে হবে। আর এগুলো খেয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে করতে আপনার মনে হবে যে, এর চেয়ে বেশি আপনার আর কিছুই চাওয়ার নেই। আপনি এই বাসি খাবার দিয়ে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে এতটাই সন্তুষ্ট যে গরম রুটি, তাজা পনির এবং পরিষ্কার ঠান্ডা পানির কথা চিন্তাও করবেন না।

এই পৃথিবী আর পরকালের বিলাসদ্রব্যের মাঝে তুলনাটাও ঠিক এইরকম। আর একারণেই আয়াতটির উল্লেখিত অংশের আগের বাক্যটি হচ্ছে – "...যাকে আগুন থেকে বহুদূরে রাখা হবে ও স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করা হবে, নিঃসন্দেহ সে হলো সফলকাম ..."। এই আয়াতটি আনন্দ এবং উপভোগের ধারণাটিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। এই আয়াতটি আপনার সামনে বাস্তবতাকে উন্মোচন করে দিচ্ছে। তা হলো এই যে, এই পৃথিবীতে আপনি সম্ভাব্য যা যা উপভোগ করতে পারেন তার কোনোটিই জান্নাতের সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু পার্থিব জীবন আমাদের জন্য বাস্তব ও চাক্ষুষ। আর জান্নাতের জীবন সম্পর্কে আমরা শুধু কুরআন এবং হাদিস থেকেই জানতে পারি। তাই এই পৃথিবীর প্রতিটি আনন্দ উপভোগের আগে নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে, পরকালে যা আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে- সেটা জান্নাতের আমোদ হোক বা জাহান্নামের আতঙ্কই হোক - তার তুলনায় এই পার্থিব পুলক একটি বিভ্রম মাত্র।

পার্থিব প্রতারণা বনাম বাস্তবতার এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যদি আপনি আত্মস্থ করতে পারেন তবে তা আপনার ব্যক্তিত্বের উপর অত্যন্ত কার্যকর প্রভাব ফেলবে।

প্রথমটি আপনাকে বিনয় শেখাবে।

দ্বিতীয়টি আপনার যা আছে সেটাকে আরো মূল্যায়ন করতে শেখাবে।

তৃতীয়টি আপনার অন্তরকে পরকালের সাথে আরও দৃঢ় বন্ধনে যুক্ত করবে এবং এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের অসারতা থেকে আপনাকে মুক্ত করবে।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২২)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে সূরাহ্ আলে ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে বলছেন,

"নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের সম্পদ ও জীবনের দ্বারা ..."

কিছু লোকের জন্য এই পরীক্ষা হতে পারে দারিদ্র্য; কারো জন্য হতে পারে মারাত্মক কোনো শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা। আবার কিছু মানুষের জন্য তা হতে পারে ভালোবাসার মানুষকে হারানো। কারও জন্য বা বন্দীদশা। তবে আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে এটা একটা প্রতিশ্রুতি যে, তিনি আমাদের সবাইকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, কোনো একধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি অবশ্যই করবেন। আপনি নবী হোন কিংবা একজন খুনীর মতো ঘৃণ্য কেউ হোন, আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট এবং পরীক্ষা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীগণ যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তা ভালো করে খেয়াল করলে আপনার কাছে মনে হবে যেন আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই আপনার আমার জন্য এই জিনিসগুলোকে উদাহরণ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। যেন আমরা আমাদের সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি:

আদম (ﷺ) এর এক পুত্র আরেক পুত্রকে হত্যা করেছিল।

নূহ্ (ﷺ) এর এক পুত্র ছিল কাফির। পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছিল।

ইবরাহীম (ﷺ) এর বাবা ছিল এক অত্যাচারী মুশরিক।

ইউসুফ (ﷺ) কে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।

আইয়ুব (ﷺ) কে সম্মুখীন হতে হয়েছিল মারাত্মক ধরনের সব অসুখের।

ইয়াকুব (ﷺ) দুইবার সাময়িকভাবে পুত্রহারা হয়েছিলেন (একবার ইউসুফ (ﷺ), আরেকবার বিন ইয়ামিন)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একাধিক বার বিপন্ন হয়। তিনি তাঁর শিশু সন্তানদেরকে হারান, প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে হারান, প্রাণপ্রিয় চাচা তাঁকে

সেসব মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে, যারা নিজেরা যতটা না তারিফের যোগ্য, তারচেয়েও বেশি গুণকীর্তন খুঁজে বেড়াত।

একজন মুসলিমের নিজের উপর ততটুকু আত্মবিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন যতটা হলে সে নিজেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দেখানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। ইমাম আহমাদকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞানার্জন করেন কি না। উত্তরে তিনি যা বললেন সেখানে নিজেকে বড় দেখানো তো দূরে থাক, আল্লাহর জন্য বিশাল কিছু একটা করে ফেলছেন সেই ভাবটুকু পর্যন্ত ছিল না! তিনি কেবল বিনয়ভরে বলেছিলেন, "আসলে আমার কাছে হাদিসগুলো ভালো লেগেছিল, তাই আমি সেগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম, এই আর কি!" আবু বকর আস-সিদ্দীক (ﷺ) কে কেউ প্রশংসা করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে দু'আ করতেন: "হে আল্লাহ! তারা আমাকে যা মনে করে, আমাকে তারচেয়েও উত্তম হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং তারা আমার সম্পর্কে যা জানে না, সেগুলোর জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" অথচ নবী-রাসূলদের পরে দুনিয়ার বুকে জন্ম নেওয়া মানুষগুলোর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ!

সুতরাং এটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সালাফগণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে খুব বড় মাপের কিছু প্রমাণে মোটেও ব্যস্ত ছিলেন না। সত্যি বলতে কি, তারা নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে কোনো চিন্তাই করতেন না। তারা ছিলেন নিতান্তই অনাড়ম্বর সাদাসিধে বাসিন্দা। লোক দেখানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী অকপট মাটির মানুষ। তাঁরা শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

আপনি যদি এই মানুষগুলোর মতো হতে চান তাহলে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না, শুধু আপনি যাদেরকে অভিভূত করার সংগ্রামে লিপ্ত, সেই মানুষগুলোকে তাদের সত্যিকার আসনে বসিয়ে দিলেই চলবে! হ্যাঁ, আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, তারাও ঠিক আপনার মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। বীর্য ও ডিম্বাণু থেকে তাদের জন্ম। তারা আপনার মতোই দুর্বল, অসহায়, সীমাবদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ। এ সুবিশাল বিশ্ব চরাচরে তারা কতই না তুচ্ছ! আর তাদের তুলনায় আল্লাহ তাআলা কত বেশি শক্তিশালী, কতটা ক্ষমতাধর সেটা নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? তবে কে আপনার সময়, শ্রম ও মনোযোগ পাওয়ার অধিকতর দাবীদার? একবার যদি আপনার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা স্থান পায়, তাহলে দেখবেন, আস্তে আস্তে অন্যরা কে কী ভাবল সেটা নিয়ে আপনি কম মাথা ঘামাচ্ছেন। তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার দিকে আপনি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠবেন। সত্যি বলতে কি, আপনি যদি এমনটি করতে পারেন, কিছু-না-চাইতেই দেখবেন যে মানুষের চোখে আপনি মহৎ একজন হয়ে গেছেন। সবার অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন। মানুষ সাধারণত খাঁটি ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় যারা লোকের প্রশংসা কুড়োতে মরিয়া নয়। তারা যেমন, তেমনই থাকে।

আপনি লক্ষ করবেন, এ মানুষগুলো নিজের ব্যক্তিত্বের কারণেই লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়। লোকেরা তাকে এটা-সেটা ভাবুক এটা তার চাওয়া নয়।

এখানে প্রথম ব্যাপারটি জুড়ে ছিল এই নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে অতিসচেতনতা অন্যদের উপর কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে আলোচনা। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই নিন্দনীয় স্বভাবটি স্বয়ং আপনার উপর কী প্রভাব ফেলে তা বোঝার চেষ্টা করা। আপনি যখন দেখবেন মানুষ আপনাকে যা মনে করেছে আপনি আসলে তা নন, তখন নিজের ভেতর মারাত্মক অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা বোধ করবেন। অনেকটা নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করার মতো। বিশ্বের নামকরা সেলিব্রিটিদের মধ্যে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার আধিক্যের দিকে খেয়াল করুন! তারা যখন আবিষ্কার করে বাইরের জগতের সামনে তার যে মহান রূপ উপস্থাপন করা হয়, সেটার সাথে তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তর ফারাক আছে, তখনই একরাশ বিষণ্ণতা তাদের উপর জেঁকে বসে। তারা যে মেকি জীবনযাপনের ভান করছে, সেটি কেবল-ই একটি মিথ্যে ছলনা, একটি অলীক অভিনয়। এই তেতো অনুভূতি তাদেরকে কুরে কুরে খায়। নিজেরা বাস্তবে যা নয়, তারচেয়েও বড় করে যারা নিজেকে মানুষের সামনে হাজির করতে চায় তাদের সবার জীবনেই এই ব্যাপারটি আরেকটু ছোট পরিসরে ঘটে থাকে।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে, মানুষকে বোকা বানাতে পেরে, নিজেদেরকে জাহির করে এ লোকগুলো খুব আনন্দবোধ করে। কিন্তু ২০১০ সালের জুন মাসে 'সাইকোলজিকাল সায়েন্স' *(Psychological Science)* নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি রিসার্চ অনুযায়ী তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়। এখানে একদল নারীর উপর একটি পরীক্ষা চালানো হয়। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় একটি করে ৩০০ ডলার মূল্যের ব্র্যান্ডের সানগ্লাস (ক্লো ব্র্যান্ডের সানগ্লাস)। অংশগ্রহণকারী নারীদের কিছু অংশকে বলা হয় তারা যে সানগ্লাসটি পরেছে, তা আসল ব্র্যান্ডের চশমা। আর অন্যদেরকে বলা হয় যে এগুলো আসলে নকল। এরপর তাদের সবার একটি গণিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেখানে জিতলে তাদের ১০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় তাদের নিজেদেরকেই নিজেদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে দেওয়া হয়। দেখা গেল, যারা জানত তারা আসল ব্র্যান্ডের চশমা পরেছে, তাদের মাঝে মাত্র ৩০ ভাগ নিজেদের নম্বর প্রদানে জালিয়াতি করেছে, আর যারা ভেবেছিল তারা নকল চশমা পরেছে, তাদের শতকরা ৭০ জনই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে।

পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর কিছু বিন্দু গণনা করতে বলা হয়। বলা হয় যে, প্রত্যেকটি বিন্দুর অবস্থানের উপর পুরস্কারমূল্য নির্ভর করবে। এখানেও দেখা গেল, যারা নকল সানগ্লাস পরে আছে বলে ভেবেছে, তারা গণনাকৃত বিন্দুর অবস্থান নিয়ে অনেক বেশি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে, অথচ যারা ভেবেছে তাদের সানগ্লাস আসল তারা এতটা করেনি।

তৃতীয় অংশ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব যেখানে তাদেরকে নৈতিকতা, সততা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। এখানেও প্রকাশ পেল যারা জানত তারা নকল জিনিস পরে আছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। অন্যদেরকে অসৎ ও নীতিহীন মনে করে। চতুর্থ ভাগে তাদেরকে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয় যার মাধ্যমে বোঝা যায় একজন কতটা একাকিত্ব বোধ করছে। এখানেও একই ব্যাপার! যারা জানত যে তারা আসল চশমা পরে আছে, তাদের তুলনায় যারা ভেবেছে যে নকল চশমা পরে আছে, তারা নিজেদেরকে বেশি একা মনে করছিল।

চমকপ্রদ এই পরিসংখ্যানটিও এ উপসংহার টানে যে, নকল জিনিসপত্র পরে একজন মানুষ কাজেকর্মে এবং মানসিকভাবেও তিক্ততা অনুভব করে। অন্যদিকে যারা জানে তারা আসলটাই পরেছে, তারা হয় অধিক সৎ, নীতিবান ও পরিতৃপ্ত।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৪)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের সূরাহ্ আলে ইমরানের ১৯৬-১৯৭ নং আয়াতে বলেন,

"নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য (কয়েকদিনের) সামগ্রীমাত্র-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।"

পত্রিকায় আন্তর্জাতিক খবরের পাতা উল্টিয়ে শত্রুর হাতে আক্রান্ত মুসলিম দেশগুলোর খবর পড়ার সময় এই দুটো আয়াত আমার খুব মনে পড়ে। আমাদের বর্তমান বাস্তবতার নিরীখে এই দুটি আয়াত যেন আমাদের মনে প্রশান্তি ও ভরসা যোগাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। আপনি খবরের কাগজ একবার উল্টিয়ে দেখুন। সপ্তাহের প্রতিটি দিনেই পাকিস্তানে সিআইএ এর ড্রোন হামলার খবর, ফিলিস্তিনে নতুন কোনো বসতি স্থাপনের খবর, আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন দখলদারিত্ব সম্প্রসারণ এবং এধরনের আরো অনেক খবর খুঁজে পাবেন। আপনার মনে হয়তো সামান্য হলেও হতাশা জেঁকে বসে। আপনি হয়তো ভাবেন, "এসবের শেষ কবে? জালিমদের পাশার দান কখন উল্টে যাবে?"

এই দুটি আয়াত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, তা আমাদেরকে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। আপনার মনে হতেই পারে আল্লাহ বুঝি এই দুটি আয়াত বিশেষভাবে আমাদের জন্য নাযিল করেছেন!

প্রথমত, আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন, তিনি তার শত্রুদেরকে দুনিয়ার বুকে রাজত্ব দেবেন এবং তাতে মুমিনরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর মানে হলো যখন আপনার জীবনে দুঃসময় আসে, সেটি কোনো আকস্মিক 'হ য ব র ল' অবস্থা নয়। বরং আল্লাহ এর দ্বারা আপনাকে শাণিত করে তুলতে চান। তিনি আপনাকে আরো বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে চান। এই কারণে তিনি আপনাকে ক্ষণিকের এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চালনা করেন। তেমনি, মুসলিমদের উপর কাফিরদের আধিপত্য আমাদের সকলের অপছন্দ হলেও এটি মূলত মুসলিম উম্মাহকে প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলার একটি পন্থা। এতে বিজয় লাভের আগে মুসলিমরা কঠিন সময় ও দুর্যোগ পাড়ি দিতে শেখে। ফলে অর্জিত বিজয়কে তারা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ আমাদের আদেশ করছেন যাতে এই কুফফার সভ্যতার চাকচিক্য দেখে আমরা ধোঁকায় না পড়ি। আর এই ধোঁকা থেকে বাঁচতে যে বিষয়টি সবসময়ের জন্য মাথায় গেঁথে রাখতে হবে তা হলো, কুফফারদের এই রাজত্ব সাময়িক, আর তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য জাহান্নাম, যা চিরস্থায়ী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ দুনিয়ার বুকের সবচেয়ে ধনী আর বিলাসী ব্যক্তিটিকে জাহান্নামে একবার ডুব দিয়ে তুলে এনে জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি কি তোমার জীবনে কখনো কোনো কিছু উপভোগ করেছিলে?" সেই ব্যক্তি উত্তর দেবে, 'না'। কারণ জাহান্নামের সেই এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই এতটা ভয়াবহ যে, নিমেষে সে তার দুনিয়ার জীবনের সমস্ত আরাম আয়েশের কথা ভুলে যাবে।

তেমনি কোনো জালিম ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি যখন তাদের আধিপত্য আর প্রভাব-প্রতিপত্তির ঝলকানি দ্বারা বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এবং একই সাথে কুফর ও জুলুম-নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখে, তাদের পরিণতিও ঠিক একই রকম হবে। এই চিরন্তন পরিণতির সাক্ষী ইতিহাস। দুনিয়াবী কোনো উৎকর্ষই এই পতন ঠেকাতে পারবে না। তাদের দুনিয়াবী পতন ছাড়াও এই আয়াতের আরো একটি উপকারী দিক হলো, জাহান্নামের গন্তব্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ এই সাময়িক দুনিয়াবী জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ীতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

সবশেষে, আরো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, যার কথা এই আয়াতে সরাসরি উল্লেখিত না হলেও আল-বুখারির একটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। সেই হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "এটি আল্লাহর দায়িত্ব তিনি যদি কিছুকে উঁচুতে তুলে ধরেন তবে তিনি সেটিকে অবশ্যই নামিয়েও দেন"। অন্য কথায়, যার উত্থান আছে, তার পতনও আছে। আমরা এক্ষেত্রে কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটা চমৎকার বই পড়ে দেখতে পারি। বইটির নাম, Why the West Rules – For Now: The Patterns of History and What They Reveal About the Future। এই বইয়ে লেখক ইয়ান মরিস দুটো মৌলিক যুক্তির উপস্থাপনা করেছেন, প্রথমত, ইতিহাস জুড়ে যত সভ্যতা, তাদের উত্থান ও পতনের পেছনে যে কারণ সেগুলো কেউ কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, ২০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে আধিপত্য বিস্তারকারী পশ্চিমা সভ্যতার পতনও খুব দ্রুতই সংঘটিত হবে।

বইটিতে লেখক সেই ১২০০০ বছর আগের বরফ যুগের পর থেকে বর্ণনা শুরু করেছেন। তখন কৃষির ধারণা জন্ম লাভ করে আর বৃহৎ পরিসরে সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি বর্ণনা করেন, কীভাবে প্রয়োজনীয় গাছপালা ও গৃহপালিত প্রাণীর প্রাচুর্যের কারণে দুটি আদি ভৌগোলিক আবাস থেকে একের পর এক সভ্যতার জন্ম ও চতুর্মুখী সম্প্রসারণ হয়, এ দুটি এলাকা হলো পশ্চিম ইউরেশিয়া এবং ইয়াংজি ও ইয়েলো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল যা বর্তমানে চীন নামে পরিচিত।

মরিস উল্লেখ করেন, শুরুতে পশ্চিমারা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে প্রাচ্যের তুলনায় প্রায় ২০০০ বছর এগিয়ে থাকলেও খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ এ এসে এই অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয় এবং তারা সমানে-সমান হয় ওঠে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচ্য নেতৃত্বের আসনে অবতীর্ণ হয়। কারণ, এই রোমান সাম্রাজ্যই তৎকালীন সময়ে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করত এবং তারাই ছিল সেই পশ্চিমা সভ্যতার সামাজিক উন্নয়নের চূড়া। এই অবস্থা ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বিরাজমান থাকে। এই সময়েই ইউরোপ অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। অপরদিকে সুই রাজবংশের নেতৃত্বে চীন ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী ১০০০ বছর পর্যন্ত তারা কর্তৃত্বের ছড়ি ধরে রাখে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রাচ্যের এই অগ্রগামিতা টিকে থাকে। কিন্তু সেই সময়ে এসে আবার পশ্চিমারা প্রাচ্যের সমকক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়। এর কারণ হলো ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিমারা তাদের সামরিক প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যাপক পারদর্শিতা লাভ করে। ১৮ শতকের শেষে, শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দুটি সভ্যতার শক্তিমত্তার ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে এবং তা পশ্চিমাদের দিকে হেলে যায়। ব্রিটিশ প্রকৌশলবিদগণ তাদের দেশে অবস্থিত বিপুল কয়লাখনির সুবাদে বাষ্পচালিত জাহাজ, ট্রেন এবং শিল্পকারখানায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এর মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হয়। ব্রিটিশদের এই আধিপত্য পরবর্তী ১০০ বছর (বিংশ শতাব্দীর পূর্ব অবধি) টিকে থাকে। এই ব্রিটিশ আধিপত্যই আধুনিক যুগের আমেরিকান আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

মূল যে বিষয়টির উপর বইটি দৃষ্টিপাত করেছে তা হলো, দশ হাজারেরও বেশি সময় ধরে, কী করে একের পর এক সভ্যতার জন্মই হয়েছে যেন ধ্বংস হওয়ার জন্য! তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কিছু কারণে তাদের পতন ছিল অনিবার্য। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের রাজত্বকালই ছিল মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসের মাঝে একটি ছোট্ট পাতা মাত্র। সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত।

লেখক এরপর উপসংহার টানতে বই এর নামের সাথে জুড়ে দেওয়া – 'পশ্চিমারা এখন শাসন করছে, কিন্তু কতদিনের জন্যে?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার উত্তর ছিল এমন, যদি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের উন্নতির ধারা এখন যেমনটা-আছে-তেমনটাই-থাকে, তবে আগামী শতাব্দীর শুরুতেই কবর রচিত হবে পশ্চিমা প্রতিপত্তির।

আল্লাহু আলাম।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৫)

কুরআনে সূরাহ্ নিসার ১নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী..."

এই আয়াতে এক চিরন্তন বাস্তবতার কথা আছে। এই বাস্তবতাটি আপনাকে যেকোনো মহৎ কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে আহবান করে বলছেন, তিনি আমাদের সবাইকে কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে জন্ম দিয়েছেন। তাদের অন্তরঙ্গতা থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে, সেসব সন্তানদের আরো সন্তান-সন্ততি হয়েছে এবং এমনি করে ঈসা (ﷺ) এর সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'শ মিলিয়ন! সতের শতকের মাঝেই বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন স্পর্শ করে আর উনিশ শতক নাগাদ এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে এক বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। বিশ শতকে তা আবারো বেড়ে দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ দুই বিলিয়ন। আর আজকে পুরো দুনিয়াতে প্রায় সাত বিলিয়ন লোকের বাস। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। ধারণা করা হয় আগামী শতক আসতে আসতেই পৃথিবীতে লোকসংখ্যা দশ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। শত ভাষাভাষী হাজার কোটি মানুষ বিভিন্ন দেশ আর মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ আর গোত্রের বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যময় বিশাল জনগোষ্ঠীর সূত্রপাত হয়েছে কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অথচ তারা দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন আজ থেকে হাজার বছর আগে।

এ ব্যাপারটি একটি গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। আপনার একটিমাত্র কাজ আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও এর ফলাফল হতে পারে অসামান্য! কোনো এক অজানা দিনে করা আপনার একটি ছোট্ট কাজ, একের পর এক ঘটনার জন্ম দিয়ে এক বিশাল পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে। হয়তো কাজটি করার সময় সেদিন এমন পরিণতির কথা আপনি কল্পনাতেও ভাবেননি। বৃষ্টির প্রথম ছোট্ট ফোঁটাটা যখন পানির বুকে আছড়ে পড়ে তখন সে জায়গাটাকে কেন্দ্র করে ছোট্ট একটা ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউটা তার চারপাশে মৃদু আলোড়ন তুলতে তুলতে ছড়িয়ে যায়। তেমনি আপনার একটি ছোট্ট কাজ থেকেও জন্ম নিতে পারে অজস্র ঘটনা। ইংরেজিতে এর একটি নাম আছে, যাকে

বলা হয় Domino Effect, তবে এর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত জ্যামিতিক সংবৃদ্ধি (geometric progression)।

সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে মহামারির উদাহরণের আশ্রয় নেন। ধরুন, ভারত থেকে এক পর্যটক বাংলাদেশে বেড়াতে আসার সময় তার শরীরে এমন এক সংক্রামক ভাইরাস বয়ে এনেছে, যার সংক্রমণের হার ১০%। অর্থাৎ তার সাথে দেখা হওয়া প্রতি দশ জন লোকের এক জন এ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে। বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন লোক তার সংস্পর্শে আসলো, অতএব তাদের মাঝে পাঁচ জনকে সে সংক্রমিত করল। পরদিন, সেই পাঁচ ব্যক্তির প্রত্যেকে আরো নতুন পঞ্চাশ জনের সংস্পর্শে আসলো এবং তাদের ১০% লোককে আক্রান্ত করল। তাহলে, এখন আক্রান্ত ব্যক্তির পরিমাণ দাঁড়াল নতুন ২৫ জন+প্রথম ৫ জন+পর্যটক নিজে অর্থাৎ মোট ৩১ জন। তৃতীয় দিনে এই ৩১ জন লোকের প্রতেকে আরো ৫০ জনের সান্নিধ্যে আসলো এবং তাদের ১০% কে আক্রান্ত করল। সুতরাং তিন নম্বর দিনে নতুন আরো ১৫৫ জন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছে আর আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৮৬! হিসেব করলে দেখা যাবে চার নম্বর দিনে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক ভারতীয় পর্যটকের শরীর থেকে হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি লোক সেই সংক্রামক ভাইরাসের বাহকে পরিণত হয়েছে চার দিনের মাথায়! তাহলে ভেবে দেখুন, এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বছর পরে এই সংখ্যাটি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে পেতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে! ভারত থেকে যখন মাত্র একজন পর্যটক এ ভাইরাস নিয়ে বাংলাদেশের বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিল, তখন কি এই বিশাল সংখ্যাটা আমরা কল্পনায়ও আনতে পেরেছিলাম?

দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার মসনদ আকঁড়ে রাখার পর আমেরিকান ডলারে পালিত মুবারক সরকারের শক্তিশালী বলয় আজ ভেঙে পড়েছে। তিউনিসিয়ার বেন আলীর শাসনের পতন ঘটেছে। লিবিয়াতে প্রকৃতপক্ষেই একটি সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হয়েছে (যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তারা বোকার মতো পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপ ও সাহায্য কামনা করে বসেছে)। আজ আলজেরিয়া, বাহরাইন, জর্দান, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। এটা একসময় ছিল চিন্তারও অতীত। সমগ্র আরব জুড়ে এখন জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে দাউদাউ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। এই শাসকরা যুগ যুগ ধরে জনগণের রক্ত চুষে খেয়েছে, তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে। এ ঘটনাগুলো কিয়ামাতের পূর্বাভাস দেয়। এই ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত পৃথিবীর চেহারাকে পাল্টে দিতে থাকবে। কিন্তু এ সব কিছুর শুরু হয়েছিল কোথায়? এই আগুনের সূচনা হয়েছিল একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ থেকে। আপাতদৃষ্টিতে একক, অপ্রাসঙ্গিক ও তুচ্ছ একটি কাজ থেকে। এ সবের শুরু হয়েছিল ডিসেম্বরের এক গড়পড়তা দিনে।

সেদিন হতাশায় জর্জরিত এক বেকার যুবক তিউনিসিয়ার রাস্তায় নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবে এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে তার এই একটি কাজের সুদূরপ্রসারী ফলাফল। তার ছোট্ট একটি কাজ ছোট ছোট প্রতিবাদের জন্ম দেয়। সেখান থেকে একটি বিশাল আন্দোলন বেগবান হয়। ফলস্বরূপ তিউনিসিয়া সরকারের পতন ঘটে, পতন ঘটে মিসর সরকারের। এই ঘটনা অন্যান্য বহু দেশের লক্ষাধিক লোককে জালিম-সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়তে উৎসাহ যোগায়। এমনকি এই আগুনের আঁচ আমেরিকাকেও স্পর্শ করে! (ম্যাডিসন, উইসকনসিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ্য- যেখানে জনগণ রাজনৈতিক দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে)। মুহাম্মদ বুয়াজিজি যখন নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে দিচ্ছিল, সে মুহূর্তে কেউ ভাবতেও পারেনি এ ঘটনা শেষ পর্যন্ত পুরো মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকে বদলে দেবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

আমেরিকায় কনকর্ড নামে এক এলাকা আছে। ম্যাসাচুসেটসে আমার বাসা থেকে গাড়ি করে কনকর্ড যেতে কয়েক মিনিট সময় লাগে। কনকর্ড হলো সেই শহর যেখানে ২০০ বছর আগে ব্রিটিশ দখলদারদের সাথে স্থানীয় আমেরিকানদের মোকাবিলা হয়। সেখান থেকে সূচিত হয় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর সেখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ সবকিছুর শুরু কোথা থেকে? এর সূচনা ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক দিনে, যেদিন পল রিভিয়া নামের এক আমেরিকান, ব্রিটিশ সেনাদের সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে টের পেয়ে যান (তখন আমেরিকা ছিল ব্রিটিশদের ঔপনিবেশ)। তিনি জানতে পারেন, ব্রিটিশ বাহিনী লেক্সিংটন শহরে জন হ্যাংকক ও স্যামুয়েল অ্যাডামকে গ্রেপ্তার করে কনকর্ডে অতর্কিত আক্রমণ করে স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করার পরিকল্পনা এঁটেছে। সে রাতে রিভিয়া খুব সাধারণ একটি কাজ করেন। তিনি একটি ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে শহরে শহরে গেলেন এবং স্থানীয় লোকদের কাছে আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দিলেন যে, পরদিন সকালে ব্রিটিশ সৈন্যরা অভিযানের পরিকল্পনা করেছে। লেক্সিংটন যাবার পথে প্রত্যেক শহরে নেমে তিনি এই কাজটি করলেন। পরদিন সকালে ব্রিটিশরা সেখানে পৌঁছে আবিষ্কার করল তাদের মোকাবিলার জন্য আগে থেকেই একদল মিলিশিয়া বাহিনী প্রস্তুত! লড়াই হলো। ব্রিটিশরা কনকর্ডে পরাজিত হলো এবং সূচনা হলো আমেরিকান মুক্তিযুদ্ধের। এই মিলিশিয়া মুক্তিবাহিনীই পরবর্তীতে সারা দেশে ব্রিটিশ হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। দুনিয়ার চেহারা বদলে-দেওয়া, জাতির ভাগ্যের চাকা-ঘুরিয়ে দেওয়া এই বিশাল ঘটনাগুলোর শুরুটা হয়েছিল এক ব্যক্তির ছোট্ট একটি কাজ থেকে! অথচ সে ব্যক্তির হয়তো ধারণাই ছিল না তার সামান্য কাজটির পরিণতি একসময় কোথায় গিয়ে ঠেকবে!

এই উদাহরণগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এখানে তেমন জরুরি নয়। বরং এখান থেকে শেখার বিষয় হলো জ্যামিতিক সংবৃদ্ধির বিষয়টি। এটা আপনি প্রত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন। পল রিভিয়ার ছোট্ট একটি কাজ আমেরিকান বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। মুহাম্মদ বুয়াজিজির অভিমানি আত্মাহুতি আরব বসন্তের উত্থান ঘটিয়েছিল। শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও নারীর সম্মিলন থেকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আগমন ঘটেছে। তেমনি করে দু'দিন আগে অচেনা সেই পথচারীর সাথে আপনার আলাপচারিতা বা আপনার কোনো বক্তৃতা, বন্ধুকে দেওয়া উপহারের বই, আপনার কোনো সাদাকা, অথবা আপনার কোনো কথা বা কাজের পরিণতি পরবর্তীতে অন্যদের জীবনে এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে পারে যা আপনি সে সময় কল্পনাও করতে পারেননি। সূরাহ ইবরাহীমের ২৪ এবং ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা কী উপমা টেনেছেন তা লক্ষ্য করে দেখুন:

"...পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে..."

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সীরাহ থেকে একটি ঘটনার অবতারণা করে আমি আমার লেখা শেষ করছি। মদীনায় হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে ইসলামের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে মুসআব ইবনু উমায়ের (رضي الله عنه)-কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। মুসআব (رضي الله عنه) সেখানে পৌঁছলেন এবং আসাদ বিন যুরায়রাহ নামের স্থানীয় খাযরাজ গোত্রীয় এক ব্যক্তির আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। তাদের দু'জনের প্রচেষ্টায় মদীনার বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করল। একদিন এই দলটি জাফর গোত্রের কুয়ার পাশে বসে ছিল। তখন তারা মদীনার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। এই ব্যক্তি ছিলেন উসাইদ ইবনু হুদাইর। মুসআব (رضي الله عنه) তাঁকে তাঁদের মজলিসে বসে কথা শোনার আমন্ত্রণ জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে উসাইদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসাইদ এবার আরেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সাথে করে হাজির হলেন। তাঁর নাম সাদ ইবনু মুয়ায। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। বছরখানেক পর বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে তিনি শহীদ হন। সাদ ইবনু মুআয (رضي الله عنه) ছিলেন এমন একজন মুসলিম যার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেন যে, সাদের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। সাদ ইবনু মুয়ায এরপরে নিয়ে আসলেন সাদ ইবনু উবাদাহ কে। তিনিও তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ফলে মদীনার লোকেরা একে অপরকে বলতে থাকল: "যদি উসাইদ ইবনু হুদাইর, সাদ ইবনু মুয়ায আর সাদ ইবনু উবাদাহ উনারা সকলে মুসলিম হয়ে যান, তবে তো আমাদেরও তাই করা উচিত!" আর-রাহীকুল মাখতুম বইটিতে এভাবেই বলা হয়েছে:

"মুসআব মদীনায় তাঁর দাওয়াহর কাজ অব্যাহত রাখলেন এবং সাফল্যের সাথে নিজের মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। ফলে এক সময় এমন হলো যখন মদীনার আনসারদের প্রতিটি ঘরই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীতে ভরে উঠল।"

মুসআবের মিশন দ্বারা মদীনায় এভাবেই জন্ম হলো প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের। হিজরতের ভূমি, ইসলামের ভিত্তি যে মদীনা শহর, যেখান থেকে পুরো বিশ্বের কাছে ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা তৈরি হয়েছিল কেবল একজন লোকের প্রচেষ্টা থেকে – তিনি মুসআব ইবনু উমায়ের (ﷺ)।

এটা জানা সত্যিই দুঃসাধ্য যে, আপনার সামর্থ্য ও প্রচেষ্টাগুলো কখন ঢেলে দিলে বা কার সাথে করলে তা কাজে লেগে যাবে। আপনি কখনোই জানবেন না আপনার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কাজের পরিণতিও কত বিশাল হয়ে যেতে পারে! সবসময় মনে রাখবেন এবং ইতিহাস থেকেও আমরা এই শিক্ষাটিই পাই যে, শুধুমাত্র একজন মানুষের পক্ষেও পৃথিবীকে বদলে দেওয়া সম্ভব...

বশ্যতার খেসারত

মর্যাদার অধিকারী হতে চাইলে কিছু মূল্য দিতে হয়, কিছু খেসারত দিতে হয়। কিন্তু দুর্বল চিত্তের কিছু মানুষ আছে, যাদের কাছে এই খেসারত হচ্ছে একটা বোঝার মতো, এমন এক বোঝা যা বহন করার সাধ্য তার নেই। এ বোঝা থেকে পালিয়ে বেড়াতে, তারা বেছে নেয় বশ্যতা স্বীকারের পথ। ফলে তার জীবন হয়ে যায় সস্তা, অর্থহীন, যে জীবন নড়বড়ে আর শঙ্কা দিয়ে ঘেরা। এ এমন এক জীবন, যে জীবনে তারা নিজেদের ছায়া দেখলেও ভয় পায়, নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনেই কেঁপে ওঠে।

এরা এমন এক অন্যায্য মূল্য দিয়ে বশ্যতাকে কিনে নেয় যা মুক্তির মূল্যের চাইতে বহুগুণে বেশি। বশ্যতা স্বীকারের মূল্য এরা কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করে। নিজেদের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়ে, আত্মমর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে, সুনামকে ক্ষুন্ন করে, মনের শান্তিকে বলি দিয়ে, কখনো বা নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের জান-মাল দিয়ে হলেও এরা বশ্যতার খেসারত দেয়। তারা নিজেদের এই ভেবে বোকা বানায় যে, যদি তারা নিজেদের মানমর্যাদা কিছুটা ক্ষুন্ন করে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, বিনিময়ে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ তাদের স্বীকৃতি দেবে! কিন্তু আসলে কী তা হয়? আমরা তো এমন কতবারই দেখেছি, এই মানুষগুলোকে তাদের প্রভুরা ছুঁড়ে ফেলতে এতটুকু বিলম্ব করেনি, অথচ নিজেদের গা বাঁচাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা এই মনুষ্যপ্রভুদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল! এরকম কতো মানুষ তাদের পৌরুষকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই প্রভুদের সামনে মাথানত করেছে, তাদের পায়ের ধূলোয় মুখ মুছেছে, শেষ পর্যন্ত নিজের মনুষ্যত্বটাই খুইয়ে এসেছে। দিন শেষে এরা কী পেয়েছে? এরা লাভ করেছে এক অর্থহীন, তুচ্ছ জীবন। যে প্রভুদের অনুগ্রহ লাভের আশায় সে তার জিভ ঝুলিয়ে রেখেছিল, লেজ নাড়িয়েছিল, কাদামাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেই প্রভুরা তাদের দিনশেষে তাদেরকে কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এমন কতো মানুষ আছে, যারা সম্মানিত হতে পারত, মহৎ হতে পারত, আল্লাহর দেওয়া আমানতের সংরক্ষণ করতে পারত। কিন্তু না—তারা সেই আমানতের খেয়ানত করেছে, দায়িত্ব পালনে শিথিলতার পরিচয় দিয়েছে। কেউ কেউ নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার জন্য এতই মরিয়া হয়ে যায় যে, খোদ জালিমও অবহেলা আর অবজ্ঞায় তাকে কিনে নেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা একসময় তাকে মিথ্যে আশা আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারাই একসময় তাকে দূর্গন্ধময় লাশের মত পরিত্যাগ করে,

লাথি মেরে দূরে তাড়িয়ে দেয়। অনেকের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা পাহাড়ের চূড়া হতে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। কেউ তাদের প্রতি দয়া করে নি, দয়া দেখায় নি, তাদের জানাযায়ও অংশ নেয়নি—যে প্রভুদের সান্নিধ্য পেতে তারা এতটা নীচে নেমেছে, এমনকি তারাও না।

এত এত স্মরণিকা আর অভিজ্ঞতা থাকার পরেও আমরা দেখি, নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার এই তালিকায় প্রতিনিয়ত কেউ-না-কেউ যুক্ত হচ্ছে, জালিমের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে পূর্ণ খেসারত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, আল্লাহর সাথে, আপন মানুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, আমানতের খেয়ানত করছে, নিজেদের মানমর্যাদাকে বিসর্জন দিচ্ছে, মনুষ্যপ্রভুর নৈকট্যপ্রাপ্তি আর আরাম-আয়েশের লোভে নিজেদের জিভ বের করে দিয়েছে। বস্তুত, এরা মরুভূমির মরীচিকাকে তাড়া করছে, অবশ্যম্ভাবী এক পতনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মানুষ উল্লসিত চোখে তার পতন উপভোগ করে আর তার পুরাতন প্রভুরা তাচ্ছিল্যের সাথে তার দিকে চেয়ে থাকে।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে, আমি দেখেছি এবং দেখেই চলেছি—বড় মাপের সব মানুষ, যারা মাথা নিচু করে, ঘাড় কাত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে প্রভু মেনেছে। বশ্যতার বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রভুর আজ্ঞাবহ হয়েছে। যখনই প্রভুর কার্যোদ্ধার হয়েছে, পা দিয়ে ঠেলে কুকুরের মতো তাদের সরিয়ে দিয়েছে আর তারা কাতারবদ্ধ হয়েছে দাসদের এক লম্বা সারিতে—তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

আমি দেখেছি তাদের! তারা হতে পারত মুক্ত-স্বাধীন, কিন্তু তারা বেছে নিয়েছে দাসত্বের পথ। তারা হতে পারত দৃঢ়চেতা, কিন্তু তারা হয়েছে দুর্বল। তারা হতে পারত শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু তারা হয়েছে কাপুরুষ। কিছু মূল্য দিতে হবে বলে সম্মান আর মর্যাদার পথকে পরিত্যাগ করেছে, অথচ বশ্যতার চড়া মূল্য তারা দিয়ে চলেছে বারেবার। ক্ষমতাসীনদের মনজয় করতে তারা ভয়ানক সব অপরাধ আর পাপে জড়িয়েছে, শুধু যেন তাদের ছায়ায় একটুখানি আশ্রয় নিতে পারে, অথচ ক্ষমতাসীনদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদেরই ছিল, হাতের মুঠোয় ছিল! আমি দেখেছি পুরো একটা জাতি, মাত্র একবার মুক্তির মূল্য পরিশোধ না করে ভয় পেয়ে পিছু হটেছিল বিধায় পরাজয় আর নিপীড়ণের মূল্য পরিশোধ করে গেছে বারবার, অথচ পরাজয়ের মূল্যের তুলনায় মুক্তির মূল্য তো তেমন কিছুই ছিল না। অতীতে, ইহুদিরা তাদের নবীকে বলেছিল,

"...হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব..." (সূরাহ মায়েদা ৫:২২)

এ কাজের শাস্তিস্বরুপ তারা মরুভূমিতে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়িয়েছিল চল্লিশ বছর ধরে, মরুভূমির বালি তাদের কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, নির্বাসনের অবমাননা তাদের ভোগ করতে হয়েছে, ভয় তাদেরকে তাড়া করে বেড়িয়েছে।

এই সব কিছুই কেবল একটি কারণে—মুক্তি আর মর্যাদা লাভের জন্য মূল্য দিতে তারা রাজি হয়নি, অথচ মাপতে গেলে এর পরিমাণ তাদের পরিণামের একভাগও হতো না।

কাজেই, মূল্য সবাইকে পরিশোধ করতেই হবে—প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও জাতিকে। সে মূল্য হতে পারে গৌরব, মর্যাদা আর মুক্তি অর্জনের মূল্য, অথবা শোষণ এবং দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ হবার মূল্য। প্রতিটি অভিজ্ঞতা এ বাস্তবতার সত্যায়ন করে যে—এর থেকে কোনো মুক্তি নেই।

মুক্তির মূল্য দিতে যারা ভয় পায়, মর্যাদার পথে হাঁটতে যারা ক্ষতির আশংকা করে, অন্যের পায়ের ধূলোয় যারা মুখ মোছে, নিজেদের ওপর অর্পিত আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের আত্মসমান আর মানবতাবোধের সাথে, মুক্তির জন্য উন্মাহর ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাসের সাথে যারা প্রতারণা করে, তাদের সকলকে আমি বলছি—ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও, শিক্ষা নাও বাস্তবতা থেকেও। তোমাদের সামনে তাজা উদাহারণ রয়েছে যারা সাক্ষ্য দেয়—বশ্যতার খেসারত, মর্যাদার দামের চাইতে বহুগুণে বেশি। আর মুক্তির জন্য তোমাকে কমই মূল্য দিতে হবে, যতটা না আজ তুমি দাসত্বের জালে আটকা পড়ে দিচ্ছ। যারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তারা প্রকৃত জীবনের স্বাদ পায়, আর যারা দারিদ্রের পরোয়া করে না, দুনিয়া তাদের পায়ে এসে নত হয়। যারা ক্ষমতাসীনদের ভয় করে না, তাদের ভয়ে ক্ষমতাসীনরা তটস্থ থাকে! এমন শত শত উদাহারণ আছে সেইসব আজ্ঞাবাহী লোকের, যারা তাদের বিবেককে বিকিয়ে দিয়েছিল, তাদের ওপর অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, সত্যকে পরিত্যাগ করেছিল, কাদার মাঝে গড়াগড়ি খেয়েছিল এবং একসময় তারা বিলীন হয়ে গেছে, কেউ তাদের মনে রাখে নি—তাদের অভিশাপ দিয়ে গেছেন আল্লাহ—তাদের অভিশাপ দিয়ে গেছে মানুষ।

অপরদিকে, আমাদের হাতে এমন দৃষ্টান্ত আছে, যারা বশ্যতা স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এবং নিজের পুরষত্বকে তারা বিসর্জন দেয় নি। তাদের যারা বেঁচে আছে তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে, আর যারা মরে গেছে তারা মরে গেছে মাথা উঁচু রেখেই, যদিও সংখ্যায় তারা অপ্রতুল...”

সাইয়্যিদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ)
নভেম্বর, ১৯৫২

স্বাধীনতা চার দেয়ালের কল্পিত স্বর্গে নয়, স্বর্গের কি দেয়াল থাকে! দিগন্তের ওপারে যে বিশাল আকাশ-স্বাধীনতা ঐ আকাশেও নেই। মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলো যান্ত্রিক আটপৌরে এই জীবনের গ্লানি টানতে টানতে ক্লান্ত, বিষণ্ণ। সবচেয়ে বড় বন্দিত্ব হলো অন্তরের বন্দিত্ব, আর সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হলো হৃদয়ের স্বাধীনতা। চোখ বন্ধ করলে যে যোগাযোগটা হয়-সেটাই তোমার স্বাধীনতা। একদিন নিশ্চয় আল্লাহ চোখের পানিগুলো মুছে দেবেন, অন্তরগুলো প্রশান্ত করবেন। তুমি শক্ত হয়ে জমে থেকো, কখনও ঝরে যেও না...